হিদায়াতুল কুরআন সিরিজ-১

সূরা ফাতিহা

মর্ম ও শিক্ষা

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী

হিদায়াতুল কুরআন সিরিজ-১

সূরা ফাতিহা
মর্ম ও শিক্ষা

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী

সূরা ফাতিহা : মর্ম ও শিক্ষা
ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

©
ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী

প্রকাশক
ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী
২৮/১ টয়েনবী সার্কুলার রোড
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৬৭৮৬৬৪৪০১

তৃতীয় সংস্করণ
মে ২০১৯

প্রথম সংস্করণ, জুন ২০০৬ ও
দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৭
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ
মেভিস প্রিন্টার্স

পরিবেশক
রকমারি ডট কম
(www.rokomari.com)
২/২ই ইডেন কমপ্লেক্স, আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

Surah Fatiha : Mormo O Shikkha
Dr. Abul Hasan M. Sadeq
3rd Edition : May 2019
Published by: Islamic Research Academy
28/1, Toyenbee Circuler Road, Motijheel, Dhaka-1000
Phone- 01678664401
email : ira.bddhaka@gmail.com, sadeqaub@gmail.com

Price: Tk 350.00 $ 8

ISBN : 978-984-34-6113-1

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আবদুল খালেক এর মাগফিরাত কামনায়, যিনি এ বইটির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপ্রান্ত পড়েছেন শেষ মৃত্যুশয্যায়। যাঁর সাথে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁর ইন্তে কালের পূর্বের দিনও, যিনি করেছেন এর ভূয়সী প্রশংসা, আর দিয়েছেন দ্রুত প্রকাশনার তাগিদ ও দু'আ, যাঁর সঙ্গে আলোচনায় বইটি হয়েছে সমৃদ্ধ। যিনি আমার লেখনীর প্রেরণা। যাঁর জীবনই জীবন্ত ইবাদত। আল্লাহতে নিবেদিত ছিল যাঁর প্রাণ। যিনি লিখেছেন বহু গ্রন্থ, অনুবাদ করেছেন মূল্যবান গ্রন্থরাজি। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন তিনি ৩রা মহররম ১৪২৭; ৩রা ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, ২০০৬। শুক্রবারে যাওয়ার কামনা ছিল তাঁর। আল্লাহও তাঁকে ডেকে নিলেন শুক্রবারেই। জীবন কুসুম ঝরে গেলেও ফুলের সুবাস হয়নি লীন। সে তো থাকবে চির অমলিন।

আর

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা মরহুমা আয়েশা খাতুন এর মাগফিরাত কামনায়। তিনিও আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন, আমার পিতার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে ২৫শে যিলহজ্জ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার, ২৬শে জানুয়ারি ২০০৬; আমার জন্মদিনে। যিনি ছিলেন আমার সকল প্রেরণা, আমার জন্য দু'আ দিবানিশি। যিনি ছিলেন আপাদমস্তক দীন-দরদী। গরীবের জন্য এমন মন কোথাও দেখিনি আর আমি। যাদের জন্য উজাড় করে দিতেন সবকিছু। যিনি ই'তেকাফ করেছেন পবিত্র কা'বায়, শেষ রমযানের শেষ দশ দিন আমার ও আমার সহধর্মিণীর সাথে, গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও। হে পরওয়ারদিগার, দিয়ে দাও তাঁকে কা'বার শবে কদর।

হে আল্লাহ, যাঁদের জীবন ছিল তোমার তরে; তোমার অপার করুণা হোক তাঁদের তরে। তুমিতো নিজের জন্য "করুণাকে" করে নিয়েছো করণীয়। হে ক্ষমাময়, রাহমান, রাহীম! ক্ষমা করো তাঁদের। নসীব করো জান্নাতুল ফিরদাউস বিনা হিসাবে। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা।

বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম-এর সম্মানিত খতীব এবং মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা এর প্রাক্তন হেড মাওলানা হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের

অভিমত

মহান আল্লাহ কালামে পাকে ঘোষণা করেছেন যে, কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত। আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে সব নবী-রাসূলের নিকটই কিতাব পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা 'সোজা পথ' প্রদর্শন করা, যা অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে অনন্তকালের বেহেশত লাভ করতে পারে। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। যাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহর কিতাবের বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা পেশ করেন, কিতাবের বিধি-নির্দেশ বাস্তবায়ন করে ইসলামী জীবন ও সমাজের মডেল পেশ করেন, আর উপহার দেন উত্তম আদর্শ।

শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (স) এবং সর্বশেষ কিতাব হলো আল-কুরআন। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। আর কোনো কিতাবও নাযিল হবেনা। সুতরাং এ কুরআনই হলো আমাদের দলিল ও সংবিধান। এ কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সকল ইস্যু সমাধানের মূলনীতি দেয়া আছে। এই কুরআন চর্চা করেই সকল যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান বের করে নিতে হবে।

আজ পর্যন্ত কুরআনের বহু মূল্যবান চর্চা ও গবেষণা হয়েছে। অনেক মূল্যবান তাফসির লিখিত হয়েছে। সেগুলো অধ্যয়ন করলে কুরআনের মর্ম ও বিধান বোঝা যায়। গভীর মনযোগ সহকারে এসব তাফসির পাঠ করলে সংশ্লিষ্ট আয়াতে বাস্তব জীবনের জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে, তা-ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে দীর্ঘ তাফসির অধ্যয়ন করে সেখান থেকে বাস্তব জীবনের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগুলো বের করে নেয়া খুবই কঠিন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বিশিষ্ট আলেমে দীন ও প্রখ্যাত চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসির গ্রন্থ মন্থন করে কুরআনের আয়াতের সাথে সাথে বাস্তব জীবনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে পেশ করেছেন। ফলে সাধারণ শিক্ষিত জনগণও তা সহজে বুঝতে সক্ষম।

আমি এর পুরোটা গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করেছি। আমার বিশ্বাস, কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য জীবনে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের বেলায় এই 'হিদায়াতুল কুরআন' অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি এর দ্রুত প্রকাশনা ও বহুল প্রচার কামনা করি। আর দু'আ করি আল্লাহ যেন এ মেহনতকে কবুল করেন এবং আমাদের সকলের জন্য আখিরাতে নাজাতের উসীলা বানিয়ে দেন। আমীন।

(উবায়দুল হক)

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ তাফসির "আত্তাফসীরুল মুনীর ফিল আকিদাহ ওয়াল মানহাজ" (৩১ খণ্ড) এর রচয়িতা আল্লামা ওয়াহবাহ মুস্তাফা আয-যুহাইলীর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم .

نحمده ونستعينه ونصلى على نبيه الأمى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد!

فإنه مما لاشك فيه أن القرآن الكريم هو الهداية كلها وطريقة النجاة إلى الجنة لمن اتبعها. فعلماء الإسلام اعتنوا بالقرآن الكريم منذ بداية الإسلام وخدموه من خلال تفسيرهم لهذا الكتاب المجيد.

وأنا أيضا وكانت لى السعادة أن أكتب كذلك باسم التفسير المنير فى العقيدة والمنهج، فالناس مازالوا يهتدون بهذه التفاسير المؤلفة.

إنه لمن دواعى سرورى أن صديقى الحميم العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ أبوالحسن محمد صادق قد وفقه الله تعالى أيضا تاليف التفسير للقرآن المجيد باسم "هداية القرآن" وذلك بأسلوب جديد مفيد، ومن أبرز ميزات هذا التفسير أن المؤلف قد سرد الدروس المستفادة المتعلقة بكل آية مفسرة تحت عناوين مستقلة.

أرى ان هذا التفسير سوف تفيد العوام كما أتمنى أن يجد المتخصصون أيضا ضالتهم.

أتمنى لجهده قبولا واسعا فى أوساط الباحثين عن الهداية من كتاب الله عز وجل.

وتقبل الله منى ومناجميعا . آمين.

٢٠١٠/٥/٩ م

أ. د. وهبة مصطفى الزحيلى.

সংক্ষিপ্ত সূচি

ভূমিকা			১১
প্রসঙ্গ কথা			১৩
প্রথম অংশ : সূরা ফাতিহার উপর আলোচনা			**১৯**
প্রথম অধ্যায়	:	সূরা ফাতিহা : অর্থ ও সংক্ষিপ্ত টিকা	২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম	২৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	৩৩
চতুর্থ অধ্যায়	:	আল্হামদুলিল্লাহ্	৪৬
পঞ্চম অধ্যায়	:	রাব্বিল আলামীন	৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	আর্রাহমানির রাহীম	৬৪
সপ্তম অধ্যায়	:	মালিকি ইয়াউমিদ্দীন	৭৩
অষ্টম অধ্যায়	:	ইয়্যাকা না'বুদু	৮৭
নবম অধ্যায়	:	ইয়্যাকা নাস্তাঈন	১০৩
দশম অধ্যায়	:	ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম	১১৩
একাদশ অধ্যায়	:	সিরাতাল্লাযীনা আন্'আমতা আলাইহিম	১৩৫
দ্বাদশ অধ্যায়	:	গাইরিল মাগ্দূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্যাল্লীন	১৪৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	আমীন	১৫৯
দ্বিতীয় অংশ : সূরা ফাতিহার মর্ম ও শিক্ষা			**১৬৩**
চতুর্দশ অধ্যায়	:	সূরা ফাতিহার শিক্ষা	১৬৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	:	পরিশিষ্ট	১৯৯
গ্রন্থপঞ্জি	:		২১১

বিস্তারিত সূচি

ভূমিকা ১১

সূরা ফাতিহা : প্রসঙ্গ কথা ১৩

সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার সময় ১৩

সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট ১৪

সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু ১৫

বইটির কাঠামো ১৮

প্রথম অংশ : সূরা ফাতিহার উপর আলোচনা ১৯

প্রথম অধ্যায় : সূরা ফাতিহা : অর্থ ও সংক্ষিপ্ত টিকা ২০

দ্বিতীয় অধ্যায় : আউযুবিল্লাহিমিনাশ শাইতানির রাজীম (বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি) ২৪

আউযুবিল্লাহর অর্থ ও তাৎপর্য ২৫

সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের কোন অংশ পাঠকালে 'আউযুবিল্লাহ্' পড়া ২৭

নামাযে 'আউযুবিল্লাহ' পড়া ৩৮

শয়তান, শয়তানের দল এবং এ দলের কর্মসূচি ২৯

তৃতীয় অধ্যায় : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি) ৩৩

বিসমিল্লাহ : অর্থ ও তাৎপর্য ৩৩

'বিসমিল্লাহ' কুরআন ও সূরা ফাতিহার আয়াত কি না ৩৭

নামাযে বিসমিল্লাহ পাঠ ৪১

বিসমিল্লাহ : ভাষা ও বৈশিষ্ট্য ৪৩

চতুর্থ অধ্যায় : আলহামদু লিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর) ৪৬

আল্‌হামদুলিল্লাহ্ : অর্থ ও তাৎপর্য ৪৬

আল্লাহর অস্তিত্ব : সৃষ্টিতত্ত্ব ৫০

	তাওহীদ (একত্ববাদ)	৫১
	আল্লাহর প্রশংসা এবং সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ	৫২
পঞ্চম অধ্যায়	**: রাব্বিল আলামীন (যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)**	**৫৪**
	রব ও আলামীন : অর্থ ও তাৎপর্য	৫৪
	প্রতিপালকের প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও ইবাদত	৬০
	অন্যায় উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই	৬১
	উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব	৬২
ষষ্ঠ অধ্যায়	**: আররাহমানির রাহীম (যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু)**	**৬৪**
	রাহমান ও রাহীম : অর্থ ও তাৎপর্য	৬৪
	আল্লাহ করুণাময় হলে দুনিয়াতে এতো কষ্ট কেন?	৬৮
	ভুল হলে নৈরাশ্য নয়, বরং প্রত্যাবর্তন, ক্ষমা প্রার্থনা ও আনুগত্য কাম্য	৭২
সপ্তম অধ্যায়	**: মালিকি ইয়াউমিদ্দীন (যিনি বিচার দিনের মালিক)**	**৭৩**
	আখিরাতে বিশ্বাস	৭৪
	আল্লাহ করুণাময় হলে আখিরাতে বিচার ও শাস্তি কেন?	৭৬
	বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি	৭৮
	অধিপতি কি শুধু আখিরাতে?	৮০
	মালিক : একটি শাব্দিক আলোচনা	৮৩
	'মা-লিক' (مٰلِك)	৮৩
অষ্টম অধ্যায়	**: ইয়্যাকা না'বুদু (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি)**	**৮৭**
	আল্লাহর ইবাদত : অর্থ ও তাৎপর্য	৮৭
	একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদত	৯০
	তাওহীদ ও একত্ববাদ	৯২
	আল্লাহর ইবাদত থেকে কাম্য	৯৬
	ইবাদতের সামষ্টিকতা	৯৮
	মানুষের স্বাধীনতা	১০০
	সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের বাচনভঙ্গি প্রসঙ্গ	১০১

নবম অধ্যায় : ইয়্যাকা নাস্তাঈন (আমরা শুধু তোমারই সাহায্য প্রর্থনা করি) ১০৩

ইয়্যাকা নাস্তাঈন : অর্থ ও তাৎপর্য ১০৩

মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ১০৪

সত্যপথ সন্ধান, ইবাদত ও আনুগত্যে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ১০৬

দুনিয়াতে আল্লাহর সাহায্য ১০৮

মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়ার অনুমতি আছে কিনা ১০৯

সাহায্য প্রার্থনার সামষ্টিকতা ১১২

দশম অধ্যায় : ইহদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম (আমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দাও) ১১৩

হিদায়াত : অর্থ ও তাৎপর্য ১১৩

হিদায়াতের রোডম্যাপ কুরআন ১১৫

সিরাতুল মুস্তাকীম কি? ১১৬

দীন ইসলামই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম ১১৭

কুরআন হলো সিরাতুল মুস্তাকীম ১১৯

রাসূলের আদর্শ হলো সিরাতুল মুস্তাকীম ১২১

আল্লাহর ইবাদত হলো সিরাতুল মুস্তাকীম ১২৫

হিদায়াত বা সোজা পথ পাওয়ার শর্ত ১২৬

হিদায়াত প্রার্থনা কেন প্রয়োজন ১২৮

একাদশ অধ্যায়: সিরাতাল্লাযীনা আন্'আম্তা আলাইহিম (তাদের পথে যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ) ১৩৫

আল্লাহর নিয়ামত : অর্থ ও তাৎপর্য ১৩৬

নিয়ামত প্রাপ্ত কারা এবং তাদের পথ কি? ১৪২

দু'আটির বাচনভঙ্গি ১৪৫

দ্বাদশ অধ্যায় : গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্যাল্লীন (তাদের পথে নয়, যারা অভিশাপ বা ক্রোধে পতিত, আর যারা পথভ্রষ্ট) ১৪৮

'মাগদূব' ও 'দ্যাল্লীন' (ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্ট): অর্থ ও তাৎপর্য ১৪৯
ইতিহাস থেকে শিক্ষা ১৫৩
সৎসঙ্গ গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ বর্জন ১৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় : আমীন (হে আল্লাহ, আমাদের দু'আ কবুল করো) **১৫৯**

নামাযে আমীন বলা প্রসঙ্গ ১৬০

দ্বিতীয় অংশ : সূরা ফাতিহার মর্ম ও শিক্ষা **১৬৩**

চতুর্দশ অধ্যায় : সূরা ফাতিহার শিক্ষা **১৬৫**

পঞ্চদশ অধ্যায় : পরিশিষ্ট **১৯৯**

সূরা ফাতিহার নামকরণ ১৯৯
সূরা ফাতিহা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা-মাসায়েল ২০৩
নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ ২০৩
ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ ২০৪
সূরা ফাতিহার ফযিলত ২০৮

গ্রন্থপঞ্জি **২১১**

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ لِهِدَايَةِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَجْمَعِيْنَ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَاَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ- وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَلٰى مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ الْكَرِيْمَ وَعَلَّمَهٗ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ لِاِقَامَةِ الدِّيْنِ لِقَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ: وَاَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ-"

সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন বা কুরআনের মূল ভিত্তি, সারমর্ম ও নির্যাস। মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য কুরআন যে জীবন-দর্শন, জীবন-ব্যবস্থা পেশ করে, সূরা ফাতিহা তার একটা সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভূমিকা। এ ভূমিকার রূপরেখা অনুযায়ী গোটা কুরআন সাবলীল ভাষায় এ জীবন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো উপহার দিয়েছে। এরপর তার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনমুখী বাস্তবায়ন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে, যা সুবিন্যস্ত সুন্নাহ্‌শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ হিসেবে গোটা কুরআন ও সুন্নাহ্‌ই সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা যায়। সুতরাং সচেতন মন ও গভীর মনোযোগের সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে কুরআন ও সুন্নাহে প্রদত্ত ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো মনের আয়নায় ভেসে উঠে, ঈমান মযবুত হয়। আল্লাহতে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে প্রদত্ত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির নবায়ন হয়।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সূরা ফাতিহা বার বার পাঠ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ নিজেই এর নাম দিয়েছেন 'আস্‌সাব্‌উল মাছানী' (اَلسَّبْعُ الْمَثَانِى) বা 'বার বার পঠিত সাতটি আয়াত'। বিধান দেয়া হয়েছে, প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে তা পাঠ করতে হবে। বলা হয়েছে, এ সূরা ছাড়া নামায হয় না।

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব আছে বলেই এ সূরাটিকে এতো বেশি পড়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকল দেশে সর্বত্র সকল মুসলমান প্রতিদিন কেবল ফরয নামাযেই ১৭ বার সূরাটি পাঠ করে আসছে। ওয়াজিব, সুন্নাহ ও নফল নামাযে আরো বহুবার পাঠ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন কারণে প্রতিদিন এ সূরাটি আরো বহুবার পঠিত হয়।

কুরআনের সারমর্ম ও নির্যাস হিসেবে সূরা ফাতিহার আধ্যাত্মিক মূল্যও অপরিসীম। কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলতেন, 'সূরা ফাতিহা পাঠ করো'। কুরআনের এ সার ও নির্যাস দ্বারা রোগ ভালো হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সূরা ফাতিহা পাঠ করলে এর প্রতিটি কথার জবাব আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে দেন। যেমন, যখন বলা হয় 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' (শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি), তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা যে সাহায্য চেয়েছে আমি তাকে তা দিলাম'। আজ প্রতিটি মুহূর্তে শত সহস্রবার ইয়্যাকা নাস্তাঈন পাঠ করা হচ্ছে, কিন্তু এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহর সাহায্য কামনার কথা কয়জনের মনে থাকে? সাহায্যের কামনা ও প্রার্থনাই যদি না থাকে, তবে মন্ত্রের মতো কথাগুলো উচ্চারণ করলে কি কাঙ্ক্ষিত ফল আশা করা যায়?

দুঃখের বিষয় আমাদের অনেকেরই সূরা ফাতিহার অর্থ ও মর্ম জানা নেই। যে ছোট্ট সূরাটির এতো গুরুত্ব, যা প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে পাঠ করতে হয়, তার অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা জানা সবার জন্যই প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যাঁরা সূরা ফাতিহার অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁরা এ বইটি থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করি। আর যাঁরা এ সূরাটির মর্ম সম্পর্কে আরো গভীরে প্রবেশ করতে চান, তাঁরাও এখানে চিন্তার কিছুটা খোরাক পাবেন বলে আমার ধারণা।

হে আল্লাহ, অধমের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এটিকে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আর একে আমার, আমার পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন ও সকলের নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন!

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক
মাসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ)
মক্কা মুকাররামাহ
২৭ রমযান ১৪২৬, ৩০ অক্টোবর ২০০৫।

প্রসঙ্গ কথা

সূরা ফাতিহা হলো পবিত্র কুরআনের ভূমিকা। আর কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত বা সরল সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা। মানুষের আসল বাড়ি হলো জান্নাত। সেখান থেকে মানুষের আদি পিতা আদম (আ) পৃথিবীতে এসেছেন। এ পৃথিবী থেকে জান্নাতে ফিরে যাওয়ার জন্য একটাই সোজা পথ রয়েছে, যার নাম 'সিরাতুল মুস্তাকীম'। কুরআন সে পথ দেখায়। কুরআন পাঠ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে সে পথ খুঁজে নিতে হবে। সে পথ ধরেই জান্নাতের বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব। হিদায়াতের মহাগ্রন্থ কুরআনে প্রথমেই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে সে সোজা পথের সংক্ষিপ্ত রোডম্যাপ দেয়া হয়েছে।

সূরা ফাতিহা হলো হিদায়াতের মহাগ্রন্থ তথা কুরআনের ভূমিকা ও সূচনা। কোন গ্রন্থের ভূমিকাতে যেমন তার বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত থাকে, তেমনি সূরা ফাতিহা কুরআনের মূল বক্তব্যের ইঙ্গিত বহন করে। এ বিবেচনায় সূরা ফাতিহা হিসেবে সূরাটির নামকরণ যথার্থ।[১]

এ সূরায় ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর ঘোষণা রয়েছে। স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক, আখিরাত ও শেষ বিচার ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এ সূরায়। এসব বিশ্বাসই ইসলামী জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তি।

সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার সময়

সূরা ফাতিহা হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়ত লাভের পর প্রথম দিকের সূরা। সর্বপ্রথম 'ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকা' নাযিল হয়েছে। এটিই হলো স্বীকৃত অভিমত। তবে কোন কোন আলেম বলেন, সূরা ফাতিহা প্রথম নাযিল হয়েছে। আসলে এ দু'টি মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 'ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকা' সহ আরো কিছু খণ্ড খণ্ড আয়াত[২] প্রথম দিকে নাযিল হলেও একটা পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সূরা ফাতিহাই প্রথম সূরা। সারকথা, সূরা ফাতিহা নবুওয়তের প্রথম দিকের সূরা।

---

১. পরিশিষ্টে সূরা ফাতিহার নামকরণ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

২. যেমন সূরা মুদ্দাসসির ও সূরা মুয্‌যাম্মিলের প্রথম কয়েকটি আয়াতও নবুওয়তের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে বলে বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে তাফসীরগ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা আছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, মুহাম্মদ তাহির বিন আশুর তিউনিসি,তাফসীর ইবনে আশুর, ইতিহাস ফাউন্ডেশন, বৈরুত, লেবানন, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪।

সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট

সূরা ফাতিহা শেষ নবী (সা)-এর নবুওয়তের প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরা। সে সময়কার অবস্থা, বিশেষ করে আরবের অবস্থা বিবেচনা করলেই সূরাটির প্রেক্ষিত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের সকল দিক দিয়েই মানুষ তখন ভ্রষ্টতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারা জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও যৌক্তিকতার পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার দ্বারা পরিচালিত হতো। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

প্রথম, ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা সাধারণত কোন না কোন উপাস্যে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সে বিশ্বাস ছিল বিচিত্র ধরনের। কেউ কেউ নিজ হাতে প্রস্তর-মূর্তি নির্মাণ করে তাকে উপাস্যের আসনে বসিয়ে দিতো, তার উপাসনা করতো এবং তাকে ভাগ্য বিধাতা হিসেবে বিশ্বাস করতো। এমন উপাস্যের সংখ্যাও ছিল অনেক। এমন কি কা'বা ঘরেই ছিল ৩৬০টি মূর্তি। আবার কেউ ছিল অগ্নিপূজক, যারা আগুনের পূজা করতো। কেউ বিশ্বাস করতো ত্রিত্ববাদে, যারা তিন উপাস্যের উপাসনা করতো (আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র যিশুখ্রিস্ট ও তাঁর মাতা ম্যারী বা মরিয়ম)। নাউযুবিল্লাহ্!

দ্বিতীয়, তাদের এ ধর্মবিশ্বাস প্রধানত বিশ্বাস ও উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মানব জীবনে সে ধর্মবিশ্বাসের কোন প্রায়োগিক প্রতিফলন ছিল না। অর্থাৎ তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী কোন জীবন-ব্যবস্থা ছিল না, জীবনের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর প্রধান দিক ছিল উপাস্যের উপাসনা করা এবং ভাগ্য বিধাতা হিসেবে তাদের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। সুতরাং তাদের বাস্তব জীবনে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আদর্শিক বিধি-বিধান বা নীতি-নৈতিকতার বালাই ছিল না।

তৃতীয়, যেহেতু বাস্তবজীবনে তাদের কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বা বিধি-নিষেধ ছিল না, সেহেতু জবাবদিহিতারও প্রশ্ন ছিল না। কাজেই তাদের বিশ্বাসে আখিরাতের ভূমিকা ছিল না। তাদের অনেকেই মনে করতো, আখিরাত বলে কিছু নেই। মৃত্যুর পর পঁচে-গলে যাওয়া মানবদেহের পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

চতুর্থ, ধর্মীয় জীবনাদর্শের বাধ্যবাধকতা ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনা না থাকায় তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। জোর যার মুল্লুক তার, এটাই ছিল তখনকার নীতি। গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, উচ্ছৃংখলতা ও বিশৃংখলা ছিল সমাজের সাধারণ চিত্র। সামাজিক অবস্থা এতো নীচে চলে গিয়েছিল যে, শক্তিশালী গোত্রের মানুষ কর্তৃক

দুর্বলের উপর দিবা নিশিতে আক্রমণ করে সর্বস্ব লুট করে নেয়া এবং তাদের সুন্দরী মেয়ে ও নারীদেরকে নিয়ে ভোগের আসর বসানোকেও গর্বের বিষয় মনে করা হতো। এসব গর্বগাঁথা কাব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হতো, এবং তা কা'বা ঘরে টানিয়ে রাখা হতো।

এক কথায় তৎকালীন সময়টা ছিল কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার এক বাস্তব উদাহরণ। এ কারণেই মানব ইতিহাসে সে সময়টি আইয়ামে জাহিলিয়্যা বলে পরিচিত ও অভিহিত।

সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু

এমন জাহিলী প্রেক্ষাপটেই মানুষকে সুপথে নিয়ে আসার জন্য শেষ নবী (সা) শান্তির দীন ইসলাম নিয়ে আসেন। এ দীনের মৌলিক দলিল হলো কুরআন, যার ভূমিকা হলো সূরা ফাতিহা। সূরা ফাতিহায় রয়েছে মানুষকে উপরে উল্লেখিত সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে বাঁচিয়ে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনার প্রয়াস। সব কল্পকাহিনী বাদ দিয়ে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহতে বিশ্বাস, জীবনের উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা, সে জবাবদিহিতার জন্য বিচার ও বিচার দিবস এবং বিচারের রায় অনুযায়ী আখিরাতের অনন্তকালীন জীবন, এসব বিশ্বাস সূরায়ে ফাতিহার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষেপে সূরা ফাতিহায় ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়সমূহের দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে গোটা কুরআনের সর্বত্র। সংক্ষেপে এর বিষয়বস্তু হলো নিম্নরূপ :

প্রথম, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য', প্রথমেই এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হলো আল্লাহতে ঈমান। এ জগত এমনিতেই অস্তিত্বে আসেনি, বরং এর পেছনে রয়েছেন এক মহাশক্তিশালী স্রষ্টা, আল্লাহ। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। সুতরাং তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী।

দ্বিতীয়, আল্লাহ শুধু স্রষ্টাই নন, তিনিই গোটা সৃষ্টিজগতের সবকিছুর প্রতিপালক, রক্ষক ও ব্যবস্থাপক। তিনি রববুল আলামীন। সৃষ্টিজগতের যেখানে যখন যা যেভাবে প্রয়োজন, তিনি তখন সেভাবে তার ব্যবস্থা রেখেছেন।

তৃতীয়, আল্লাহ গোটা সৃষ্টিজগতের যে মহা আয়োজন করেছেন, তা অনর্থক হতে পারে না, বরং তার কোন মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। তা হলো আল্লাহর ইবাদত। সূরা ফাতিহার মাধ্যমে সে ইবাদতের প্রত্যয় ও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়, 'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি'। ইবাদতের অর্থ অনেক ব্যাপক। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কয়েকটি নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সাথে সাথে জীবনের সকল দিক ও পর্যায়ে আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান গ্রহণ ও অনুসরণ করা। গোটা কুরআন হলো সে জীবন-বিধানের দলিল। বলাবাহুল্য, এ ইবাদতের ঘোষণার মাধ্যমে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। সম্পর্ক হলো দাসত্ব ও বন্দেগির। দাস যেমন মনিবের ইচ্ছার নিকট নিজ ইচ্ছাকে বিলীন করে দেয়, মনিবের সকল আদেশ নিষেধ শিরোধার্য করে নিয়ে তাঁর খুশির জন্য সবকিছু করে, মানুষও দুনিয়াতে দাসত্ব করবে এবং আল্লাহর দেয়া মিশন বাস্তবায়নের জন্য সবকিছুই করবে। সূরা ফাতিহায় আল্লাহর ইবাদতের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যয় ব্যক্ত করে স্রষ্টা ও মানুষের এ সম্পর্ককে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ, এ পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়, বরং আখিরাতে রয়েছে অনন্তকালের জীবন। এ মহাসৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মানুষ ও জিন জাতিকে। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার জন্য রয়েছে কিয়ামতের বিচার দিবস, যার একচ্ছত্র অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ। সে বিচারের ফলাফল অনুযায়ী রয়েছে অনন্তকালের জান্নাত ও জাহান্নাম। সূরা ফাতিহায় রয়েছে বিচার দিবসে আল্লাহর একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার ঘোষণা ও বিশ্বাস, যার মধ্যে আখিরাতের অস্তিত্ব ও কিয়ামতের বিচারসহ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পঞ্চম, আল্লাহ হলেন এক, একক ও অদ্বিতীয়। সূরা ফাতিহায় একমাত্র তাঁর ইবাদতের ঘোষণা দেয়া হয় (ইয়্যাকা না'বুদু), কারণ একমাত্র তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সেহেতু সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর এবং শুধু তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে। এভাবে সূরা ফাতিহায় একাধিক উপাস্যের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়। এর সার কথা হলো তাওহীদ।

ষষ্ঠ, সূরা ফাতিহায় রয়েছে বন্দেগির দায়িত্ব এবং মিশন পালন ও সত্য-সোজা পথে চলার ব্যাপারে আল্লাহর হিদায়াত কামনা, আর এ কামনার মাধ্যমে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি করা, যাতে হিদায়াতের গ্রন্থ কুরআন থেকে কাম্য ও বাঞ্ছিত হিদায়াত পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত। সৃষ্টির উৎস কি, মানুষ কোথেকে এলো, মানব জীবনের উদ্দেশ্য

কি, কীভাবে সে উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়, সে উদ্দেশ্য হাসিল করলে কী হবে, আর তা না করলে কী পরিণতি হবে, কুরআন এমন সকল প্রশ্নের জবাব দেয়। এক কথায়, যেখান থেকে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, কুরআন সেখানে ফিরে যাওয়ার সহজ সরল সোজা পথই প্রদর্শন করে। সে পথের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। কুরআনের ভূমিকা হিসেবে সূরা ফাতিহায় অর্থাৎ কুরআন পাঠের শুরুতেই সে হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা লাভের দু'আ রয়েছে, যার মাধ্যমে কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য সহায়ক ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়।

সপ্তম, সূরায় ফাতিহায় রয়েছে কুরআনে বর্ণিত মানব ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণা। এতে রয়েছে তাদের পথে হিদায়াতের দু'আ, যাঁরা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন. আর অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে বাঁচার দোয়া। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময় যাঁরা আল্লাহর দেয়া জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছেন, কুরআনে তাদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের মতো অনুগ্রহ লাভের সক্রিয় কামনা ও দু'আ হলে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। সাথে সাথে বর্ণিত হয়েছে বাতিলপন্থি তথা আল্লাহর দেয়া জীবনাদর্শ প্রত্যাখ্যানকারীদের করুণ পরিণতির ইতিহাস। সে পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে বাতিল ত্যাগ করে সত্যের পথে চলতে হবে, যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে রয়েছে।

সারকথা, সূরা ফাতিহা পাঠ করা মানে আল্লাহ ও আল্লাহর একত্ববাদসহ ইসলামী জীবন-দর্শনের সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমানের ঘোষণা দেয়া। 'ইয়্যাকা না'বুদু' বলে ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, জীবন সার্থক হয়। কিন্তু সূরা ফাতিহা থেকে এ ফায়দা তখনই পাওয়া যাবে, যখন এ সূরার বক্তব্যকে হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হবে। শুধু মন্ত্রের মতো পাঠ করলে সে ফল কীভাবে লাভ করা যাবে? সে জন্য সূরা ফাতিহার প্রতিটি কথা ও বক্তব্য উচ্চারণের সাথে সাথে হৃদয়ের গভীরে তার উপলব্ধি থাকতে হবে, দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, এবং প্রতিটি কথা ও ঘোষণার দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার

প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এ সূরার প্রকৃত অর্থ ও মর্মই যদি জানা না থাকে, তা হলে এমন উপলব্ধি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। (সূরা ফাতিহার বক্তব্য, মর্ম ও শিক্ষা আরো বিস্তারিতভাবে চতুর্দশ অধ্যায়ে দেয়া হলো।)

বইটির কাঠামো

বইটিতে প্রধান দু'টি অংশ আছে। এ প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর প্রথম অংশে রয়েছে সূরা ফাতিহার উপর বিস্তারিত আলোচনা, তেরটি অধ্যায়ে। তবে এ অংশের প্রথম অধ্যায়ে আছে সংক্ষিপ্তভাবে সূরা ফাতিহার অর্থ ও টিকা। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই বিস্তারিত আলোচনা শুরু, যা শুরু হয়েছে 'আউযুবিল্লাহ' অধ্যায় দিয়ে, যদিও তা সূরা ফাতিহার অংশ নয়। কারণ সূরা ফাতিহা দিয়েই কুরআন শুরু এবং 'আউযুবিল্লাহ্' দ্বারা কুরআন পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে। পরের অধ্যায়টি বিসমিল্লাহ্ সম্পর্কে। কারণ, বিসমিল্লাহ্ দ্বারা কুরআন পাঠসহ সকল কাজ শুরু করা সুন্নত এবং কারো কারো মতে 'বিসমিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার একটি আয়াত। এ দুটি অধ্যায়ের পর সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের উপর এমনকি কোনো কোনো আয়াতের অংশের উপর মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে। প্রথম অংশ শেষ হয়েছে 'আমীন' এর অধ্যায় দিয়ে, কারণ 'আমীন' সূরা ফাতিহার অংশ না হলেও 'আমীন' দ্বারা সূরাটি শেষ করা সুন্নত।

দ্বিতীয় অংশে আছে সূরা ফাতিহার শিক্ষা। আসলে এটি হলো প্রথম অংশের তেরটি অধ্যায়ের বিস্তারিত মৌলিক আলোচনার নির্যাস বা সার সংক্ষেপ। অন্যান্য অধ্যায়গুলো পাঠ করলেও 'সূরা ফাতিহার শিক্ষা' শিরোনামে অধ্যায়টি পড়লে ভালো হবে, কারণ এতে শিরোনামগুলোকে সমন্বিতভাবে একত্রে পেশ করা হয়েছে।

সবশেষে আছে একটি পরিশিষ্ট, যাতে রয়েছে সূরা ফাতিহার নামকরণ, এ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা-মাসায়েল ও সূরা ফাতিহার ফযিলত ইত্যাদি।

প্রথম অংশ

সূরা ফাতিহার উপর আলোচনা

প্রথম অধ্যায়

সূরা ফাতিহা : অর্থ ও সংক্ষিপ্ত টিকা

اٰيَاتُهَا ٧

(١) سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ (٥)

رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ١
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ ٢ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ؕ ٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ ؕ ٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ ٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ٧

অনুবাদ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু[১] আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য[২] যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক ।[৩]

(২) তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু ।

(৩) বিচার দিবসের মালিক ।[৪]

(৪) আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি[৫] আর শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি ।[৬]

(৫) আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীম এর হিদায়াত দাও ।[৭]

(৬) তাঁদের পথে যাঁদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছো ।[৮]

(৭) তাঁদের পথে নয়, যারা ক্রোধে পতিত (বা যাদের উপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে), আর (তাদের পথেও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ।[৯]

টিকা

(১) "রাহমান" ও "রাহীম" দুটি শব্দ দ্বারাই আল্লাহর সীমাহীন করুণা ও দয়া বুঝায় । কেউ কেউ বলেন, এ দুটি শব্দে একই মাত্রার করুণা বুঝায় । তবে আল্লাহর অপার করুণার প্রতি জোর দেয়ার জন্য দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে । আবার অনেকে বলেন, "রাহমান" হলো "রাহীম" থেকে ব্যাপকতর । (ব্যাখ্যার জন্য ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ।

(২) সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, কেননা তিনিই হলেন সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক । তিনিই সবকিছুর দাতা, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে । সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ।

(৩) জগতসমূহ অর্থ সকল সৃষ্টিঃ পৃথিবীর প্রাণীজগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত, জল-স্থলসহ সবকিছু, সৌরজগতের সকল গ্রহ-নক্ষত্র এবং ছায়াপথের সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা । তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক । তাঁরই হাতে সবকিছুর লালন পালন ও প্রতিপালন ।

(৪) আল্লাহ সবকিছুরই মালিক । কিন্তু এখানে শুধু বিচার দিনের মালিক বলা হয়েছে । কিয়ামতের দিনের গুরুত্ব, বড়ত্ব, ও মহত্ত্ব বুঝাবার জন্যই এখানে

শুধু বিচার দিবসের উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ দুনিয়াতে কিছু ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করে, কিন্তু কিয়ামতের বিচার দিবসে কারো টু শব্দটি করার ক্ষমতা থাকবে না। সেদিনের একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ। উল্লেখ্য, কিয়ামত, আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিশ্বাসই আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নেই যার সামনে মানুষ মাথা নত করবে, অথবা যার আনুগত্য করা যায়। এমন কোন মতবাদ নেই যা শিরোধার্য করে নেয়া যায় বা যা অনুসরণ করা যায়। এর মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

(৬) কেউ এমন নেই, যার নিকট মানুষ সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। দুনিয়া ও আখিরাতে, সকল ব্যাপারেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

(৭) এখানে আল্লাহর নিকট সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা রয়েছে। যে পথে চলে সরাসরি জান্নাতে যাওয়া যায়, তাই হলো হিদায়াতের পথ। হিদায়াতের এ প্রার্থনার মাধ্যমে কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

(৮) অনুগ্রহ প্রাপ্তরা হচ্ছেন নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্কারগণ। তাঁরা আল্লাহর মনোনীত সিরাতুল মুস্তাকীম বা হিদায়াতের সোজা পথে চলে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন। কুরআনে তাঁদের অনেকের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে সেসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণা দেয়া হয়েছে।

(৯) ক্রোধে পতিত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হলো তারা, যারা সিরাতুল মুস্তাকীম বা দীন ইসলাম ও সত্যপথ ত্যাগ করে ভুল পথের যাত্রী হয় এবং মন্দ কাজ করে। অনেক তাফসিরকারক বলেছেন, অভিশপ্ত বলে ইহুদি এবং পথভ্রষ্ট বলে খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সত্য পথ ত্যাগ করে ভুল পথের যাত্রী হয়েছে। কুরআনে আল্লাহর ক্রোধে পতিত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষ ও জাতিসমূহের বর্ণনা আছে। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এ আয়াতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ (সংক্ষেপে 'আউযুবিল্লাহ্') সূরা ফাতিহার অংশ নয়। উলামায়ে দীনের সর্বসম্মত অভিমত হলো এই যে, 'আউযুবিল্লাহ' কুরআনের কোন আয়াত নয়, এমন কি কোন আয়াতের অংশও নয়। তবে কুরআন পাঠ করার সময় 'আউযুবিল্লাহ্' পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

"অতএব, যখন তুমি কুরআন পাঠ করো, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।"[৩]

যেহেতু সূরা ফাতিহা শুধু কুরআনের অংশই নয়, বরং কুরআনের ভূমিকা হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সূরা, সেহেতু সূরা ফাতিহা পাঠের সময় 'আউযুবিল্লাহ' পড়া উচিত। উল্লেখ্য, শুধু কুরআন পাঠের সময়ই নয়, বরং শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার সাধারণ নির্দেশও রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ- مَلِكِ النَّاسِ- إِلٰهِ النَّاسِ- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ- الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

"বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা (শয়তান)-এর অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"[৪]

এভাবে সূরা ফাতিহা বা কুরআনের যে কোন অংশ পাঠের সময় এবং সাধারণভাবে সর্বদাই শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ রয়েছে। কাজেই এখানে 'আউযুবিল্লাহ' প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হলো।

---

৩. আল-কুরআন ১৬ : ৯৮।

৪. আল-কুরআন ১১৪ : ১-৬।

আউযুবিল্লাহর অর্থ ও তাৎপর্য

আউযুবিল্লাহ্ দ্বারা শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। শয়তান মানুষকে সর্বদা বিপথে চালাবার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করেঃ ভালো মন (نفس لوامه) ও মন্দ মন (نفس اماره)। মন্দ মন মানুষকে দুনিয়ার আকর্ষণীয় ও লোভনীয় জিনিসের দিকে প্ররোচিত করে এবং খারাপ পথে চলতে উৎসাহিত করে। অন্যদিকে ভালো মন খারাপ কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করে। ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে শয়তান খারাপ মনকে শক্তি যোগায়, মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিত করে, সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে।[৫] শয়তানের এ প্ররোচনার ফলে মানবমনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, আর সেহেতু সে মন্দের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সুতরাং শয়তান হলো মানুষের শত্রু ও দুশমন। এ শয়তানকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে আল্লাহ আমাদেরকে তার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

(১) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ -

(২) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ -

(৩) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ-

(১) "নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার দলের লোকদেরকে জাহান্নামবাসী হওয়ার জন্যই আহবান জানায়।"[৬]

(২) "হে আদম সন্তান, শয়তান যেনো তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে (নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার প্ররোচনা দিয়ে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে।"[৭]

---

৫. প্রকৃত পক্ষে শয়তানের কাজই হলো মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে কুপথে নিয়ে যাওয়া এবং পথভ্রষ্ট করা। আদম (আ) কে সিজদাবনত হয়ে সম্মান প্রদর্শনে অস্বীকার করে যখন শয়তান বিতাড়িত হয় এবং আল্লাহর গযবে পতিত হয়, তখন সে মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার ব্যাপারে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দেয় এবং এ কাজ করার জন্য আল্লাহর নিকট সে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চায়। আল্লাহ তাকে এ অবকাশ দেন। সুতরাং সে এ কাজ অবিশ্রান্তভাবে করেই চলেছে। দেখুন, আল কুরআন ৭: ১১-১৮।

৬. আল-কুরআন ৩৫ : ৬।

৭. আল-কুরআন ৭ : ২৭।

(৩) "হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে (স্পষ্টভাবে একথা) বলে দিইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত (আনুগত্য) করো না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৮]

কাজেই শয়তান হলো মানুষের শত্রু। সে মানুষকে সুপথ থেকে বিচ্যুত করে কুপথে নিয়ে যেতে চায়। মানুষ প্রকাশ্য শত্রু থেকে কৌশল ও শক্তির মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে অদৃশ্যভাবে প্ররোচিত করতে পারে[৯] এবং বিপথে নিয়ে যেতে পারে। বস্তুবাদী কৌশল ও শক্তি দ্বারা শয়তানের ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক শক্তি, সতর্কতা এবং আল্লাহর সাহায্য। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার একটি কার্যকর উপায় হলো শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা। আল্লাহ নবীদেরকেও শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

(১) وَقُل رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ -

(২) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

(১) "(হে নবী) বলো, হে আমার প্রতিপালক, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"[১০]

(২) "আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তা হলে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো। নিঃসন্দেহে তিনি সব শুনেন, সব জানেন।"[১১]

সুতরাং নবীগণ নিজেও শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আর তাঁদের উম্মতের মানুষকেও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস বর্ণিত আছে।[১২]

---

৮. আল-কুরআন ৩৬:৬০।

৯. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, শয়তান মানুষের ধমনির রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলতে পারে। দেখুন, আবু আব্দুল্লাহ বিন উমর ফখরুদ্দীন আর-রাযি, তাফসীরে কাবীর, দারুল হাদিস, মুলতান, পাকিস্তান, পৃষ্ঠা ৮৫। সহী বুখারী, হাদিস নং-২০৩৫

১০. আল-কুরআন ২৩:৯৭।

১১. আল-কুরআন ৭:২০০।

১২. এ ধরনের হাদিসের জন্য আগ্রহী পাঠকরা হাদিসগ্রন্থ অথবা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযির তাফসীরে কবীর এর সূরা ফাতিহা অংশ দেখতে পারেন। দেখুন, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর ফখরুদ্দীন আর-রাযি, তাফসীর কাবীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬-৯৯।

অতএব যে কোন কাজ করার সময়, এবং যখনই কোন খারাপ কাজের প্ররোচনা মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে 'আউযুবিল্লাহ' পড়া উচিত।

আউযুবিল্লাহ্ শুধু মুখের একটা কথা নয়। বরং এর মর্ম সুদূর প্রসারী। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথম, মানুষ যখন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে তখন তার বিনয় ও অপরাগতা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়, এতে আল্লাহর মহত্ত্ব ও মহাশক্তি প্রকাশ পায়, কারণ মানুষ তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করছে।

এভাবে যখন মানুষ নিজ অপরাগতা প্রকাশ করে বিনয়ের সাথে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করে, তখন তার বান্দাসুলভ মনোভাব ও আচরণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয়, এ দ্বারা শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। চতুর্থ, যে শয়তান আল্লাহর দীনের বিরোধিতার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, সেই শয়তানের বিরোধিতা করে আল্লাহর দীনের পক্ষ নেয়া হয়। এতে একদিকে বান্দার ঈমান ও বন্দেগির গুণে উন্নয়ন সাধিত হয়, অন্যদিকে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেন।

সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের কোন অংশ পাঠকালে 'আউযুবিল্লাহ্' পড়া

কুরআন হলো হিদায়াত। সুতরাং কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করা উচিত সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বচ্ছ মন নিয়ে, সত্য সন্ধানের কামনা সহকারে, কুপ্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে এবং আদর্শিক শত্রুর অপপ্রচারণা ও সন্দেহ প্রবণতার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে। এরূপ মানসিকতা নিয়ে কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে শয়তানের কুমন্ত্রণা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মানুষ যখন কুরআন পাঠ ও অধ্যয়ন করে, তখন শয়তান কুরআন ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ সৃষ্টিতে উদ্যত হতে পারে। এতে করে পাঠকের একাগ্রতা ও নিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। ফলে কুরআন পাঠ থেকে পূর্ণ ফায়দা পেতে অসুবিধা হতে পারে। কাজেই কুরআন পাঠের পূর্বে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া প্রয়োজন। আল্লাহই সে নির্দেশ দিয়েছেন।[১৩]

সুতরাং কথা দাঁড়ালো এই যে, সূরা ফাতিহা বা কুরআনের যে কোন অংশ পাঠের সময় 'আউযুবিল্লাহ্' পাঠ করা উচিত। তবে 'আউযুবিল্লাহ্' পাঠ করা কি

---

১৩. আল-কুরআন ১৬:৯৮।

পর্যায়ের কর্তব্য তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।[১৪]

আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, নামাযে হোক বা নামাযের বাইরে হোক, কুরআন তিলাওয়াত করার সময় 'আউযুবিল্লাহ' পড়া ওয়াজিব (কর্তব্যের দিক দিয়ে প্রায় ফরযের সমতুল্য)। তাঁর এ অভিমতের পক্ষে দলিল হলো উপরে উল্লেখিত কুরআনের আয়াত। এতে কুরআন পাঠের সময় 'আউযুবিল্লাহ্' পড়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ (আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করো)। এখানে اِسْتَعِذْ শব্দটি আরবীতে আদেশের ক্রিয়ারূপ (صيغة أمر), যা ওয়াজিব তথা ফরয বুঝাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নামাযে কিরাত পড়ার সময় অথবা নামাযের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত করার বেলায়, উভয় অবস্থাতেই 'আউযুবিল্লাহ্' পড়া ওয়াজিব। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো 'আউযুবিল্লাহ্' ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেছেন এমন দলিল নেই।

ইবনে সিরীন (র) বলেনঃ কুরআন পাঠের সময় 'আউযুবিল্লাহ্' পড়া ওয়াজিব। তবে কেউ যদি জীবনে একবারও কুরআন পাঠের সময় 'আউযুবিল্লাহ' পড়ে, তবে সে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ অন্যান্য সময় কুরআন তিলাওয়াতের সময় 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ না করলে ওয়াজিব পরিত্যাগ করার জন্য গোনাহগার হবে না। বরং তা সুন্নতের খেলাফ হবে।

তবে আলেম সমাজের সাধারণ অভিমত হলো এই যে, সূরা ফাতিহা বা কুরআনের যে কোন অংশ পাঠের সময় 'আউযুবিল্লাহ্' পড়া সুন্নত, যা পড়লে সওয়াব হবে এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচা সহজ হবে। তবে 'আউযুবিল্লাহ্' না পড়লে গোনাহগার হবে না।

নামাযে 'আউযুবিল্লাহ্' পড়া

প্রতি ওয়াক্ত নামাযের প্রতিটি রাকাতে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। ফরয ও সুন্নত নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। সুন্নত নামাযের প্রতি রাকাতে এবং ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে কুরআনের আরো কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতে হয়। আমরা জানি, সূরা ফাতিহাসহ কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ শুরু করার সময় 'আউযুবিল্লাহ্' পাঠ করা কমপক্ষে সুন্নত। প্রশ্ন হলো, নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করার

১৪.এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য নিম্ন লিখিত তাফসীরগুলোর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্যঃ (১) তাফসিরে ইবনে কাসীর (২) ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযির তাফসীরে কবীর।

পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ্' পড়তে হবে কিনা। এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে।[১৫]

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী নামাযের প্রত্যেক রাকাতে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বে আস্তে আস্তে 'আউযুবিল্লাহ্' পাঠ করা সুন্নত।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী শুধু প্রথম রাকাতে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার সময় 'আউযুবিল্লাহ্' পড়া সুন্নত।

মালেকী মাযহাব অনুযায়ী নামাযে সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পাঠের সময় 'আউযুবিল্লাহ' পড়া মাকরূহ। এ মাযহাবের প্রমাণ হলো নিম্নের হাদিসটি:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِ : (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ) -

"আনাস (রা) বলেন; নবী (সা) আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা নামায শুরু করতেন । আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-ও তাই করতেন।"[১৬]

এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম মালেক বলেন, নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের সময় 'আউযুবিল্লাহ' পাঠের বিধান থাকলে, রাসূল (সা) তা অবশ্যই করতেন। তিনি যখন তা করেননি, তখন তা মাকরূহ।

শয়তান, শয়তানের দল এবং এ দলের কর্মসূচি

আউযুবিল্লাহ্ দ্বারা শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। এ পর্যায়ে শয়তান কি, কেমন এবং তার দল বা পার্টি কি, এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

আসল শয়তান হলো জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। জিনদের মধ্যে নেক্কার আছে, খারাপও আছে। হযরত আদম (আ) কে সিজদাবনত হয়ে সম্মান জানাতে ইবলীস নামক জিন অস্বীকার করেছিল; তাকেই 'বিতাড়িত শয়তান' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।[১৭] জিন ও শয়তান পানাহার করে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি হয়। জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব এবং তাদের বংশ বিস্তার সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বর্ণনা রয়েছে। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হলো।[১৮]

---

১৫. দেখুন, ওহবাহ আযযুহাইলী, তাফসীর আল মুনীর, দারুল ফিকর আল মুয়াসির, বৈরুত, লেবানন। ১৪১৮ হিজরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫।

১৬. বুখারী, হাদিস নং- ৭০১, মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং- ৫২।

১৭. দেখুন, আল-কুরআন ২ : ৩৪; ৩৮ : ৭৪; ১৫ : ৩৪।

১৮. সংক্ষেপ করার জন্য পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ দেওয়া হলো না। আগ্রহী পাঠক প্রদত্ত বরাত মোতাবেক কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ দেখতে পারেন।

(১) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ.

(২) وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ.

(৩) وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ.

(৪) أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ.

(১) "আর স্মরণ করো, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা মন দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল।"[১৯]

(২) "আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা তা-ই অনুসরণ করতো।"[২০]

(৩) "(আর আমি তার অধীন করে দিলাম) শয়তানদিগকে, যাদের সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।"[২১]

(৪) "তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে (অর্থাৎ ইবলিস শয়তানকে) এবং তার সন্তান-সন্ততিকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করছো?"[২২]

শেষোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি আছে। হাদিসে আছে, বিসমিল্লাহ্ ছাড়া খাবার গ্রহণ করলে শয়তান তার সাথে খায়। এতে শয়তানের পানাহার সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শয়তান অদৃশ্য থাকে এবং সে বিভিন্ন দৈহিক রূপও ধারণ করতে পারে। বিভিন্ন হাদিস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শয়তান অদৃশ্য ও গোপনভাবে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিতে পারে। এ কুমন্ত্রণা দেয়ার কথা কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ-

"যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) দাঁড়াবে তার মতো যাকে শয়তান তার প্রভাবে মোহাবিষ্ট করে।"[২৩]

---

১৯. আল-কুরআন ৪৬ : ২৯।
২০. আল-কুরআন ২ : ১০২।
২১. আল-কুরআন ৩৮ : ৩৭।
২২. আল-কুরআন ১৮ : ৫০।
২৩. আল-কুরআন ২ : ২৭৫।

হাদিসে বলা হয়েছে,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ.

"নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে পারে।"[২৪]

এখান থেকে বুঝা যায়, শয়তান অদৃশ্যভাবে মানুষকে প্ররোচনা দিতে পারে। 'সূরা নাস' সম্পূর্ণটাই শয়তানের "ওয়াস্ওয়াসা" (অদৃশ্যে প্ররোচনা) থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আসল শয়তান জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও যেসব মানুষ নিজ কাজে কর্মে শয়তানের দলেই থাকে, আল্লাহর অবাধ্যতায় এবং সত্যের বিরোধিতায় যাদের কর্মকাণ্ড শয়তানের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ হয়, তাদেরকেও কুরআনে রূপকার্থে শয়তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ হিসেবে জিন জাতীয় শয়তানকে 'জিন শয়তান' এবং মানুষরূপী শয়তানকে 'মানুষ শয়তান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কাজ হলো আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হওয়া, সত্যের বিরোধিতা ও শত্রুতা করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا -

"এমনিভাবে আমি মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু হিসেবে বানিয়েছি। তারা ধোকা দেয়ার জন্য একে অপরকে চমকদার কথাবর্তা শিক্ষা দেয়।[২৫]

গোটা সূরা নাস এর আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের ওয়াসওয়াসা। এ সূরায় মানুষকে জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান উভয় শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

দুই প্রকার শয়তানের কথা বলার পর কুরআনে শয়তানের পার্টি বা দলের কথা বর্ণিত হয়েছে। শয়তানের দল বা পার্টিতে দু'ধরনের সদস্য আছে : (১) জিন শয়তান ও তার সন্তান-সন্ততি এবং জিনের মধ্যে শয়তানের অনুসারী, (২) মানুষ শয়তান, যারা শয়তানের আদর্শে বিশ্বাসী এবং সেরূপ আচরণকারী। শয়তানের পার্টির প্রধান কর্মসূচি হলো নিজ দলের মানুষকে

---

২৪. আবু দাউদ, কিতাবুস সাওম, হাদিস নং-২৪৭০।
২৫. আল-কুরআন ৬:১১২।

সত্যপথ থেকে দূরে রাখা এবং অন্যদেরকে নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে তারা সত্য পথে চলতে না পারে।

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ ۚ أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ .

"শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, আর এভাবে সে আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।"[২৬]

এ দুটি আয়াতে শয়তানের দল বা পার্টি কীভাবে গঠিত হয় এবং এ পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি কি, তার ইঙ্গিত রয়েছে। মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান দিয়ে শয়তানের দল গঠিত। আর এ দলের কর্মসূচি হলো চমকদার কথা দিয়ে মানুষকে সত্য থেকে দূরে রাখা এবং বিপথে পরিচালিত করা। প্রত্যেক নবীকেই এ শয়তানের দল মোকাবেলা করতে হয়েছে। শেষ নবীর পর আর কোন নবী আসবেন না। এখন মুসলমানদের উপরই সত্যের দিকে ডাকার তথা দীনের দাওয়াতের দায়িত্ব বর্তায়।[২৭] নবীদের এ কাজ ও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আল্লাহর দলের[২৮] লোকেরাও শয়তান দলের বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। হক ও বাতিলের এ বিরোধ চিরন্তন। সুতরাং যেখানেই আল্লাহ, রাসূল ও সত্যের বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাবে, সেখানেই শয়তানের দলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে হবে। শয়তান হলো শত্রু, তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে, তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। শয়তানের দলের প্রভাবে বশীভূত হওয়া কিংবা মোহগ্রস্ত হওয়া যাবে না, কারণ পরিণামে শয়তানের দলই চরম ক্ষতিগ্রস্ত।[২৯] বরং থাকতে হবে আল্লাহর দলে, কেননা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়।[৩০]

---

২৬. আল-কুরআন ৫৮ : ১৯।
২৭. আল-কুরআন ৩ : ১১০; ১৬ : ১২৫; ২৮ : ৮৭; ৩ : ১০৪।
২৮. আল-কুরআন ৫৮:২২।
২৯. আল-কুরআন ৫৮ : ১৯।
৩০. "আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাঁরাই আল্লাহর দল এবং তাঁরাই বিজয়ী।" আল-কুরআন ৫ : ৫৬; ৫৮:২২।

তৃতীয় অধ্যায়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (সংক্ষেপে বিস্‌মিল্লাহ্‌) কুরআনের একটি আয়াত বা আয়াতের অংশ। কারো কারো মতে এটি সূরা ফাতিহার একটি আয়াত, যা পাঠ না করলে সূরা ফাতিহা পূর্ণাঙ্গ হয় না। অন্যদের নিকট তা সূরা ফাতিহার আয়াত নয়। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এটি কুরআনের অংশ এবং সূরা নামলের একটি আয়াত বা আয়াতের অংশ।[৩১] সূরা তাওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে "বিস্‌মিল্লাহ্‌" লেখা হয়, যা দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। একইভাবে সূরা ফাতিহার প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্‌ লেখা হয়।

'বিস্‌মিল্লাহ্‌' সূরা ফাতিহার অংশ কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, সকল কাজ বিস্‌মিল্লাহ্‌ দিয়ে শুরু করা সুন্নত। কুরআন পাঠ করা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কাজসমূহের অন্যতম। সুতরাং বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা সূরা ফাতিহা শুরু করাও সুন্নাত। অতএব বিস্‌মিল্লাহ্‌ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা এখানে দেয়া হলো।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ : অর্থ ও তাৎপর্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থ হলো "আমি পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।" আল্লাহ হলেন স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তিনিই হলেন সকল শক্তির উৎস ও মালিক। তিনি সর্বশক্তিমান। সকল কাজের নিয়ন্ত্রকও তিনি। আল্লাহর এসব শক্তি, কর্তৃত্ব ও কাজের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে এক একটি নাম রয়েছে। এভাবে তাঁর নিরানব্বইটি নাম আছে। বিভিন্ন শক্তি, কর্তৃত্ব ও বৈশিষ্ট্যগত এসব নাম "আল্লাহ" নামেরই গুণ বা বিশেষণ। নিচের আয়াতে আল্লাহর বেশ কয়েকটি নামের উল্লেখ আছে।

هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ

---

৩১. পরে এ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রমশীল, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র।"[৩২]

এখান থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর শক্তি, কর্তৃত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী যতো নাম আছে, তার সবই আল্লাহর গুণ। আল্লাহ কথাটির মধ্যে আল্লাহর বিভিন্ন নামের অন্তর্ভুক্ত সকল গুণের সমাবেশ রয়েছে। এ হিসেবে "আল্লাহ" শব্দটিকে অনেকে 'ইস্‌মে আযম' বলে অভিহিত করেছেন।[৩৩]

সুতরাং আল্লাহর নামে শুরু করা মানে হলো এমন সত্তার নামে শুরু করা যিনি সকল শক্তি, কর্তৃত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা তাঁর নিরান্নববইটি নামে বিকশিত ও প্রকাশিত। এমন সত্তার নামে কোন কাজ শুরু করার মর্ম দাঁড়ায় সংশ্লিষ্ট কাজে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া এবং কাজটি সমাধা করায় আল্লাহর শক্তির পরশ লাভের প্রার্থনা করা। তা যদি পাওয়া যায়, তা হলে যেকোনো কাজ সহজে সমাধা হতে পারে। এ সৃষ্টিজগতে কেউ এমন নেই যে এ কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, বা ক্ষতিসাধন করতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন :

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

"আমি সে আল্লাহর নামে শুরু করছি যার নামে শুরু করলে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না; আর আল্লাহ তো সব শুনেন, সব দেখেন।"[৩৪]

এর এতো গুরুত্ব বলেই হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নবুওয়তের যে প্রথম বাণী আসে, তাতে আল্লাহর নামে পাঠ করার কথা রয়েছে। আল্লাহর নিকট থেকে প্রথম যে বাণী জিবরাঈল (আ) মহানবীর নিকট নিয়ে আসেন তা হলো إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ (পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি

---

৩২. আল-কুরআন ৫৯ : ২২-২৪।

৩৩. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি এ মত ব্যক্ত করেন। দেখুন, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর ফখরুদ্দীন আল রাযি, তাফসীর কাবীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০-১১১।

৩৪. আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫০৮৮, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৮৬৯।

সৃষ্টি করেছেন)। সুতরাং আল্লাহর প্রথম নির্দেশই হলো আল্লাহর নামে পাঠ করা।
এথেকে বিস্‌মিল্লাহ্ বা আল্লাহর নামে কোন কাজ শুরু করার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) সব কাজই বিস্‌মিল্লাহ্ দিয়ে শুরু করতেন। হযরত আবু কুতন মাসউদী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমদিকে সব কাজ اللّٰهُمَّ بِسْمِكَ (তোমার নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ) দ্বারা শুরু করতেন। এমনকি কোন কিছু লিখাতে হলেও তা দিয়েই শুরু করাতেন। এরপর যখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নাযিল হয়, তখন এটিই পাঠ করতে শুরু করেন। আর সবাইকে বিস্‌মিল্লাহ্ দ্বারা সকল কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন :

كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ -

যে কথা বা কাজ বিস্‌মিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা হয় না, তাতে কোন বরকত থাকেনা।[৩৫]

বিস্‌মিল্লাহ্ দিয়ে কাজ শুরু করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত। এ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং সর্বোপরি কার্য সম্পাদনে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়। কারো মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, আল্লাহ দুনিয়াতে সব কিছুর জন্যই "কার্যকারণ" (سَبَبْ) ঠিক করে দিয়েছেন, যার ভিত্তিতে সবকিছু চলে। "কার্যকারণ" অর্জিত হলে "কার্যফল" লাভ হয়। তবে আবার আল্লাহর সাহায্যের কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের জবাব হলো নিম্নরূপ :

"কার্যকারণ" এর ভিত্তিতে "কার্যফল" সাধারণ নিয়ম হওয়া সত্ত্বেও তার কার্যকারিতা ও কর্মফলের মাত্রা অনেকাংশেই বরকত এর উপর নির্ভর করে। 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে শুরু করলে কাজে বরকত হয়। বরকত হলে আশানুরূপ, এমন কি কখনো আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

অহরহ এমন দেখা যায়, একই পটভূমি বা অবস্থা (background) থেকে উদ্ভূত হয়ে এবং একই ধরনের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার পরও একই ধরনের কর্মকাণ্ডের একই রকম কার্যফল লাভ করা যায় না, একই রকম সাফল্য অর্জন করা যায় না। কেউ কম সাফল্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ পারে বেশি। প্রকৃতপক্ষে সাফল্যের জন্য প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা হলো যরূরী শর্ত (nesessary condition), তা কখনো যথেষ্ট শর্ত (sufficient condition) নয়। জরূরী শর্তের সাথে যদি আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে সাফল্যের জন্য যথেষ্ট। তখন কর্মফল ও সাফল্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

---

৩৫. আহমাদ, হাদীস নং ১৪:৩২৯।

এখানে কারো মনে প্রশ্ন উদিত হতে পারে, অনেক সময় ধার্মিক মানুষের তুলনায় অধার্মিক ও বে-দীন মানুষকে অধিক সফল দেখতে পাওয়া যায়। তারা এতো প্রাচুর্য কোত্থেকে পায়? এর জবাব হলো এই যে, তাদের অধিক আর্থিক সাফল্যের কারণ বরকত নয়। বরং প্রস্তুতি, প্রচেষ্টা ও কৌশলের মাধ্যমে দুনিয়ার কার্যকারণের উপকরণগুলোকে যদি তারা বেশি মাত্রায় অর্জন করতে পারে, তা হলে তারা সাফল্যও বেশি মাত্রায়ই পাবে। উপকরণাদি যতো অধিক ও উত্তমভাবে অর্জিত হবে, সাফল্যও ততো অধিক আসবে। প্রকৃত সত্য হলো এই যে, আজকের যুগে মুসলমানরা শিক্ষা, দক্ষতা, কৌশল, প্রচেষ্টা ইত্যাদিতে অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং দুনিয়া অর্জনেও তারা পিছিয়ে আছে। আধুনিক ও বিধর্মীদের সমান শিক্ষা, দক্ষতা, কৌশল ও প্রচেষ্টা থাকলে আল্লাহর দেয়া বরকতের মাধ্যমে হয়তো তারা আরো অনেক বেশি অর্জন করতে পারতো।

তবে একথাও সত্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে কার্যকারণ থাকলেও কর্মফলকে রহিত করতে পারেন। যেমন, কাফিররা যখন ইবরাহীম (আ) কে পুড়িয়ে মারার জন্য আগুনে ফেলে, তখন আল্লাহ আগুনের পুড়িয়ে দেয়ার গুণকে রহিত করেন। আল্লাহ বলেন: "হে আগুন, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যাও।"[৩৬] এ নির্দেশে আগুনের দাহ্য গুণ রহিত হয়। এবং তা ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যায়। আল্লাহ যদি আগুনকে শান্তির পর্যায়ে থাকার নির্দেশ না দিতেন, তা হলে তা অসহনীয় ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। এভাবে আল্লাহ যেকোনো কিছুরই স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারেন। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থা না হলে তিনি সাধারণত তা করেন না।

এখানে আরো প্রশ্ন হতে পারে, কাফির ও ইসলামের শত্রুদের চরম অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে তো আল্লাহ তাদের দুনিয়ার সাফল্যকে বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু কেন তা করেছেন না? এর জবাব আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন যে, তাদের সীমাহীন অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ চরম অসন্তুষ্ট হন এবং সেহেতু তাদেরকে ভ্রষ্টতার আবর্তে ধ্বংসের দিকে যাওয়ার জন্য অবকাশ দেন। এ অবকাশ সন্তুষ্টির পরিচায়ক নয়।

সারকথা, শরিয়তের দৃষ্টিতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা কাজ শুরু করা সুন্নত, যা ইসলামী সংস্কৃতির একটা অংশ। সূরা ফাতিহাসহ কুরআনের যেকোনো অংশ তিলাওয়াতের সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করা উচিত। এতে পাঠের প্রতি মনোযোগ আসবে, তিলাওয়াতে বরকত হবে, এবং তা থেকে কাঙ্ক্ষিত

---

৩৬. আল-কুরআন ২১ : ৬৯।

হিদায়াত পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া আদর্শিক ও জাগতিক সকল কাজই বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করা উচিত। এতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কার্যকারণ ও কার্য উপকরণের সাথে যদি আল্লাহর সাহায্য থাকে তবে কাজে বরকত ও সাফল্য অর্জিত হবে অধিক মাত্রায়।[৩৭]

'বিস্‌মিল্লাহ্‌' কুরআন ও সূরা ফাতিহার আয়াত কি না

সকল যুগের আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' কুরআনের একটি আয়াত। পূর্ণ 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' সূরা নামলে এভাবে এসেছে,

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

অর্থাৎ, 'এটি সুলাইমান থেকে এসেছে এবং তা পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করা হয়েছে'।[৩৮]

সুতরাং পুরো 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' সূরা নামলের একটি আয়াত। মুফাসসিরগণের সাধারণ অভিমত হলো এই যে, 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' প্রত্যেক সূরার আয়াত বা অংশ নয়। তবে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) বলেন, এটি প্রত্যেক সূরারই একটি আয়াত। তিনি তার অভিমতের পক্ষে নিম্নবর্ণিত হাদিসটি পেশ করেন:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

"হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (সা) আমাদের মাঝে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। অতঃপর মৃদু হেসে মাথা উঠালেন। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন, আমার কাছে এইমাত্র একটি সূরা অবতীর্ণ হলো। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন :[৩৯]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

---

৩৭. বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করার আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল আছে, যা চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে।

৩৮. আল-কুরআন ২৭ : ৩০।

৩৯. সহীহ মুসলিম, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং:৪০০।

এই হাদিসের উপর ভিত্তি করেই আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) বলেন, এটি প্রত্যেক সূরারই একটি আয়াত। তবে সকল ইমাম, আলেম, ফকীহ্ ও মুফাসসিরের সাধারণ অভিমত হলো এই যে, বিস্‌মিল্লাহ্ সকল সূরার অংশ বা আয়াত নয়। সূরা তাওবা ছাড়া সকল সূরার প্রথমে আলাদাভাবে যে বিস্‌মিল্লাহ্ লিখা হয়, তা হলো এক সূরা থেকে অন্য সূরার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য।

তবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার আয়াত কিনা, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হানাফী ও মালেকী মাযাহাবের অভিমত হলো এই যে, 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার আয়াত নয়। তাঁদের মতে সূরা নামল ছাড়া বিস্‌মিল্লাহ্ অন্য কোন সূরারই আয়াত নয়। দলিল হিসেবে তাঁরা হাদিস ও যুক্তি পেশ করেন। হাদিসের দলিল হলো এই :

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِنَّهٗ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ فَلَمْ أَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

"হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর সঙ্গে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' পড়তে শুনিনি।"[৪০]

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নবী (সা), প্রথম তিন খলিফা এবং তাঁদের অনুসারীরা নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েননি। চতুর্থ খলিফার ব্যাপারে এ পক্ষে বা সেপক্ষে কোন বর্ণনা এ হাদিসে নেই। কাজেই ধরে নেয়া যায় যে, বিস্‌মিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার আয়াত নয়। যদি তা হতো, তা হলে তাঁরা সূরা ফাতিহার সাথে অবশ্যই বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার অংশ নয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" -

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূল (সা) তাক্‌বীর দ্বারা নামায শুরু করতেন এবং আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা ক্বিরাত শুরু করতেন।"[৪১]

---

৪০. মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং- ৩৯৯।

৪১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর ফখরুদ্দীন আর রাযি, তাফসীর কাবীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭, আবূ দাউদ, হাদীস নং ৭৮৩

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' দ্বারাই নামাযে সূরা ফাতিহা শুরু করেছেন। 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' সূরা ফাতিহার অংশ হলে অবশ্যই তিনি তা পাঠ করতেন। এ হাদিসও প্রমাণ করে যে, বিস্‌মিল্লাহ্‌ সূরা ফাতিহার অংশ নয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ شَطْرَيْنِ - فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اللهُ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ ، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ. فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ اللهُ : هٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ، قَالَ فَهٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ " .

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)- কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে নামাযকে[৪২] আমি দু'ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। বান্দা যখন "আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল্‌ আলামীন" বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে "আর্‌ রাহ্‌মানির রাহীম" বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে "মালিকি ইয়াউমিদ্দীন", তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে (আল্লাহ আবার কখনো বলেন, আমার বান্দা সমগ্র ক্ষমতা আমার উপর ন্যস্ত করেছে)। আর যখন সে বলে, "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তায়ী'ন", তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। আর যখন সে বলে "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম্‌, গাইরিল মাগ্‌দূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্যাল্লীন", তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়।"[৪৩]

---

৪২. এ হাদীসে নামাযের অর্থ সূরা ফাতিহা।
৪৩. মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং- ৩৯৫।

বিস্‌মিল্লাহ্ যে সূরা ফাতিহার আয়াত নয়, এ হাদিসটি দ্বারা তা দু'ভাবে বুঝাযায়। প্রথমতঃ মহানবী (সা) এখানে সূরা ফাতিহার মধ্যে "বিস্‌মিল্লাহ্"-এর উল্লেখ করেননি। যদি তা সূরা ফাতিহার অংশ হতো তা হলে অবশ্যই তিনি তা উল্লেখ করতেন। দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে আধা-আধি ভাগ করেছি। এ আধা-আধি ভাগ করাটা তখনই ঠিক হবে যখন বিস্‌মিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার অংশ না হয়। কারণ সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত। তাতে আল্লাহর জন্য সাড়ে তিন আয়াত, আর তা আল্‌হাম্‌দু হতে ইয়্যাকা না'বুদু পর্যন্ত। আর বান্দার জন্য সাড়ে তিন আয়াত। আর তা ইয়্যাকা নাস্তাঈন হতে শেষ পর্যন্ত। আমরা যদি বিস্‌মিল্লাহ্‌কে সূরা ফাতিহার অংশ ধরে নেই, তাতে আল্লাহর জন্য সাড়ে চার আয়াত হয় আর বান্দার হয় আড়াই আয়াত। আর তাতে আধা-আধি ভাগ করা হবে না।[৪৪]

এছাড়া আরেকটি এমন যুক্তি দেয়া হয় যে, 'বিস্‌মিল্লাহ্'তে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ আছে। আবার সূরা ফাতিহায়ও اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ আছে। একই সূরায় পাশাপাশি اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ এর পুনরাবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। এ বিষয়টিও প্রমাণ করে যে, 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার আয়াত বা অংশ নয়।

অপরপক্ষে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী বিস্‌মিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার একটি আয়াত। সূরা ফাতিহার আয়াত হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি হলো এই হাদিস :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَه عَنَّ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَرَأْتُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ فَاقْرَؤُا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اِنَّهُ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ ـ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, "তোমরা যখন 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্ রাব্বিল আলামীন পাঠ করো, তখন বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মনির রাহীম পড়ো। কেননা এ সূরা হলো উম্মুল কুরআন (কুরআনের মা বা মূল), উম্মুল কিতাব (কিতাবের মা বা মূল), এবং সাব্‌উল্ মাসানী (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত)।"[৪৫]

---

৪৪. দেখুন, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর ফখরুদ্দীন আর রাযি, তাফসীর কাবীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০-১১১।

৪৫. হাদিসটি ওহ্‌বাহ্ আয্ যুহাইলী উদ্ধৃত করেছেন এবং হাদিসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

এ পর্যায়ে আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে। তা হলো এই যে, যাদের কাছে 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার একটি আয়াত হিসেবে স্বীকৃত, তাঁদের নিকট সূরা ফাতিহার মোট আয়াত কয়টি? আর যাঁরা 'বিস্‌মিল্লাহ্'-কে সূরা ফাতিহার একটি আয়াত হিসেবে মনে করেন না, তাঁদের মতে সূরা ফাতিহার আয়াত কয়টি? উল্লেখ্য, কুরআনের অন্যত্র সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত বলে বর্ণিত হয়েছে।[৪৬]

'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার একটি আয়াত কিনা, সে ব্যাপারে মত পার্থক্য থাকলেও সবারই নিকট সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাতটি। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার একটি আয়াত। তবে এ দুটি মাযহাবে সূরা ফাতিহার শেষ দুটি আয়াতকে একত্রিত করে এক আয়াত হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এবং غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ এ দুটি আয়াতকে এক আয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং বিস্‌মিল্লাহ্‌কে একটি আলাদা আয়াত ধরে হিসাব করলেও সূরা ফাতিহার মোট আয়াত সংখ্যা হয় সাতটি।

অপরদিকে হানাফী ও মালেকী মাযহাবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার আয়াত বা অংশ নয়। তাঁদের নিকটও সূরা ফাতিহার আয়াত সাতটি। কারণ, তাঁরা সূরা ফাতিহার উপরে উল্লেখিত দুটি আয়াতকে দুটি আয়াত হিসেবেই বিবেচনা করেন।

এভাবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' কে সূরা ফাতিহার একটি আলাদা আয়াত হিসেবে গণ্য করা হোক বা না হোক, সবার নিকটই সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাতটি।

নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ

'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার অংশ কিনা, এ মতপার্থক্যের কারণে নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ প্রসঙ্গেও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

(ক) হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার কোন আয়াত নয়।[৪৭] সুতরাং নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়াও ফরয নয়। হানাফী মাযহাবের যুক্তি হলো ইতোপূর্বে উল্লেখিত একটি হাদিস :

আনাস (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর

৪৬. আল-কুরআন ৯৫ : ৮৭।

৪৭. এ অভিমতের আরো দলিল দেখুন অত্র বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়।

পেছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকেই 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' পড়তে শুনিনি।"[৪৮]

এখান থেকে বুঝা যায় যে, নবী (সা), প্রথম তিন খলিফা এবং তাঁদের অনুসারীরা মদিনাতে নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়েননি। কাজেই ধরে নেয়া যায় যে, নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া ফরয নয়। যদি তা হতো, তা হলে তাঁরা সূরা ফাতিহার সাথে অবশ্যই বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়তেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' ছাড়াই তাক্‌বীর বলে নামায শুরু করতেন এবং 'আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল্‌ আলামীন' বলে কিরাত শুরু করতেন। হাদিসটি নিম্নরূপ :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, "নবী (সা) আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করতেন এবং আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলে ক্বিরাত শুরু করতেন।"[৪৯]

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' দ্বারাই নামাযে সূরা ফাতিহা শুরু করেছেন। 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' দ্বারা নামায শুরু করেননি ।

তবে কুরআন তিলাওয়াত থেকে শুরু করে সব কাজই 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' দ্বারা শুরু করা সুন্নত। সুতরাং নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বেও 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়া সুন্নত। কিন্তু তা পড়তে হবে আস্তে আস্তে, জোরে নয়।[৫০]

(খ) শাফেয়ী মাযহাব

শাফেয়ী মাযহাবে "বিস্‌মিল্লাহ্‌" হলো সূরা ফাতিহার একটি আয়াত।[৫১]

আর নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। সুতরাং নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে

---

৪৮. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী, সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং-৩৯৯।

৪৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমার ফখরুদ্দীন রাযি, আত্‌ তাফসীরুল কাবীর, মুলতান: দারুল হাদিস, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৭। আবূ দাউদ, হাদিস নং৭৮৩

৫০. ওয়াহ্‌বাহ্‌ আয যুহাইলী, আত্‌ তাফসীরুল মুনীর, বৈরুত: দারুল ফিকহ, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৮ ইং, পৃ ৪৭।

৫১. এ প্রসঙ্গে শাফেয়ী মাযহাবের প্রমাণ অত্র বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়াও ফরয। কাজেই নামাযে যদি 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ না পড়া হয়, তা হলে নামায হবে না।[৫২]

শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী সূরা ফাতিহা আস্তে পড়লে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌'-ও আস্তে পড়তে হবে। আর যখন সূরা ফাতিহা জোরে পড়া হয়, তখন 'বিস্‌মিল্লাহ্‌'-ও জোরে পড়তে হবে।

(গ) হাম্বলী মাযহাব

শাফেয়ী মাযহাবের মতো হাম্বলী মাযহাবেও 'বিস্‌মিল্লাহ্‌'-কে সূরা ফাতিহার একটি আয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়, আর তাদের মতে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। সুতরাং একইভাবে নামাযেও সূরা ফাতিহার সাথে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা ফরয। তবে পার্থক্য এই যে, হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী সূরা ফাতিহা জোরে পড়া হোক বা আস্তে পড়া হোক, উভয় অবস্থাতেই 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' আস্তে পড়বে।

(ঘ) মালেকী মাযহাব

মালেকী মাযহাব অনুযায়ী 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' সূরা ফাতিহার কোন আয়াত নয়।[৫৩] নামাযে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার ব্যাপারে এ মাযহাবের অভিমত হলো এই যে, কোন ফরয নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া যাবে না, তা সে জোরে কিরাত বা আস্তে কিরাতের নামাযই হোক না কেন। তবে নফল নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়া জায়েয।[৫৪]

বিস্‌মিল্লাহ্‌ : ভাষা ও বৈশিষ্ট্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বাক্যটির পাঁচটি অংশ আছে (১) ب (বা); (২) اِسْمٌ (ইসম); (৩) اللهُ (আল্লাহ); (৪) اَلرَّحْمٰنَ (আর রাহমান) (৫) الرَّحِيْمِ (আর রাহীম)। বাক্যটির আরেকটি উহ্য শব্দ আছে তা মতান্তরে اِبْدَأْ، اَبْدَأُ অথবা اِبْتِدَائِيْ হতে পারে। এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেয়া হচ্ছে।

প্রথমে উহ্য শব্দের বিষয়টি ধরা যাক। অনেকের মতে উপরে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ বাক্যটির প্রথমে অথবা শেষে اَبْدَأُ শব্দটি উহ্য আছে। উহ্য শব্দটিসহ বাক্যটি এই দাঁড়ায় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَبْدَأُ অথবা أَبْدَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থাৎ আমি শুরু করছি পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে অথবা

---

৫২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমার ফখরুদ্দীন রাযি, প্রাগুক্ত।
৫৩. এ প্রসঙ্গে দলিল প্রমাণ অত্র বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।
৫৪. ওয়াহ্‌বাহ্‌ আয্‌ যুহাইলী, প্রাগুক্ত।

আমি পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আবু বকর আহমদ জাস্‌সাস্‌ বলেন, আরেকটি সম্ভাব্য উহ্য শব্দ হলো إِبْدَأُ যার অর্থ দাঁড়াবে এই, পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করো। এটি হলো আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ। এরূপ নির্দেশমূলক বাক্য কুরআনে আছে। যেমন, إِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ (তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ করো)।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি إِبْتِدَائِيْ শব্দটি উহ্য থাকার সম্ভাবনাও উল্লেখ করেছেন। তখন বাক্যটি হয় এরূপ بِسْمِ اللهِ إِبْتِدَائِيْ অথবা بِسْمِ اللهِ أَبْتَدِأُ (আল্লাহর নামে আমার শুরু)। এর উদাহরণ কুরআনে আছে। যেমন بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا (আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি)।[৫৫] প্রকৃতপক্ষে উহ্য শব্দ যা-ই থাকুক, তার মর্ম ও অর্থের মধ্যে পার্থক্য নেই। আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নামে শুরু করা।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ শব্দে যে ب বর্ণটি আছে, তা সংযোগ স্থাপন বা সাহায্য প্রার্থনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাইখুত্তাফসির ইদ্রীস কান্ধলভী (রহ)বলেন, এখানে সাহায্য প্রার্থনা অর্থই প্রবল। কারণ, কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হলো কর্ম সমাধানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।[৫৬]

বিস্‌মিল্লাহ্‌ শব্দে ب -এর পরে আছে اِسْمُ اللهِ (আল্লাহর নাম)। ইসম অর্থ নাম। আল্লাহর অনেক নাম আছে, যা তাঁর এক একটি শক্তি ও ক্ষমতা বুঝায়। যেমন, قَدِيْرٌ (সর্বশক্তিমান) নামটি আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তি বুঝায়। তাঁর নাম سَمِيْعٌ এবং بَصِيْرٌ অর্থ হলো সর্বশ্রোতা (যিনি সবকিছু শুনেন) এবং সর্বদ্রষ্টা ((যিনি সবকিছু দেখেন)। এসব নাম আল্লাহ নামেরই গুণ বা বিশেষণ।

আল্লাহ এমন একটি শব্দ যার অন্য কোন উৎস বা মূল ধাতু নেই। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দটি অন্য কোন শব্দ থেকে রূপান্তরিত শব্দ নয়।[৫৭] এর একবচন নেই, বহুবচন নেই, স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ নেই। এর সাথে অন্য কোন শব্দের

৫৫. তাফসীরে কাবীর, খ-১, পৃ. ৯৯, দারুল হাদিস, মুলতান।
৫৬. হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্‌রীস কান্ধলভী, মা'আরিফুল কুরআন, দিল্লিঃ ফরিদ বুক ডিপো, ২০০১ইং, ১ম খন্ড, পৃ. ৭।
৫৭. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমার ফখরুদ্দীন রাযি, প্রাগুক্ত পৃ ১৪৩।

তুলনা হয় না। তেমনিভাবে আল্লাহর মতোও কোন কিছু নেই। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ তাঁর মতো কোন কিছু নেই।[৫৮] যেহেতু আল্লাহ নামের মধ্যে আল্লাহর সকল গুণ, ক্ষমতা, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত আছে, সেহেতু অনেকে আল্লাহ নামটিকে ইস্‌মে আযম اَلْاِسْمُ الْأَعْظَمُ বা সবচেয়ে মহান নাম বলে অভিহিত করেছেন।

اَلرَّحْمٰنُ এবং اَلرَّحِيْمُ আল্লাহর অপার করুণা ও দয়া নির্দেশ করে। এ ব্যাপারে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াত اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ প্রসঙ্গে করা হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

---

৫৮. আল-কুরআন ৪২:১১।

চতুর্থ অধ্যায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের রব (প্রতিপালক)।" পৃথিবী, সৌরজগত, গ্যালাক্সিসমূহ এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে, অর্থাৎ সকল সৃষ্টিজগতের রূপকার, স্রষ্টা ও প্রতিপালক হলেন আল্লাহ। আদিতে তিনি, অন্তেও তিনি। শেষ বিচারের মালিকও তিনি। সৃষ্টির প্রতি যতো নিয়ামত-অনুগ্রহ আছে, তার উৎসও তিনি। সুতরাং সকল প্রশংসা একান্তভাবে তাঁরই প্রাপ্য।

এ আয়াতটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচনার সুবিধার জন্য দুটি অধ্যায়ে এর আলোচনা করা হলো। এ অধ্যায়ে থাকবে 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্' এবং পরের অধ্যায়ে 'রাব্বুল আলামীন'।

'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্' মানে 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।' এ ছোট্ট বাক্যাংশের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ রয়েছে। প্রথম, আল্লাহর অস্তিত্ব, যিনি সবকিছু সৃষ্টি ও প্রতিপালন করেন। দ্বিতীয়, আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ। তৃতীয়, স্রষ্টার প্রশংসা এবং সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ। সকল কার্যকারণ হিসেবে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে মানুষের কৃতজ্ঞতার অনুমতি ও উৎসাহ দান । এসব বিষয়ে আলাদা আলাদা আলোকপাত করা হবে।

আল্‌হামদুলিল্লাহ্ : অর্থ ও তাৎপর্য

হামদ (حَمْدٌ) অর্থ প্রশংসা। 'আল্‌হাম্‌দু' (اَلْحَمْدُ) -এর ال (আলিফ লাম) اَلْاِسْتِغْرَاقُ বা সামগ্রিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং (আল্‌হাম্‌দু) মানে 'সকল প্রশংসা'। আর 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' অর্থ 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য'। সৃষ্টি ও প্রতিপালনসহ সকল প্রকার নিয়ামতই আল্লাহর দান এবং তা অগণিত ও সীমাহীন। জীবনের জন্য প্রাণ, দেখার জন দৃষ্টিশক্তি, শোনার জন্য শ্রবণশক্তি এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, সবই আল্লাহর দান। আল্লাহ বলেন,

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ -

"তোমাদের নিকট যে নিয়ামতই আছে, তা একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত।" [৫৯]

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا-

"তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতকে হিসাব করো, তবে তা গণনা করতে পারবে না।" [৬০]

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই, মানুষ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জন করে, আর উপার্জিত অর্থ দ্বারা ফল-মূল, খাবার ও ভোগের অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করে। কিন্তু উপার্জনের ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা আল্লাহরই দান। ফল-মূল ও খাদ্য-দ্রব্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারাই উৎপন্ন হয়। এক কথায় উপার্জন, উপার্জনের ক্ষমতা, ফল-মূল, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সকল পণ্যসামগ্রীসহ সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহই। সকল নিয়ামত আল্লাহরই দান। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

লক্ষ্যণীয়, আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সূরা ফাতিহায় শুকরিয়া শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। বরং সকল শুকরিয়া না বলে সকল প্রশংসা বলা হয়েছে। আশ্-শুক্রু না বলে আল্হাম্দু বলা হয়েছে। এর একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য আছে। তা হলো এই যে, আল্হাম্দু কথাটি আশ্-শুক্রু থেকে অনেক ব্যাপক, যা আধিক্য ও পরিপূর্ণতা বুঝায়। কেউ যদি কোন নিয়ামত পায়, তা হলে সে ঐ নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া প্রকাশ করে। সে ব্যক্তি যদি কোন নিয়ামত না পায় (অথবা উক্ত ব্যক্তির পরিবর্তে যদি অন্য কোন লোক নিয়ামতটি পায়), স্বভাবতই এ নিয়ামতের কারণে তার শুকরিয়া আদায় করতে হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ামত পায়, সে-ই শুকরিয়া আদায় করে। যে ব্যক্তি নিয়ামত পায় না, সে শুকরিয়া আদায় করে না। এ হিসেবে আশ্-শুক্রু লিল্লাহ বলার অর্থ হতো এই যে, আমি আল্লাহর যতো নিয়ামত পেয়েছি, সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

অপরদিকে আল্হাম্দু লিল্লাহ অনেক ব্যাপক। এর সম্পর্ক শুধু নিয়ামত প্রাপ্তির সাথে নয়। আল্লাহর যতো নিয়ামত আছে, তা পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক; সে নিয়ামত কোন ব্যক্তি নিজে পেলো বা অন্যরা পেলো, সবকিছুর জন্যই প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। এ প্রেক্ষিতে আল-হামদু লিল্লাহ বলে বান্দা যেনো ঘোষণা করে- হে আল্লাহ! সব নিয়ামতের উৎস তুমি, আমি তা পাই বা না পাই, সকল সৃষ্টি জগতই তা পাচ্ছে; আর সেজন্য সকল প্রশংসা একান্তভাবেই তোমার, আর কারো নয়।

---

৫৯. আল-কুরআন ১৬:৫৩।
৬০. আল কুরআন ১৬:১৮।

এখানে আল্লাহর প্রশংসার বর্ণনাভঙ্গিটাও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য এখানে আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্ না বলে أحمد الله বলা যেতো, যার অর্থ হতো, আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি । কিন্তু তা না বলে আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্ বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য অনেক। প্রথম, আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি বাক্যটি বর্তমান কাল এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি বর্তমান কালে আল্লাহর প্রশংসা করছি। অন্যদিকে 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' সর্বকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) প্রযোজ্য। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। আদম (আ) তাঁর সৃষ্টির পরই আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্' বলেছিলেন। মুমিনদের শেষ কথা, বা বেহেশতের শেষ কথাটাও হবে আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্'।

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"আর তাদের শেষ কথা হলো আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"[৬১]

এভাবে সৃষ্টির আদিতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ , অন্তেও তা ; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে, সর্বদা ও সর্বত্র اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। সুতরাং أَحْمَدُ لِلّٰهِ বা প্রশংসাসূচক অন্য কোন শব্দের চেয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

এছাড়া اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি) কথাটি একটা বক্তব্য, যা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, এ ধরনের একটি বক্তব্যকে আল্লাহ মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন। মুনাফিকরা বলেছিল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই । কিন্তু তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ -

"আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।" [৬২]

অর্থাৎ তাদের এ বক্তব্য বা ঘোষণা ঠিক নয়। অন্যদিকে "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্" হলো অন্তরের গভীর থেকে বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য অর্থ হলো এই যে, সমস্ত প্রশংসার মালিক, হকদার ও অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ, কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক। সুতরাং আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্ শব্দচয়ন সীমাহীন তাৎপর্যপূর্ণ।

"আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্" পূর্ণমাত্রার প্রশংসা হওয়ার কারণেই আল্লাহ এতে খুশী হন। বিশেষ করে আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে বান্দা যদি আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্ বলে, তবে আল্লাহ এতে খুশি হয়ে নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন।

---

৬১. আল-কুরআন ১০:১০

৬২. আল-কুরআন ৬৩:০১

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": مَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ ، إِلا كَانَ الَّذِيْ أَعْطَاهُ ، أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন আল্লাহ তার কোন বান্দাকে কোন নিয়ামত দান করেন, তখন সে যদি "আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌" বলে, তবে সে তারও চাইতে উত্তম কিছু পাবে।[৬৩]

নিয়ামত পেয়ে "আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌" বললে আল্লাহ যে কতো খুশি হন, সে বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা) দিয়েছেন :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى اُنْظُرُوْا اِلَى عَبْدِىْ اَعْطَيْتُهُ مَا لَا قَدْرَلَهُ فَاَعْطَانِى مَالَا قِيْمَةَ لَهُ -

নবী (সা) বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কোন নিয়ামত দান করলে যখন বান্দা বলে "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌", তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, দেখো আমার বান্দার দিকে, আমি তাকে একটা সামান্য জিনিস দিয়েছি যার (তেমন কোন) মূল্য নেই, অথচ সে আমাকে এক অমূল্য জিনিস দিলো।[৬৪]

এর অর্থ এই যে, আল্লাহর ভাণ্ডার সীমাহীন। সেখান থেকে কোন বান্দাকে কিছু দেয়া সীমাহীন ভান্ডারের তুলনায় নগণ্য। এছাড়া আল্লাহ তো মানুষকে অগণিত নিয়ামত দিয়েছেন, দিয়ে যাচ্ছেন, এবং দিয়ে যাবেন। তন্মধ্যে একটি নিয়ামত তেমন কিছু নয়। কিন্তু বান্দা যখন বলে 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ', তা হলো বিরাট ব্যাপার। অর্থাৎ প্রশংসা মানেই আল্লাহর জন্য; যতো ধরনের ও যতো মাত্রার প্রশংসা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সকল মানুষ করেছে, আল্লাহর যতো প্রশংসা তাঁর নবী-রাসূলগণ, আল্লাহর ওলীগণ এবং নেককারগণ করেছেন, তার সবই আল্লাহর জন্য। যে প্রশংসা এখনো কেউ করতে পারেনি, অথবা প্রশংসার যতো মাত্রা, ধরন ও রূপ চিন্তা করা যেতে পারে, সবই আল্লাহর জন্য। এককথায় সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য। এভাবে 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌' হলো সীমাহীন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

---

৬৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ,সুনান ইবনে মাজাহ্‌, কায়রো : দারুল হাদিস, ১৯৯৮ইং, হাদিস নং ৩৮০৫।

৬৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে উমার ফখরুদ্দীন রাযি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪।

এতে আল্লাহ খুবই খুশি হন। আর আল্লাহকে খুশি করতে পারলে তো আল্লাহকেই পাওয়া যায়। আল্লাহকে পাওয়া গেলে তো সবকিছুই পাওয়া হয়ে গেলো। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

اَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-

শ্রেষ্ঠ দু'য়া হলো "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌"।[৬৫]

কারণ, আল্লাহকে খুশি করতে পারলে শুধু কাঙ্ক্ষিত জিনিসই নয়, বরং সবকিছুই পাওয়া যায়। সুতরাং দু'য়া র পূর্বে অথবা আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাওয়ার পূর্বে আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌ বলে আল্লাহর প্রশংসা করে নেয়া উচিত। বস্তুত সবকিছুই আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা উচিত। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী রয়েছে :

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَايُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ اَقْطَعُ-

রাসূল (সা) বলেন, যেসব কাজ আল্লাহর প্রশংসা (আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ) ব্যতীত শুরু করা হয় তা অসম্পূর্ণ।[৬৬]

সুতরাং সকল কাজই 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' দ্বারা শুরু করা উচিত। আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করলে সুফল পাওয়া যায়।

আল্লাহর অস্তিত্ব : সৃষ্টিতত্ত্ব

ইসলামী জীবন-দর্শন ও বিশ্ব-দর্শন (worldview)-এর প্রধান ভিত্তি হলো এই যে, এ সৃষ্টিজগত এমনিতেই হয়ে যায়নি; তা স্রষ্টাহীন কোন বিবর্তনবাদের ফল নয়, বরং এ সৃষ্টিজগত এক বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তার নিখুঁত পরিকল্পনার ফসল। তিনি হলেন আল্লাহ। তিনি স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মালিক, তিনিই সত্যপথ প্রদর্শক। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একান্তভাবে তাঁর, অন্য কারো নয়।

"আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" দ্বারা কুরআনের আরো কয়েকটি আয়াত ও সূরা শুরু হয়েছে। সেখানে "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" এর সাথে আল্লাহর প্রশংসার এসব কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ-

---

৬৫. আবু ঈসা মুহাম্মাদ আত তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, কায়রো : ১ম সংস্করণ, দারুল হাদিস, ১৯৯৯ইং, হাদিস নং-৩৩৮৩।

৬৬. আবু দাউদ সোলাইমান ইবনুল আসআস, সুনান আবু দাউদ, কায়রো : দারুল হাদিস ৪৮৪০, ইবনে মাজা, হাদিস নং, ১৮৯৪, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং,১৬/৪৯০

(২) الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -

(৩) الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -

(৪) الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ۔

(১) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশসমূহ (সৌরজগত) ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্ত্বেও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ (শরিক) নির্ধারণ করে।"[৬৭]

(২) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশসমূহ (সৌরজগত) ও পৃথিবীর স্রষ্টা..।"[৬৮]

(৩) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছুরই মালিক।"[৬৯]

(৪) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দা [মুহাম্মদ (সা)]-এর উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন।"[৭০]

উপরে উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে সেই আল্লাহর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা। আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই সকল প্রশংসা। তৃতীয় আয়াতে সেই আল্লাহর প্রশংসার কথা বলা হয়েছে, যিনি সবকিছুর মালিক। যেহেতু আল্লাহই সবকিছুর মালিক, সেহেতু তাঁরই সকল প্রশংসা। চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, সকল প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি কিতাব নাযিল করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণ করেন, যা মানুষকে সত্যপথের সন্ধান দেয়। মূলকথা, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক, সত্যপথ প্রদর্শক। আখিরাতে তাঁরই নিকট সবকিছুর জবাব দিতে হবে। সুতরাং তাঁরই সকল প্রশংসা ও আনুগত্য।

তাওহীদ বা একত্ববাদ

সবকিছুর সৃষ্টি ও প্রতিপালন আল্লাহ একাই করেন। এতে তাঁর কোন সহযোগী, সাহায্যকারী বা অংশীদার নেই। কাজেই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, অন্য কারো নয়। এতে যদি আল্লাহর কোন শরিক থাকতো, সে শরিক

---

৬৭. আল-কুরআন- ৬ : ১।
৬৮. আল-কুরআন ৩৫ : ১।
৬৯. আল-কুরআন ৩৪ : ১।
৭০. আল-কুরআন ১৮ : ১।

সত্তাও প্রশংসার অংশীদার হতো। "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সবকিছুর প্রতিপালক," একথা বলে এখানে একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত, "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি", সে একত্ববাদকে আরো সুস্পষ্ট করে দেয়। কারণ, স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে যদি আল্লাহর কোন শরিক থাকতো, তা হলে তারা ইবাদতের অংশীদার হতো এবং তাদের নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করা হতো। কিন্তু এরূপ কারো বা কোন কিছুর অস্তিত্ব কোথাও নেই। বরং স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ হলেন এক, একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরিক (অংশীদার) নেই।[৭১] আর সেজন্য সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য।

একত্ববাদের সাথে সৃষ্টি ও প্রশংসার সম্পর্ক আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে সূরা আন'আমের প্রথম আয়াতে।[৭২] এখানে বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য, কেননা তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; কিন্তু এরপরও কাফিররা কীভাবে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে? অর্থাৎ আল্লাহর কোন শরিক নেই। গোটা কুরআনে এ মর্মে আরো বহু আয়াত আছে।

আল্লাহর প্রশংসা এবং সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ

'আল্-হামদু' মানে 'সকল প্রশংসা' বা 'প্রশংসা মাত্রই' আল্লাহর জন্য। প্রশংসা অন্য কারো প্রাপ্য নয় অথবা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কোন প্রশংসার যোগ্য বা অধিকারী নয়। প্রশংসা আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার নীতি রয়েছে এবং সে আলোকে ভালো অবস্থার লোকেরা অপেক্ষাকৃত মন্দ অবস্থার মানুষকে সাহায্য করবে। আর যারা সাহায্য পাবে, তারা সাহায্যকারীর শুকরিয়া আদায় করবে, প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ ـ

হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি

---

৭১. আল্লাহর উপর এ ঈমান অর্থ হলো আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা যা মানুষের গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ঈমান কীভাবে মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আবদুল খালেক, ঈমান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।

৭২. আল-কুরআন ৬ : ১।

মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।"[৭৩]

এ হাদিসের মর্ম হলো এই যে, সাহায্যকারীর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। তা হলে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, অন্য কারো জন্য নয়, এ কথার অর্থ কি? এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, সবকিছুর কার্যকারণ হলেন আল্লাহ। মানুষ যা পায় তা আল্লাহরই দান। কোন মানুষ সাহায্য রূপে যা অন্যকে দেয়, তাও আল্লাহর দান। সাহায্যকারীর অন্তরে অন্যকে সাহায্য করার যে মানসিকতা, তাও আল্লাহরই ইচ্ছায় হয়। সেহেতু সব অর্জন ও প্রাপ্তি, তা নিজ উপার্জনেই হোক বা অন্যের সাহায্যেই হোক, তা আল্লাহরই দেয়া নিয়ামত। সুতরাং নিয়ামতের উৎস ও কার্যকারণ হিসেবে প্রশংসার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো নিকট থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পায়, তা হলে তার জন্য দু'ধরনের আচরণ কাম্য। প্রথমেই বলা উচিত 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ'। এটি হলো সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত পাওয়ার জন্য নিয়ামতের উৎস আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং প্রশংসা করা। দ্বিতীয় কাম্য আচরণ হলো যার মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতটি পাওয়া গেলো, তার শুকরিয়া আদায় করা। যার মাধ্যমে নিয়ামতটি পাওয়া হয়, তার শুকরিয়া না করলে আল্লাহর শুকরিয়া পরিপূর্ণ রূপে আদায় করা হয় না।

---

৭৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ আত তিরমিযী, প্রাগুক্ত হাদিস নং- ১৯৫৫।

পঞ্চম অধ্যায়

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক

'রাববুল আলামীন' অর্থ 'আল্লাহ হলেন জগতসমূহের রব বা প্রতিপালক'। তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের লালন করেন, পালন করেন এবং প্রতিপালন করেন। প্রতিটি জিনিসকে তিনি সৃষ্টির প্রথম থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করিয়ে শেষ পর্যায়ে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিতে পরিণত করেন। এরপর তার লালন, পালন, প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যে সৃষ্টির জন্য যেরূপ লালন পালন প্রয়োজন, তার জন্য ঠিক সেরূপ ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর জন্য আল্লাহ রেখেছেন জীবিকার ব্যবস্থা। যার জন্য যখন যেখানে যেরূপে যা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সবকিছু।

আর এরূপ লালন-পালন-প্রতিপালনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সকল সৃষ্টি জগতের জন্য। পৃথিবী, সৌরজগত, আর পৃথিবীর অন্তর্গত মানবজগত, পশুজগত, পাখি জগত, বৃক্ষজগত ইত্যাকার সকল জগতের সকল সৃষ্টির জন্যই রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ হলেন জগতসমূহের প্রতিপালক (রাববুল আলামীন)। সুতরাং এরূপ প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য সকল প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য: 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'।

রব ও আলামীন : অর্থ ও তাৎপর্য

আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামীন, (জগতসমূহের প্রতিপালক)। এখান আলামীন শব্দটি আলম (عَالَمٌ)-এর বহুবচন। আলম (عَالَمٌ) শব্দটি আলামত (عَلَامَةٌ) শব্দ থেকে উদ্ভূত। আলামত অর্থ চিহ্ন, প্রমাণ ইত্যাদি। গোটা সৃষ্টিজগতই স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের চিহ্ন, প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে। এ হিসেবেই সৃষ্টিজগতকে আলম বলা হয়।

সুতরাং 'আলম' দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল জিনিস ও সকল অস্তিত্বকে বুঝায়। এ সৃষ্টিজগতের কলেবর, আকৃতি ও প্রকৃতি এতো বিরাট ও রহস্যময় যে, তা এখনো মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির সীমার বাইরে। মানুষের বাসস্থান এ পৃথিবী সম্পর্কেই মানুষের পূর্ণ জ্ঞান নেই। জলে, স্থলে ও ভূগর্ভে কি আছে, তার অনেক কিছুই এখনো মানুষের জানার বাইরে। এখনো বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে নানা জিনিস আবিষ্কৃত হচ্ছে, যা পূর্বে মানুষের জানা ছিল না। বন-জঙ্গলে ও পানির নীচে কতো সৃষ্টি আছে, তাও মানুষের জানা নেই। এমনকি যেসব সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু ধারণা মানুষের আছে, তারও অন্ত নেই।

মানবজগতের বাইরে আছে প্রাণীজগত, জড়জগত, তৃণজগত, জিনজগত ইত্যাদি। এসবের নাই কূল-কিনারা।

আরো বেশি রহস্যময় হলো সৌরজগত ও গ্যালাক্সীসমূহ। পৃথিবীর সমান এবং তার চেয়ে বহুগুণ বড় কতো গ্রহ নক্ষত্র আছে, তার আনুমানিক হিসাবও মানুষ এখনো করতে পারেনি। পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত আমাদের নিকটের গ্রহগুলো। এরপরও আরো কতো দূরে কতো সংখ্যক গ্রহ-নক্ষত্র আছে, আর গ্রহের মধ্যে কি কি সৃষ্টি আছে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ এ সৌরজগত ও ছায়াপথ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ছায়াপথ, সৌরজগত ও পৃথিবীর এ বিচিত্র ও রহস্যময় এবং জানা-অজানা সৃষ্টিজগতের সবকিছুই 'আলামীন' তথা 'জগতসমূহ' শব্দটির অন্তর্ভুক্ত।[৭৪] এ ব্যাপক অর্থেই 'আলম' শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের আয়াতটি তার প্রমাণ বহন করে।

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا -

"ফেরাউন বললো, জগতসমূহের রব বা প্রতিপালক আবার কি? (মূসা) বললো, তিনি সৌরজগত (নভোমণ্ডল) ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব বা প্রতিপালক।"[৭৫]

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গ্যালাক্সী, সৌরজগত ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে, সবই 'আলামীন' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ 'আলামীন' এর প্রতিপালক মানে এই যে, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু এ বিশ্বে, সৌরজগতে বা যেখানেই যা কিছু থাকুক না কেন, আল্লাহ হলেন সবকিছুর রব, প্রতিপালক।

এবার 'রব' সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। আরবীতে 'রব' শব্দের অর্থ মালিক, অধিকারী, রবুবিয়্যত, প্রাতিপালন গুণ এর কেন, আল্লাহ হলেন সব কিছুর রব বা প্রতিপালক।

---

৭৪. তবে কেউ কেউ আলামীন শব্দটিকে কোন নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবু দাউদ বলেন, বুদ্ধি বা 'আকল' সম্পন্ন সৃষ্টিই 'আলম' এর অন্তর্ভুক্ত। এ অর্থে 'আলম' বলে মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তানের লালন, পালন ও প্রতিপালন করেন। সুতরাং তাদের উচিত আল্লাহর আনুগত্য করা। অন্যান্য সৃষ্টির তো কোন ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা নেই। আল্লাহর বেঁধে দেয়াপ্রাকৃতিক নিয়ম তারা বাধ্যতামূলকভাবেই অনুসরণ করে চলেছে। অন্যান্যদের মতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল সৃষ্টিই 'আলম' এর অন্তর্ভুক্ত। কুরতুবী বলেন, এ অভিমতটিই সঠিক। মুহাম্মদ আলী সাবুনী, মুখতাছার তাফসীরে ইবনে কাসীর, বৈরুতঃ দারুল কুরআনুল করীম, ১ম খণ্ড, ১৯৮১ ইং, পৃ ২১।

৭৫. আল-কুরআন ২৬ : ২৩-২৪।

অধিকারী ইত্যাদি। এখানে রব দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তিনি হলেন সবকিছুর মালিক, অধিকারী ও প্রতিপালনকারী। 'আলামীন' তথা আল্লাহ ছাড়া যতো অস্তিত্বশীল জিনিস আছে, সবকিছুর মালিক, অধিকারী ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর 'রব' শব্দটি প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে 'রব' বলা হয় না। তবে কোন নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি সম্পর্ক স্থাপনের সময় আরবীতে কখনো কখনো অন্যের জন্যও রব শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, 'রব্বুলমাল' (رب المال) অর্থাৎ 'সম্পদের মালিক'। এখানে মালের মালিকানার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 'রব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শুধু 'রব' বলে একমাত্র আল্লাহকেই বুঝানো হয়, অন্য কাউকে নয়।

"রব" শব্দটির মূল হলো "রবুবিয়্যত"। "রবুবিয়্যত" একটি অত্যন্ত ব্যাপক শব্দ, যার অধিকারী হলেন আল্লাহ। বাংলায় সাধারণতঃ এ শব্দটির অর্থ করা হয় প্রতিপালন। যেসব অর্থে লালন, পালন, প্রতিপালন ব্যবহৃত হয়, রবুবিয়্যতের মধ্যে তার সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত আছে। এ শব্দটির ব্যাপকতাকে কয়েকটি সূক্ষ্ম অর্থে প্রকাশ করা যায়।

প্রথম, কোন জিনিসের সৃষ্টি বা জন্ম প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত ধাপে ধাপে লালন করে একটি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি হিসেবে উন্নীত করা রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ মানব শিশু জন্মের বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে। মাতৃগর্ভে শুক্র পতিত হওয়ার পর তাকে ঝুলন্ত বা সংযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে রক্তপিণ্ডে এবং পরে মাংসপিণ্ডে পরিবর্তিত করা, আর এভাবে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উন্নীত করা, অতঃপর একটি পূর্ণাঙ্গ মানবশিশু হিসেবে পরিণতি লাভ করানো, প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করা, এবং শেষ পর্যন্ত একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে মাতৃগর্ভ থেকে প্রসবের মাধ্যমে বের করে আনা, এ সবই রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের অন্তর্ভুক্ত।[৭৬]

প্রতিটি পর্যায়ে সূক্ষ্ম যত্ন ও লালনের প্রয়োজন, যার অভাবে অতি কোমলমতি ও স্পর্শকাতর (delicate) সম্ভাব্য শিশুটির করুণ পরিণতি হতে পারে। প্রতিটি পর্যায়ে অতি যত্ন সহকারে লালন ও সুরক্ষা করা এবং এভাবে করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত করা এক দক্ষ প্রতিপালন প্রক্রিয়ারই ফল। এ পর্যায়গুলোতে গর্ভবতী মা দিব্যি ঘুরে বেড়ান, আনন্দ করেন, কিন্তু প্রতিটি স্পর্শকাতর পর্যায়ে ভিতরে ভিতরে আগন্তুক শিশুটি কীভাবে লালিত হচ্ছে, কীভাবে একটি স্পর্শকাতর পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে যাচ্ছে, তার খবর কেউ পাচ্ছে না। একমাত্র আল্লাহ্ই গোপনে ও অগোচরে সে প্রতিপালনের কাজ

---

৭৬. মানব জন্মের এসব পর্যায়ের ইঙ্গিত আল্লাহ কুরআনে দিয়েছেন। দেখুন আল-কুরআন ২২ : ৫।

করে চলেছেন।[৭৭] সুতরাং আল্লাহ হলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে লালনকারী, প্রতিপালনকারী (রব)।

দ্বিতীয়, জন্ম প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মতম লালনের পর যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন শিশুটির দৈহিক ও মানসিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে একটা পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন সযত্ন লালন, পালন ও প্রতিপালন। প্রয়োজন অনুযায়ী এ প্রতিপালনের যথাযোগ্য ব্যবস্থাও আল্লাহই করেছেন। একটা মানবশিশুর জন্মের পর বড় হওয়া পর্যন্ত যে যত্ন প্রয়োজন, তিনি মায়ের মন ও যোগ্যতাকে সে যত্নের উপযোগী করেছেন। শিশুর জন্য মায়ের মনে এমন অকৃত্রিম ও সীমাহীন স্নেহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, মা নিজ জীবন দিয়েও সন্তানের সেবা করতে এবং শিশুর জীবন রক্ষা করতে এতটুকু দ্বিধা করেন না। কাদা মাটির মতো নরম ও স্পর্শকাতর শিশুকে তিলে তিলে গড়ে তোলার জন্য মা সবকিছু উজাড় করে দেন। এভাবেই একটা মানবশিশু মায়ের স্নেহ, আদর ও যত্নে গড়ে উঠে। অন্য কোন প্রাণীর নবজাত শিশুর জন্য এরূপ যত্ন প্রয়োজন হলে তার বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে পড়তো। একটা গাভীর পক্ষে এমন স্নেহ, আদর ও যত্ন দিয়ে তার বাচ্চার লালন ও পালন করা সম্ভব নয়। দেখুন, আল্লাহর রবুবিয়্যত ও প্রতিপালনের কী মহত্ত্ব! একটা বাছুর জন্মগ্রহণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে শুরু করে, যেখানে একটা মানব শিশুর পক্ষে দাঁড়াতেই প্রায় এক বছর লেগে যায়। এভাবে জন্মগ্রহণের পর যার যেরূপ লালন, পালন ও প্রতিপালনের প্রয়োজন, আল্লাহ প্রাকৃতিক নিয়মেই তার ব্যবস্থা রেখেছেন। কাজেই আল্লাহ সবকিছুর প্রতিপালক, (রাববুল আলামীন)।

তৃতীয়, জন্ম ও পরে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্তই আল্লাহর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন সীমাবদ্ধ নয়, বরং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا -

"পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়।"[৭৮]

অর্থাৎ প্রতিপালক হিসেবে মানুষ ও জিনসহ সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। প্রতিটি প্রাণীকে তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিয়মে জীবিকা সংগ্রহের করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানুষকে আল্লাহ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষ

---

৭৭. প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর জন্ম ও সৃষ্টিতেই এরূপ নানা ধরনের রবুবিয়াত ও লালনের বিষয় জড়িত রয়েছে।

৭৮. আল-কুরআন ১১ : ৬।

উপার্জন ও উৎপাদন করতে পারে, প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী জীবন ধারণের উপকরণাদি তৈরি করে নিতে পারে। একটা পাখি অথবা জঙ্গলের একটা প্রাণীকে আল্লাহ তেমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেননি। সুতরাং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন করতে হয় না। পাখি উড়ে গিয়ে খাবার পেয়ে যায়। জঙ্গলের প্রাণী জঙ্গলে বিচরণ করে খাবার জোগাড় করে নিতে পারে। নদী ও সমুদ্রে পানির নীচে মাছও সেখানেই তাদের খাবার পেয়ে যায়। প্রস্তরময় পাহাড়ের গায়ে গায়েও অনেক ধরনের কীট-পতঙ্গ ও পোকা মাকড় পাওয়া যায়। এ প্রস্তরময় পাহাড়ে সবুজের সমারোহ নেই, ফল নেই, পানিরও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সেখানেও এসব প্রাণীগুলো বেঁচে আছে। এরা কি খায়, আর তা কোথেকে আসে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এভাবে যেখানে যে প্রাণী আছে, সেখানে সে প্রাণীর জন্য যা প্রয়োজন, তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে আল্লাহই তার প্রতিপালন করছেন। সুতরাং আল্লাহই সবকিছুর প্রতিপালনকারী (রব)।

চতুর্থ, আল্লাহর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন শুধু জন্ম, জন্মের পর পূর্ণতা প্রাপ্তি ও জীবিকার ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে বা যা যেখানে আছে, সেখানে তা টিকে থাকার জন্য আল্লাহ যথার্থ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রেখেছেন, যা না হলে এসবের অস্তিত্ব ও লালন সম্ভব হতো না। বাংলাদেশে কুকুর আছে, উত্তর মেরুতেও কুকুর আছে। বাংলাদেশের একটা কুকুরকে যদি উত্তর মেরুতে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তা হলে সে কুকুর কিছুক্ষণের মধ্যে বরফে জমে গিয়ে মারা যাবে। অথচ উত্তর মেরুর কুকুরগুলো বরফের মধ্যে শুধু বেঁচেই থাকে না, বরং তারা বরফের উপর দিয়ে মানুষবাহী শ্লেজগাড়ী চালায়। আল্লাহ এসব কুকুরের গায়ে এতো ঘন পশম দিয়েছেন এবং এতো মোটা চামড়া দিয়েছেন যে, বরফের ঠাণ্ডা ও শীতলতা এদের দেহের ভিতরে ঢুকে এদের জীবন স্পন্দন মিটিয়ে দিতে পারে না। এরা দিব্যি বরফের ভিতর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর জীবন ধারণ করে যাচ্ছে। এখানে এদের বাচ্চাও হচ্ছে, তা টিকেও থাকছে।

এভাবে প্রাণী, বৃক্ষলতা ও সকল সৃষ্টির জন্য যেখানে যেভাবে যা প্রয়োজন, তার যথার্থ ব্যবস্থা রেখে সবকিছুর লালন, পালন ও প্রতিপালন করছেন আল্লাহ ।

পঞ্চম, সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে তার অস্তিত্ব ও জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত একটি পরিবেশ (environment) তৈরি করেছেন, যা না হলে জীবন ও অস্তিত্ব থাকতো না, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো। এর কিছু বিষয় আমরা সহজে বুঝতে পারি, কিছু ব্যাপার শুধু বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করতে পারেন, আর কিছু এখনো বিশেষজ্ঞরাও বুঝে উঠতে পারেননি। ভূপৃষ্ঠের যেখানে এবং যে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যা প্রয়োজন সেখানকার জমি তা-ই উৎপাদনের উপযোগী। সৃষ্টির লালন ও

প্রতিপালনের জন্য এ হলো এক মহাপরিকল্পনার ফল। এ বিষয়টি হয়তো সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু আরেকটু গভীরে প্রবেশ করলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। আমরা নিঃশ্বাসে যা গ্রহণ করি তা হলো অক্সিজেন, আর যা ত্যাগ করি তা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। অপরদিকে আমাদের পাশেই যে গাছ আছে, সে গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। গাছ যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড না নিতো, আর অক্সিজেন না দিতো, তা হলে মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতো। তখন জীবনও থাকতো না, জীবনের লালন ও প্রতিপালনও হতো না। সুতরাং জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষায় মানুষ ও বৃক্ষলতা পরিপূরক ভূমিকা পালন করে।

আমাদের আশে পাশে অনেক প্রাণী আছে। তারা কেন আছে, তাদের কি প্রয়োজন, অনেক সময় আমরা বুঝি না। নর্দমায় ব্যাঙ ডাকে, বিষাক্ত সাপ আছে, ডাঙ্গায় ও পানিতে অনেক প্রাণী আছে। এরা কেন আছে, কেন এদের সৃষ্টি, তা আমরা বুঝি না। কিন্তু আমরা এদের প্রয়োজন উপলব্ধি না করতে পারলেও জীবন ও পরিবেশ রক্ষায় এদের নিশ্চয়ই কোন ভূমিকা রয়েছে। পৃথিবী ছাড়াও সৌরগজতে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে, যার সংখ্যা মানুষের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয়। এগুলো সৃষ্টির কারণ কি তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তবে বৈজ্ঞানিকগণ এতটুকু অনুমান করতে পারেন যে, এগুলো নিরাপদ দূরত্বে নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। এদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। এদের অবস্থানে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন বা বিচ্যুতি ঘটলে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে এক প্রলয়কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যেসব জিনিসের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই, সেগুলোও আমাদের অজানা কোন প্রয়োজনেই রয়েছে। পৃথিবীর অনেক এলাকায় মাইলের পর মাইল মাটির পাহাড় রয়েছে, আবার পাথরের পর্বতমালাও আছে। মনে হয় এগুলো বিনা কারণে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে এগুলো বিনা কারণে নয়, বরং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আসলে গোটা বিশ্ব এবং তাতে অবস্থিত সবকিছুর অস্তিত্ব, লালন-পালন ও প্রতিপালন পরিমিতভাবে ভারসাম্য রক্ষার কাজেই নিয়োজিত। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ -

"আর পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, এবং তাতে প্রত্যেক জিনিসকে আমি সুপরিমিত ও ভারসাম্য সহকারে উদ্গত করেছি।"[৭৯]

---

৭৯. আল-কুরআন ১৫ : ১৯।

উল্লেখযোগ্য যে, এ সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। যথার্থ অনুপাতে ভারসাম্যপূর্ণ এ মহাসৃষ্টি ও তার লালন, পালন ও প্রতিপালন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে কেন্দ্র করেই করা হচ্ছে। অর্থাৎ সবকিছুর সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে মানুষের প্রতিপালনের জন্য। কিন্তু কেন এতো সযত্ন ও সুপরিকল্পিত প্রতিপালন ব্যবস্থা? এগুলো কি অনর্থক?

আল্লাহর এ সৃষ্টি, সৃষ্টির রবুরিয়্যত ও প্রতিপালন নিঃসন্দেহে অনর্থক নয়। যারা এ সম্পর্কে চিন্তা করে, তারা বিনা দ্বিধায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে, "হে প্রতিপালক, তুমি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি।"[৮০] তা হলে আল্লাহর এ সৃষ্টি ও সযত্ন প্রতিপালন থেকে আমাদের চিন্তাগজতের কি খোরাক পাওয়া যায়? অথবা, এথেকে আমাদের কি শিক্ষা আছে? এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় বিবেচনা করতে পারি।

(১) প্রতিপালকের প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও ইবাদত কাম্য।

(২) অন্যায় উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই, কেননা জীবিকা ও প্রতিপালনের দায়িত্ব আল্লাহই নিয়েছেন।

(৩) তবে যেহেতু মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা অন্বেষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেহেতু অনুমোদিত উপায়ে হালাল উপার্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রসঙ্গে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রতিপালকের প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও ইবাদত

আল্লাহর সযত্ন সৃষ্টি ও প্রতিপালনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর প্রশংসা করা। আর এ প্রশংসার উপায় হলো আল্লাহকে রব তথা স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কাছে মাথা নত করে দেয়া। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে পৃথিবীতে এবং অনন্তকালের জীবন আখিরাতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক সাফল্য অর্জন করা।

মানুষের উচিত স্রষ্টা ও প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁরই প্রশংসা করা, তাঁরই আনুগত্য ও ইবাদত করা। সূরা ফাতিহার বাচনভঙ্গি থেকেও তা-ই প্রতীয়মান হয়। বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সবকিছুর প্রতিপালন করেন (আয়াত-১)। কাজেই সযত্ন প্রতিপালনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করা উচিত। এরপর রবুরিয়্যত ও প্রতিপালনের ঘোষণার পর একান্তভাবে তাঁরই ইবাদতের অঙ্গীকার ব্যক্ত করানো হয়েছে

---

৮০. আল কুরআন ৩ : ১৯১।

(আয়াত-৪)। ইবাদতের সে অঙ্গীকার রক্ষা করতে হলে আল্লাহর অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

(১) وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا -

(২) وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -

(১) "তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত হিসাব করো, তবে তা গণনা করতে পারবে না।"[৮১]

(২) "আর আল্লাহর নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাকো।"[৮২]

বলাবাহুল্য, আল্লাহর শুকরিয়ার উপায় হলো মুখে আল্লাহর প্রশংসা করা, আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো করা এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা।

অন্যায় উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই

রবুরিয়্যত ও প্রতিপালনের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা দান করেছেন। এ প্রতিপালন প্রক্রিয়ায় যার জন্য যে রিয্ক নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা সে পাবেই। তা না পাওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হবে না। এখান থেকে ইসলামের আরেকটি মৌলিক বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায়। তা হলো রিয্ক ও তাকদীর। আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য যে রিয্ক তাকদীরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সে তা অবশ্যই পাবে। সুতরাং সে যদি শুধু হালাল উপার্জনকেই বেছে নেয় এবং হারাম থেকে বিরত থাকে, তবে হালাল উপায়েই তা প্রাপ্ত হবে। হারাম উপায় অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নেই। কেউ যদি অধিক পাওয়ার জন্য হারাম উপায় অবলম্বন করে, তবু সে নির্ধারিত রিযিকের অতিরিক্ত পাবে না। কাজেই হারাম পন্থায় উপার্জনের চেষ্টা করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। হারাম উপার্জন ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য অকল্যাণকর। ইসলাম মানুষের জন্য সকল প্রকার অকল্যাণকর জিনিসকেই হারাম করেছে।

সুতরাং জীবিকা অন্বেষণের জন্য, অথবা অধিক পাওয়ার জন্য অন্যায় পন্থা এবং নিষিদ্ধ বা হারাম উপায় অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নেই। এ

---

৮১. আল কুরআন ১৬:১৮।
৮২. আল কুরআন ১৬:১১৪।

বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়েই রাসূলুল্লাহ (সা) হারাম উপার্জন ও হারাম সম্পদ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يَأَيُّهَا النَّاسُ، اِتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، خُذُوْا مَا حَلَّ، وَدَعُوْا مَا حَرُمَ-

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "হে মানব সমাজ! আল্লাহকে ভয় করো এবং উপার্জনে ভালো (হালাল) পন্থা অবলম্বন করো। কেননা, কোন ব্যক্তি ততোক্ষণ মৃত্যুমুখে পতিত হবে না যতোক্ষণ না তার রিযক পূর্ণভাবে পৌছে, যদিও সে তা থেকে বিরত থাকে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং উপার্জনে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা পরিত্যাগ করো।"[৮৩]

এখান থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, উপার্জনে বৈধ ও হালাল পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কারণ অসৎ বা অবৈধ উপায় অবলম্বন করে কোন লাভ নেই।[৮৪]

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব

আল্লাহর রবুরিয়্যত ও প্রতিপালন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম হলো এই যে, সৃষ্টির জন্য যা উপযুক্ত, সেভাবেই তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। একটা সাধারণ প্রাণী এমনিতেই তার জীবিকা পেয়ে যায়, কারণ তাকে উৎপাদন বা উপার্জনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কিন্তু যেহেতু মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেহেতু এসব ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে উৎপাদন ও উপার্জন করতে হয়।

মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার জীবিকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মানুষের দায়িত্ব হলো এগুলো খুঁজে বের করা, প্রাকৃতিক সম্পদের কাম্য ও পূর্ণাঙ্গ

---

৮৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে মাজাহ হাদিস নং ২১৪৪।

৮৪. তবে এখান থেকে এ ভ্রান্ত ধারণা নেয়া ঠিক হবে না যে, কাজ না করে শুধু তাকদীর ও রিযক এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে। ইসলাম কাজের ধর্ম, কাজ করেই তাকদীরের রিযক অর্জন করতে হবে (আল কুরআন-৫৩ : ৩৯)। উল্লেখ্য খারাপ পন্থা অবলম্বন করে তাকদীরের চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে না।

ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব কল্যাণ সাধন করা। আল্লাহর প্রতিপালন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হিসেবেই তা করা উচিত।[৮৫]

---

৮৫. এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বইপত্রে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আগ্রহী পাঠকগণ নিম্নে উল্লেখিত বইগুলি দেখতে পারেন।

(1) Abulhasan M Sadeq, Economic Development in Islam. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2004.

(2) Ataul Huq Pramanik et al, Development in the Islamic Way. Kuala Lumpur: International Islamic UniversityMalaysia, 1997.

(3) Abulhasan M Sadeq, Development and Finance in Islam : Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 1991.

(4) Ziauddin Ahmed, Islam, Poverty and Income Distribution. Leicester (UK): The Islamic Foundation, 1991.

(5) Munawer Iqbal (ed.) Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty

. Leicester (UK). The Islamic Poundation.

ষষ্ঠ অধ্যায়

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ

যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু

'আর্‌রাহ্‌মানির রাহীম' অর্থ 'পরম করুণাময়, অতি দয়ালু'। সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহর 'করুণাময় ও দয়ালু' হওয়ার স্বাক্ষর রয়েছে। সৃষ্টি ও জন্ম থেকে পর্যন্ত, এবং মৃত্যুর পরও রয়েছে শুধু করুণা আর করুণা। বস্তুতঃ করুণা হলো আল্লাহর অন্যতম প্রধান গুণ। আল্লাহ বলেন,

(১) كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ-

(২) كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ-

(৩) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ-

(১) "তোমাদের প্রতিপালক করুণা করাকে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।"[৮৬]

(২) "করুণা করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।"[৮৭]

(৩) "আর আমার করুণা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"[৮৮]

সুতরাং আল্লাহ পরম করুণাময় ও দয়ালু। দুনিয়ার জীবনও তাঁর দয়া ও করুণায় পরিপূর্ণ। আখিরাতেও রয়েছে করুণা আর করুণা।

রাহমান ও রাহীম : অর্থ ও তাৎপর্য

রাহমান' ও রাহীম' শব্দ দুইটি রহমত' শব্দ থেকে থেকে উৎসারিত আধিক্যবোধক শব্দ। রহমত' অর্থ কোমলতা, নম্রতা, করুণা, দয়া ইত্যাদি। যার মধ্যে এ গুণ আছে, তাকে রাহিম' (رَاحِمٌ) বলা হয়। যার মধ্যে এ গুণ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে, তাকে বুঝাবার জন্য আরবীতে আধিক্যবোধক শব্দ (صِيْغَةُ الْمُبَالَغَةِ) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ হলেন পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। আল্লাহর দয়া ও করুণার চিহ্ন ও বিস্তৃতি সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রসারিত।

---

৮৬. আল-কুরআন ৬ :৫৪

৮৭. আল-কুরআন ৬ : ১২।

৮৮. আল-কুরআন ৭ : ১৫৬।

প্রথম, সৃষ্টি বৈচিত্রের মধ্যে আল্লাহর দয়া ও করুণার চিহ্ন বর্তমান। ভারসাম্য ও সমন্বিতভাবে সবকিছুর সযত্ন সৃষ্টি, লালন, পালন ও প্রতিপালন আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রমাণ ও লক্ষণ বহন করে। (এ ব্যাপারে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

দ্বিতীয়, মানুষকে শুধু আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েই আল্লাহ ক্ষান্ত হননি, বরং হিদায়াতের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন। নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সত্য পথ খুজে নেয়া মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হতো। কিন্তু আল্লাহ মানুষকে এ বিশ্বে বিভ্রান্ত হওয়ার জন্য ছেড়ে দেননি। বরং সত্য পথের হিদায়াত দেয়ার জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

(১) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

(২) هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ -

(১) "আর (হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[৮৯]

(২) "তিনিই (মহান আল্লাহ) যিনি হিদায়াত ও দীনে হক (সত্য-সঠিক জীবন-ব্যবস্থা) সহকারে তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন যেনো সে এ জীবন-ব্যবস্থাকে সকল জীবন-ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে।"[৯০]

এ দুটি আয়াতকে একত্রিত করলে দাঁড়ায় এই যে, হিদায়াত ও দীন হলো রহমত, যা দিয়ে রাসূলকে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য কিতাব দিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ সত্য সঠিক পথের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এতে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে নিয়ে সবকিছুর দিক-নিদের্শনা রয়েছে। এরকম একটা কিতাব ব্যতীত রাসূলের পক্ষেও মানুষকে হিদায়াতের পথে দাওয়াত দেয়া সম্ভব হতো না। আর মানুষের পক্ষেও সত্যের আলো পাওয়া কঠিন হতো। এমন কুরআন এবং এ কুরআন শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ নিজেও করুণা ও দয়া বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

(১) الرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ -

(২) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -

(৩) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -

৮৯. আল-কুরআন ২১ : ১০৭।
৯০. আল-কুরআন ৯ : ৩৩।

(১) "আল্লাহ হলেন পরম দয়ালু। যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।"[৯১]

(২) "আর আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।"[৯২]

(৩) "হে মানুষ, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে (কুফরী ও মন্দ) তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"[৯৩]

তৃতীয়, এতো কিছুর পরও মানুষের পদস্খলন হয়। মানুষ আল্লাহর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে ফেলে। অপরাধ করে ফেলে। আল্লাহর সীমাহীন দয়ার লক্ষণ হলো এই যে, মানুষ যতোই অপরাধ করুক, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন (তাওবা) করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন, "(হে রাসূল), আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজের প্রতি অবিচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। তিনিই তো পরম ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"[৯৪]

এ আয়াতে মানুষকে আশার বাণী শুনানো হয়েছে। মানুষ যদি অপরাধ করে ফেলে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ করুণা ও দয়ার সাথে তা ক্ষমা করে দেন। এরূপ করুণা ও দয়া প্রর্দশন না করলে মানুষের কোন উপায় ছিল না। আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ নিজের জন্য মানুষের ব্যাপারে রহমতের আচরণ ধার্য করে নিয়েছেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো সকল প্রকার অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। যদি কোন ভুল হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া। আর তার ক্ষতিপূরণের জন্য ভালো কাজ করা[৯৫]। তা হলে নিজ করুণায় আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

চতুর্থ, যারা পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহকে অস্বীকার করে, যারা আল্লাহ ও আল্লাহর দীনের দুশমন ও বিদ্বেষপরায়ণ, তাদেরকেও আল্লাহ দুনিয়াতে সব রকম নিয়ামত দিচ্ছেন; তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে জীবিকার উপকরণাদি দিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছেন না।[৯৬] এটাও আল্লাহর বিরাট দয়া ও করুণা।

---

৯১. আল-কুরআন ৫৫ : ১-২।

৯২. আল-কুরআন ১৭:৮২।

৯৩. আল-কুরআন ১০:৫৭। কুরআনের বহু আয়াতে রাসূলকে আল্লাহর দয়া ও করুণা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, আল-কুরআন ১০ : ৫৮; ৪৫ : ২০; ৪৪ : ৬।

৯৪. আল-কুরআন ৩৯ : ৫৩।

৯৫. ভালো কাজ মন্দ কাজের পাপকে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, "নিঃসন্দেহে নেক্‌কাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়।" আল কুরআন ১১ : ১১৪।

৯৬. "করুণা ও দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন" (আল-কুরআন ৬ : ১২)। আরো দেখুন, আল-কুরআন ৬ : ৫৩।

পঞ্চম, মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচার এবং মানুষের সাথে আল্লাহর আচরণও পরম করুণার পরিচয় বহন করবে। যারা আল্লাহতে ঈমান আনার পরও খারাপ কাজ করে, নানা উসিলায় তাদের অনেককেই আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। যাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে খারাপ কাজের পরিমাণ শাস্তি দেবেন, তার চেয়ে একটুও বেশি নয়। কিন্তু যারা ভালো কাজ করে, তাদেরকে পুরস্কার দেবেন দশগুণ থেকে সাত শত গুণ বেশি। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, নিষ্ঠা, একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্টির নিয়্যত ইত্যাদি মাপকাঠির উপর নির্ভর করে পুরস্কারের আধিক্য। যাই হোক, অনেক পাপই আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন; পাপের শাস্তি কোন মতেই পাপের পরিমাণের চাইতে অধিক হবে না, অথচ নেক কাজের পুরস্কার হবে অনেক গুণ বেশি। এগুলো নিঃসন্দেহে আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রমাণ ও লক্ষণ।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে 'রাহমান' ও 'রাহীম' এর কিছুটা তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। এবার এ দুটি শব্দের কিছু শাব্দিক আলোচনা করা যাচ্ছে। পূর্বে বলা হয়েছে, আরবীতে 'রাহমান ও রাহীম' হলো আধিক্যবোধক শব্দ (صِيْغَةُ الْمُبَالَغَةِ)। তবে অর্থের দিক দিয়ে রাহমান' ও রাহীম' শব্দ দুটিতে একই মাত্রার আধিক্য রয়েছে, নাকি পার্থক্য আছে, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত আছে। কেউ কেউ বলেন, এ দু'টি শব্দে একই মাত্রার আধিক্য রয়েছে (صِيْغَةُ الْمُبَالَغَةِ)। কিন্তু একই মাত্রার হলেও আল্লাহ তা'আলার অপার করুণার গুণের প্রতি গুরুত্ব (emphasis) দেয়ার জন্য একই মাত্রার দু'টি শব্দ পর পর ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে অধিকাংশ তাফসিরকারকের অভিমত হলো এই যে, 'রাহীম' এর তুলনায় 'রাহমান' শব্দে আধিক্যের মাত্রা বেশি রয়েছে। অর্থাৎ 'রাহীম' বলে যেমন অধিক করুণা বুঝায়, তার চাইতে অনেক বেশি করুণা বুঝায় 'রাহমান' দ্বারা। এ হিসেবেই বলা হয় 'রাহমান' এর সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে, আর 'রাহীম' এর সম্পর্ক আখিরাতের সাথে। কারণ দুনিয়াতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের প্রতি, এমন কি প্রাণিজগত ও জড়জগতের সবকিছুর প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা বিদ্যমান। যারা আল্লাহ ও তাঁর দীনের বিরোধী, আল্লাহ তাদেরকেও অবারিত নিয়ামত দিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে আখিরাতে শুধু বিশ্বাসীরাই আল্লাহর দয়া ও করুণা পাবে, অপরাধী অবিশ্বাসীরা পাবে শাস্তি। এভাবেই দুনিয়াতে আল্লাহর দয়া ও করুণার ব্যাপ্তি অধিক, আর সেহেতু 'রাহমান' শব্দটি দুনিয়ার জন্য প্রযোজ্য। আখিরাতে দয়া ও করুণার ক্ষেত্র ও প্রয়োগ কম, আর সেহেতু সে ক্ষেত্রে 'রাহীম' শব্দটি প্রযোজ্য।

'রাহীম' শব্দে করুণার মাত্রা কম হওয়ার কারণে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যও 'রাহীম' শব্দটির প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু 'রাহমান' কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। করুণা ও দয়ার যে মাত্রা 'রাহমান' শব্দে রয়েছে, সে মাপের করুণা

ও দয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে নেই। উদাহরণ স্বরূপ, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য কুরআনে 'রাহীম' ও 'রহমত' দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। শেষ নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ তিনি মুমিনদের প্রতি সহমর্মিতা পরায়ণ[৯৭], এবং رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ (জগতসমূহের জন্য রাহীম[৯৮])।

মহানবী (সা) সত্যিই দয়ার সাগর। শত কষ্ট সহ্য করে এবং রক্ত দিয়েও তিনি মানুষকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে মুক্তির পথে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তায়েফে যে অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য তিনি ছুটে গেলেন, তাদের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়েও তিনি তাদের জন্যই আল্লাহর নিকট দু'য়া করেছেন। কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীরা যেখানে يَانَفْسِي يَانَفْسِي বলে নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত থাকবেন, তখন শেষ নবী اُمَّتِي اُمَّتِي (আমার উম্মত, আমার উম্মত) বলে আল্লাহর নিকট মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করতে থাকবেন। সুতরাং তাঁর জন্য রাহীম' শব্দটি যথার্থ হয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ্ হলেন 'রাহমান', 'পরম করুণাময়', যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য নয়। তিনি রাহীম' তো বটেই। এ অর্থে রাহীম' এর তুলনায় 'রাহমান' এর মধ্যে রহমত ও করুণার মাত্রা অধিক রয়েছে (অর্থাৎ رَحْمٰنُ হলো অধিক দয়ালু مُبَالَغَة শব্দ)। আর এ হিসেবে আল্লাহ রাহমান' মানে এই যে, আল্লাহ এতো অধিক করুণাময় যে, অন্য কেউ এমন করুণা ও দয়া করতে পারে না, যদিও নবী-রাসূল বা অন্য কেউ রাহীম' পর্যায়ের দয়ালু হতে পারেন। এখানে মনে রাখা দরকার, করুণা বা দয়া যে মাত্রায়ই হোক, কম হোক বা বেশি, আল্লাহর করুণা ও দয়ার সাথে কোন সৃষ্টির দয়ার তুলনা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কোন সৃষ্টি কোন গুণেই আল্লাহর মতো হতে পারে না।

আল্লাহ করুণাময় হলে দুনিয়াতে এতো কষ্ট কেন?

আল্লাহ হলেন করুণার আঁধার। কিন্তু প্রশ্ন, পরম করুণাময় আল্লাহর অনেক বান্দাই দুনিয়াতে অনেক কষ্টের মধ্যে আছে। রোগ, শোক, যাতনা, বিপদ-আপদ ইত্যাকার অনেক কষ্টের শিকারই হয় আল্লাহর অনেক বান্দা। আল্লাহ তো করুণা করে এসব কষ্ট দূর করতে পারেন। তবু কেন দুনিয়াতে এতো কষ্ট?

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, অনেক দুঃখে ও কষ্টে অন্তর্নিহিত থাকে দয়া ও করুণার আবেশ। স্থূল চিন্তায় কষ্ট মনে হলেও অনেক কিছুর নেপথ্য উদ্দেশ্যেই রয়েছে কল্যাণ। পর্যালোচনা করলে তা উপলব্ধি করা কঠিন হবে না।

---

৯৭. আল-কুরআন ৯ : ১২৮।

৯৮. আল-কুরআন ২১ : ১০৭

এখানে দু'একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। মানুষকে ছোট কষ্ট দিয়ে বড় কষ্ট থেকে রক্ষা করা নিঃসন্দেহে দয়া ও করুণা ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ মানুষকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। যারা সে পথের অনুসারী হয়ে ভালো কাজ করবে তারা দুনিয়াতেও শান্তি পাবে এবং আখিরাতে পাবে অনন্ত কালের প্রশান্তির জীবন, মহাপুরস্কার, সীমাহীন নিয়ামতের জান্নাত। কিন্তু যারা এ দুনিয়ার ক্ষণিকের আনন্দ-ফুর্তির জন্য আখিরাতের সীমাহীন নিয়ামত ও কল্যাণ বিসর্জন দিবে, তাদের মতো বোকা কেউ নেই। দুনিয়াতে ক্ষণিকের সামান্য আকর্ষণের জন্য তারা আখিরাতে দোযখবাসী হয়ে অনন্তকালের সীমাহীন যাতনা ও কষ্টে নিপতিত হবে। দুনিয়াতে কিছু কষ্ট দিয়ে যদি তাদেরকে আখিরাতের সীমাহীন কষ্ট থেকে বাঁচানো যায়, তা হবে নিঃসন্দেহে তাদের প্রতি দয়া ও করুণার আচরণ। আল্লাহ অনেক সময় দুনিয়াতে বিপদ দিয়ে খারাপ কাজ থেকে হুঁশিয়ার করে দেন, যেনো মানুষ ভালো হয়ে যায়।[৯৯] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি করুণা পরবশ হয়ে তার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তাকে শাসন করেন। এভাবে শাসন করে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা নিঃসন্দেহে দয়ারই প্রমাণ। এটি হলো সন্তানকে পিতামাতার শাসন করার মতো। কারো সন্তান যদি খারাপ কাজ করে, পিতামাতা তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। সে বুঝতে না চাইলে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত না হলে পিতামাতা তাকে শাসন করেন। কারো সন্তান যদি হেলায়-খেলায় সময় কাটায়, স্কুল ফাঁকি দেয় এবং লেখা-পড়া না করে, তা হলে পিতামাতা তাকে শাসন করেন। প্রয়োজনে ঘরে আটকে রেখেও লেখাপড়া করান। পিতামাতার এ শাসন ও শাস্তি সন্তানের প্রতি তাদের অকৃত্রিম দয়া ও করুণারই বহিঃপ্রকাশ। এভাবে একটু শাসন করে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং তাকে পারলৌকিক সীমাহীন শান্তির জীবন দানের চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা, করুণা ও দয়ার আচরণ।

অপরদিকে আল্লাহ কখনো কখনো মানুষের মন্দ কাজের কিছু শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে আখিরাতের অনন্তকালের সীমাহীন আযাব থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে এটি হলো করুণা। এভাবে দুনিয়াতে যে কষ্ট আসে, যা বান্দারই মন্দ কাজের ফল, তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর করুণারই নিদর্শন। আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ -

"আর তোমাদের যে বিপদ ঘটে, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল, এবং

---

৯৯. আল্লাহ বলেনঃ "মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে (আল্লাহ) তাদের কোন কোন অসৎ কর্মের শাস্তি ভোগ করান, যাতে তারা সুপথে ফিরে আসে।" আল কুরআন ৩০:৪১।

তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমাই করে দেন[১০০] ।"

সুতরাং যে কষ্ট ও বিপদ মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে অথবা কিছু মন্দ কাজের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেয়া হয় তা প্রকারান্তরে করুণা ও দয়ারই নিদর্শন। প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে শাস্তি দেয়া হয়, তাও প্রাপ্য শাস্তির তুলনায় অনেক কম। প্রাপ্য শাস্তির পুরোটাই যদি দেয়া হতো, তবে তা হতো এক ভয়াবহ ব্যাপার।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى -

"আল্লাহ মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণিকে রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন"।[১০১]

কোন কোন সময় দেখা যায়, আল্লাহওয়ালা ভালো মানুষও কষ্টে আছে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। প্রথম, যারা ভালো ও নেককার মানুষ, তাদের সামান্য অপরাধও অবাঞ্ছিত, তাদেরকে সামান্য বিচ্যুতি থেকেও রক্ষা করে আখিরাতে মহাকল্যাণ নিশ্চিত করা শাস্তির একটি উদ্দেশ্য। এটি নিঃসন্দেহে তাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা। দ্বিতীয়, আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দার দ্বারা কোন বিচ্যুতি হয়ে গেলে তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আল্লাহ্ তাকে দুনিয়াতে কিছুটা কষ্ট দেন এবং এভাবে দুনিয়াতেই সামান্য শাস্তি দিয়ে আখিরাতে মুক্তি ও মহাকল্যাণ নিশ্চিত করেন। এটিও তার প্রতি দয়ারই প্রমাণ। তৃতীয়, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়াতে কষ্ট দিয়ে আখিরাতে তার মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহর পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের জন্য রয়েছে আরো অধিক পুরস্কার। প্রিয়জনকে সামান্য কষ্ট দিয়ে অসামান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা তো করুণা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তা হলে কথা দাঁড়ালো এই যে, সামান্য কষ্ট দিয়ে বড় বিপদ থেকে বাঁচানো, অথবা প্রিয় বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি, এ ধরনের যে কারণেই কষ্ট ও বিপদ দেয়া হোক, তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দয়া ও করুণারই নিদর্শন। বাহ্যতঃ তা দেখতে মন্দ, কিন্তু আসলে ভালো। আমরা কোন জিনিসকে খারাপ ভাবতে পারি, কিন্তু তা আমাদের জন্য কল্যাণকরও হতে পারে।

---

১০০. আল-কুরআন ৪২ : ৩০।
১০১. আল-কুরআন-৩৫ : ৪৫।

আল্লাহ বলেন,

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

"তোমরা যা অপছন্দ করো, সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর; আর তোমরা যা ভালোবাস, সম্ভবত তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। আল্লাহ তা জানেন, তোমরা তা জানো না।"[১০২]

সারকথা, মানুষ কখনো কখনো যে কষ্ট, বিপদ ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, তা বাহ্যতঃ খারাপ মনে হতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা ভালো। অপর পক্ষে তা ভালো মনে হতে পারে, যদিও তা খারাপ। দেখতে খারাপ, আসলে ভালো। এরূপ একটি উদাহরণই কুরআনে পাওয়া যায় মূসা (আ) ও খিযির (আ) এর ঘটনায়। মূসা (আ) একদা খিযির (আ) এর সফরসঙ্গী হয়ে যাত্রা করেন। খিযির (আ) তাঁকে এই শর্তে সফর সঙ্গী করেন যে, তিনি তাঁকে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। তিনি নিজ ইচ্ছায় তাঁকে যতটুকু বলেন তার বাইরে প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ, অনেক বিষয়ের রহস্য বাহ্যতঃ বুঝে উঠা কঠিন হবে। এই সফরে তাঁরা একবার নৌকায় ছিলেন, হঠাৎ খিযির (আ) উঠে গিয়ে নৌকার মধ্যে ছিদ্র করে দিলেন, যাতে নৌকাতে পানি উঠতে থাকে। মূসা (আ) ভাবলেন, বিনা কারণে মাঝির নৌকা ফুটা বা ছিদ্র করা নিঃসন্দেহে একটা খারাপ কাজ। তিনি খিযির (আ)-কে এরূপ খারাপ কাজ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।[১০৩] খিযির (আ) এতে অসন্তুষ্ট হলেও পরে মূসা (আ)-এর অজুহাত গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন :

أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا-

"নৌকা (ছিদ্র করার) বিষয়টি হলো এই যে, তার মালিক ছিল কয়েকটি দরিদ্র ব্যক্তি, যা দ্বারা তারা সমুদ্রপথে জীবিকা উপার্জন করতো। আমি নৌকাটি একটু নষ্ট করে দিতে চাইলাম এজন্য যে, সামনেই এক বাদশাহ অবস্থান করছিল, যে (ভালো) নৌকা (পেলেই) ছিনিয়ে নিতো।"[১০৪]

---

১০২. আল-কুরআন ২ : ২১৬।
১০৩. আল-কুরআন ১৮ : ৭১।
১০৪. আল-কুরআন ১৮ : ৭৯।

তিনি একথাও বললেন যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশেই এ কাজ করেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে নৌকার সাহায্যে যাত্রী নদীপথ অতিক্রম করছে, তাতে ছিদ্র করে দেয়া নিঃসন্দেহে একটা খারাপ কাজ। কিন্তু এ সামান্য খারাপ কাজ দিয়ে বৃহত্তর অনিষ্ট থেকে গরীব মানুষগুলোকে বাঁচানো নিঃসন্দেহে ভালো কাজ, দয়া ও করুণার কাজ। এমনিভাবে আল্লাহ হয়তো মানুষকে দুনিয়াতে কিছু কষ্ট দেন। মানুষ কষ্ট পায়, কিন্তু এতে রয়েছে মহান করুণাময় আল্লাহর পরম করুণা ও দয়া, যদি আমাদের সে রহস্য উপলব্ধি করার মতো চেতনা ও জ্ঞান থাকে। মানুষের কষ্ট আছে, দুঃখ আছে, কিন্তু তাও আসলে আল্লাহর করুণা ও দয়া। আল্লাহ হলেন পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

ভুল হলে নৈরাশ্য নয়, বরং প্রত্যাবর্তন, ক্ষমা প্রার্থনা ও আনুগত্য কাম্য

আল্লাহ হলেন পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। আমাদের উচিত এর ফায়দা গ্রহণ করা এবং করুণাময় আল্লাহকে সন্তুষ্ট রেখে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা। যদি কখনো ভুল হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া, এবং ভুলকে আমলনামার রেকর্ড থেকে মুছে ফেলার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ভালো কাজ করে ফেলা; কারণ, ভালো কাজ খারাপকে মুছে দেয়।[১০৫] অতীত জীবনে যতই ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকুক না কেন, আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ إِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"(হে নবী, তাদেরকে আমার এ কথা) বলে দাও : হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজের উপর যুলুম-অত্যাচার করেছ, আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেন; তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১০৬]

সুতরাং চেষ্টা করা উচিত ভালো কাজ করার এবং অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত থাকার। ভুল হয়ে গেলে, সে ভুল যতো বড়ই হোক, ক্ষমা চেয়ে সুপথে ফিরে আসা এবং সে পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য। পরম করুণাময়ের সাথে এরূপ আচরণই শোভা পায়।

---

১০৫. 'নিঃসন্দেহে পুণ্য পাপকে মিটিয়ে দেয়'। (আল কুরআন ১১:১১৪)।
১০৬. আল-কুরআন ৩৯ : ৫৩।

সপ্তম অধ্যায়

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

যিনি বিচার দিনের মালিক

"মালিকি ইয়াউমিদ্দীন" অর্থাৎ আল্লাহ বিচার দিন ও প্রতিদান দিবসের[১০৭] মালিক বা বাদশাহ।[১০৮] এ ছোট্ট কথাটিতে ইসলামী জীবন-দর্শনের কয়েকটা মৌলিক বিষয়ের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) ও ঘোষণা রয়েছে। এ ঘোষণার সারমর্ম হলো এই যে, এ দুনিয়ার পর অনন্তকালের জীবন রয়েছে, যাকে আখিরাত বলা হয়। কিয়ামতের দিন পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একত্রিত করে বিচার করা হবে।[১০৯] সে বিচারে প্রতিটি মানুষ কর্মফল অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। ভালো কাজ হলে পুরস্কার, আর মন্দ কাজ হলে শাস্তি।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ -

"আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কোন যুলুম্ করা হবে না।"[১১০]

আল্লাহ সে বিচার দিনের মালিক, বাদশাহ, একচ্ছত্র অধিপতি। সেদিন আল্লাহর কোর্টে ওকালতি বা যুক্তিতর্ক পেশ করার কারো কোন শক্তি থাকবে না। আমলনামার লিখিত প্রমাণ দ্বারা বিচার হবে। সে বিচারের ক্ষেত্রে কারো সুপারিশ[১১১] বা প্রভাব খাটাবার কোন সুযোগ থাকবে না। আল্লাহর বিচারের রায়ে কারো অসন্তোষ প্রকাশ বা অমান্য করার, অথবা কোথাও আপিল করার

---

১০৭. ইয়াউমিদ্দীন-এর অন্তর্গত 'ইয়াউম' (يَوْمٌ) অর্থ 'দিন', আর 'দীন' (دِيْنٌ) অর্থ 'প্রতিফল' 'প্রতিদান', 'হিসাব' বা 'বিচার'। আল্লাহ বলেনঃ 'সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন" (আল-কুরআন ২৮ : ২৫)। একত্রে ইয়াউমুদ্দীন মানে বিচার দিন বা প্রতিদান দিবস। আর তা দিয়ে আখিরাতকে বুঝানো হয়েছে।

১০৮. 'মালিক' (مٰلِك) শব্দটির পাঠ দু'রকম আছে : আরবী উচ্চারণে 'মা-লিক' (مٰلِك)এবং 'মালিক' (مَلِك) শব্দটির অর্থ 'অধিপতি', স্বত্ত্বাধিকারী বা মালিক। আর 'মালিক' অর্থ বাদশাহ। শব্দটির দু'ধরনের পাঠই প্রচলিত আছে। সুতরাং অনুবাদে উভয় অর্থই দেয়া হলো। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

১০৯. আল কুরআন ১৮:৯৯; ৩৬:৫১; ৭৮:১৮।

১১০. আল-কুরআন ৪০:১৭

১১১. আল্লাহর অনুমতি পাওয়া গেলে আল্লাহর বিশেষ করুণা ও মার্জনার জন্য নবী (সা) ও কোন কোন নেককার সুপারিশ করতে পারবেন। কিন্তু তা গ্রহণ করা আল্লাহর এখতিয়ারধীন। অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না (আল-কুরআন ২:২৫৫)।

কোন সুযোগ থাকবে না। বিনা বাক্যে ও বিনা প্রতিবাদে আল্লাহর বিচার শিরোধার্য করে মেনে নিতে হবে। সে বিচারে যারা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য, তাদেরকে আল্লাহ দেবেন সীমাহীন আরামের জান্নাত। আর যারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি যাতনাদায়ক শাস্তি দেবেন।

দুনিয়ার এ কর্মজীবনের ফলাফল লাভ করার জন্য রয়েছে আখিরাতের জীবন। এ আখিরাতে বিশ্বাস হলো ইসলামী জীবন-দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। আলোচ্য আয়াত 'মালিকি ইয়াউমিদ্দীন' এ বিশ্বাসেরই ঘোষণা বহন করে। এ ছোট্ট আয়াতটি থেকে উৎসারিত কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো কিছু বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাসের মর্ম হলো এই যে, এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, দুনিয়ার কর্মফল ভোগ করার জন্য পরকালে অনন্তকালের জীবন রয়েছে। এ সৃষ্টিজগত, এতো আয়োজন অনর্থক নয়, বাতিল নয়।[১১২] এগুলোর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত, আনুষ্ঠানিক ইবাদত সমূহের সাথে সাথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলা। আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।"[১১৩]

এ ইবাদতের পন্থা কুরআনে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে পথ অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। যারা জীবনের এ উদ্দেশ্য পালন করবে তারা সার্থক, আর যারা এথেকে বিচ্যুত হবে তারা ব্যর্থ। এ সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিরূপণ, আর সার্থকতার পুরস্কার এবং ব্যর্থতার শাস্তি প্রদানের জন্য রয়েছে আখিরাত। ঈমানের শর্ত হলো এই আখিরাতে বিশ্বাস। আল্লাহ বলেন, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ তারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।[১১৪] যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা পথভ্রষ্ট ও শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيْدِ-

"বস্তুতঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি (পাওয়ার কর্মে লিপ্ত)

---

১১২. আল-কুরআন ৩ : ১৯১; ৩৮ : ২৭।
১১৩. আল-কুরআন ৫১: ৫৬
১১৪. আল-কুরআন ২ : ৪।

এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।"[১১৫]

এভাবে "মালিকি ইয়াউমিদ্দীন" দ্বারা আখিরাতে ঈমানের দৃঢ় বিশ্বাস ঘোষিত হয়েছে, যেদিন ছোট বড় সকল কর্মের বিচার হবে আমলনামা অনুযায়ী। সে আমলনামায় ছোট বড় সকল কর্মের রেকর্ড লেখা থাকবে। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

"কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলেও তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলেও তা দেখতে পাবে।"[১১৬]

অর্থাৎ ভালো-মন্দ সকল কর্ম, তা সে যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন, কিয়ামতের দিন মানুষ তা নিজের আমলনামায় লিখিত দেখতে পাবে এবং প্রতিটি কাজের প্রামাণ্যচিত্র তাকে দেখানো হবে। এ তো হলো কৃতকর্মের কথা। কেউ যদি কোন কাজের কল্পনা করে, তারও হিসাব নেয়া হবে।

وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

"তোমাদের মনে যা আছে, তা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে খুশী তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন।"[১১৭]

প্রত্যেককেই তার হিসাব দিতে হবে এবং কর্মফল অনুযায়ী বিচারের রায় মেনে নিতে হবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, কিয়ামতের দিন থেকে আখিরাতের যে জীবন শুরু হবে, তার কোন শেষ নেই। তা হবে অনন্ত কালের। জান্নাতও অনন্তকালের, দোযখও অনন্তকালের।

(১) إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ- أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

(২) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

(১) "যারা বলে আমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ, অতঃপর (আল্লাহ

---

১১৫. আল-কুরআন ৩৪ : ৮।
১১৬. আল-কুরআন ৯৯ : ৭-৮।
১১৭. আল-কুরআন ২ : ২৮৪।

প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থায়) অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাত এর অধিকারী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, তাদের কর্মের ফল স্বরূপ[১১৮]।"

(২) "আর যারা (আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে) প্রত্যখ্যান করে, এবং আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনসমূহ) অস্বীকার করে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। কতইনা মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল।"[১১৯]

সারকথা, দুনিয়ার এ জীবনই শেষ নয়, বরং আখিরাতও আছে। সে জীবন হবে অনন্তকালের। সবাইকে কিয়ামতের দিন ছোট-বড় সকল কর্ম এবং চিন্তা-চেতনারও হিসাব দিতে হবে, এবং কর্মফল ভোগ করতে হবে। এ বিশ্বাসের দাবি হলো এই যে, চিন্তা ও কর্মে মানুষ যেনো সর্বদা সুপথের উপর অটল থাকে এবং আর কোন খারাপ কাজ না করে, এমনকি খারাপ চিন্তাও না করে।

আল্লাহ করুণাময় হলে আখিরাতে বিচার ও শাস্তি কেন?

ইতোপূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল, আল্লাহ করুণাময় হলে দুনিয়াতে এতো কষ্ট কেনো? আখিরাতের প্রেক্ষিতে এখানে তেমনি প্রশ্ন করা যায়। আল্লাহ করুণাময় হলে আখিরাতে বিচার ও শাস্তি কেন? আল্লাহ তো দয়া ও করুণা করে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারেন এবং বেহেশতে শান্তির জীবন দান করতে পারেন।

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, এ সৃষ্টিজগত আল্লাহর এক মহান উদ্দেশ্য এবং মহাপরিকল্পনার রূপায়ণ। আর তা হলো আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে নিজে শিরোধার্য করে সেভাবে জীবন পরিচালনা করা, সেদিকে মানুষকে ডাকা এবং সর্ব পর্যায়ে তা প্রতিষ্ঠিত করা। এটাই মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আর তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে মানুষ তার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে দেবে, এটাই কাম্য।[১২০] বলাবাহুল্য, সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অগণিত মানুষ অক্ষরে অক্ষরে এ কর্তব্য পালন করেছে সর্বস্ব দিয়ে, এমনকি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে। তাঁরা হলেন 'সালেহ' (নেক্কার) ও 'শহিদ'। অপরদিকে অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে না। বরং অনেকে আল্লাহকেই অস্বীকার করে, আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

---

১১৮. আল-কুরআন : ৪৬ : ১৩-১৪।
১১৯. আল-কুরআন : ৬৪ : ১০।
১২০. আল-কুরআন : ৬১ : ১১।

কুরআনে প্রথমোক্ত দলকে 'হিযবুল্লাহ্' এবং দ্বিতীয় দলকে 'হিযবুশ্ শয়তান' বলা হয়েছে।[১২১]

এবার এ দু'দলের ব্যাপারে আখিরাতের কথা চিন্তা করা যায়। যারা আল্লাহর কথা শুনতে ও মানতে গিয়ে প্রাণ দিলো, আর আল্লাহর দীনের যে দুশমনরা তাদেরকে হত্যা করলো, তাদের সবাইকে যদি একই জান্নাতে স্থান দেয়া হয়, তা হলে এর চেয়ে অবিচার ও নির্মম ব্যবহার কি হতে পারে? 'সালেহ' ও 'শহিদগণের' প্রতি তা হবে চরম নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা এবং নির্দয় ও অন্যায় আচরণ। যদি সুবিচার করতে হয়, তা হলে 'সালেহ' ও 'শহিদ'গণকে উত্তম পুরস্কার দেয়া উচিত, আর সত্যবিরোধীদের শাস্তি হওয়া উচিত। সুতরাং আখিরাতে দোষীকে শাস্তি দেয়াই ইনসাফ, ন্যায়বিচার, করুণা ও দয়ার দাবি।

অপরাধী যালিমদের শাস্তি না দেয়া হবে ন্যায়ের পরিপন্থি। অপরাধীকে শাস্তি না দেয়ার কয়েকটি কারণ চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথম, অপরাধকে আল্লাহ গ্রহণ বা স্বীকার করে নিয়েছেন, অথবা অপরাধে আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন। দ্বিতীয়, অপরাধে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন, তবে অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তৃতীয়, আল্লাহ অপরাধে সন্তুষ্ট নন এবং বিচারের ক্ষমতাও আছে, তবে সব অপরাধের খবর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, যে আল্লাহতে আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর যে গুণাবলী, তাতে এমনসব কারণের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। সত্য পথে চলার জন্য মানুষকে নির্দেশ দেয়ার পর এবং সকল প্রকার অপরাধকে নিষিদ্ধ করার পর আল্লাহর পক্ষে খারাপ কাজে সন্তুষ্ট হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (قدير) হওয়ার পর অপরাধের বিচার করতে কীভাবে আল্লাহ অপারগ হবেন? যে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাঁর পক্ষে সব অপরাধের খবর রাখা মোটেই কঠিন নয়।

সুতরাং মানুষের কর্মজীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব ও বিচার হওয়া এবং আল্লাহর বিচারের রায় অনুযায়ী আখিরাতের জীবনে কর্মফল ভোগ করাই ইনসাফের দাবি। সত্যপন্থিদেরকে এবং অপরাধীদেরকে একইভাবে দেখা এবং তাদের সাথে একই আচরণ করে একই কর্মফল দেয়া হবে নির্দয়, নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ।

এ হিসেবে আল্লাহ যেমন পরম করুণাময় ও অতি দয়াময়, তেমনি শাস্তি দানকারী। নিঃসন্দেহে এ শাস্তিদানকারী' হওয়াটা করুণা ও দয়ার পরিপন্থি

---

১২১. আল-কুরআন-৫৮:১৯।

নয়, বরং তা করুণা ও দয়ারই দাবি। আর এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কোমলতা, সুসংবাদ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সাথে কঠোরতা ও শাস্তির কথাও রয়েছে (اَلتَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ)। সুতরাং সূরা ফাতিহায় পরম করুণাময়, ও অতি দয়ালু' (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) ঘোষণার পরই রয়েছে কিয়ামতে বিচারের কথা, যার পরিণতিতে রয়েছে পুরস্কার ও শাস্তি[১২২]।

বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি

আল্লাহ বিচার দিন ও প্রতিদান দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। সে বিচারিক কর্মকাণ্ডে কোন যুক্তিতর্ক, প্রভাব প্রতিপত্তি ও সুপারিশ চলবে না, আপিল চলবে না, উর্ধ্বতন কোন কর্তৃপক্ষ থাকবে না। তাঁর বিচারে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করা, অমান্য করা বা রায় প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ বা ক্ষমতা কারো থাকবে না। আল্লাহ বিচার দিনের একচ্ছত্র মালিক। এই একচ্ছত্র বিচারকের বিচার এবং দুনিয়ার বিচারের মধ্যে অনেক পার্থক্য, যার কয়েকটি এখানে দেয়া হলো:

প্রথম, কিয়ামতের দিন আল্লাহ হবেন একক বিচারক। তাঁর কোন সাহায্যকারী, সহযোগী বা পরামর্শদাতা থাকবে না। সৃষ্টিজগতের সবকিছু আল্লাহরই ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে হলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার বিভিন্ন ফেরেশতার উপর দেয়া আছে। যেমন, ফেরেশতা আযরাইলের উপর মৃত্যুবিষয়ক দায়িত্ব দেয়া আছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন বিচারের বিষয়ে আল্লাহ কারো উপর কোন দায়িত্ব দেবেন না। পুরোটাই তাঁর নিজের হাতে থাকবে।

দ্বিতীয়, আল্লাহ যে বিচার করবেন, তাতে কোন যুক্তিতর্কের অবকাশ থাকবে না। দুনিয়ার বিচারে বিবাদী বা তার নিযুক্ত আইনজীবী তার পক্ষে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সাফাই পেশ করার চেষ্টা করতে পারে। মিথ্যা সাক্ষ্য এবং আইনজীবির মারপ্যাঁচ ও চাতুর্যে সত্যকে ঘোলাটে করে বিচারের রায় প্রভাবান্বিত করা সম্ভব। কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবে ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা এবং মানুষের কর্মের সচিত্র প্রমাণ, যা হবে সে ব্যক্তির কর্মের ছায়াছবির মতো প্রামাণ্য চিত্র (documentary film) বা প্রামাণ্য সাক্ষী (documentary evidence) সেদিন আল্লাহ মানুষের নিকট তার কোন কাজের ব্যাখ্যা তলব করবেন না। কারো ব্যাখ্যা বা সাফাই পেশ করার কোন সুযোগও থাকবে না।

১২২.তবে সূরা ফাতিহায় ও অন্যত্র করুণার পরেই কঠোরতার কথা রয়েছে। কারণ, রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, "আমার রহমত ও করুণা আমার ক্রোধকে অতিক্রম করে গেছে" মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহীহুল বুখারী, কায়রো, দারুত্ তাক্ওয়া, ১ম সংস্করণ, হাদিস নং-৭৫৫৩, মুসলিম-হাদিস-২৭৫১

তৃতীয়, আল্লাহর বিচারের বেলায় কোন প্রভাব, ভয় বা প্রলোভনের অবকাশ নেই। কারণ আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁকে প্রভাবান্বিত করার বা ভয় দেখাবার কেউ কোথাও নেই। প্রলোভনের তো প্রশ্নই উঠে না, কারণ সকল সম্পদ, নিয়ামত ও সবকিছুর মালিক তো তিনিই। তবে কারো প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণার জন্য আল্লাহর কোন নেককার বান্দার বিনম্র সুপারিশ থাকতে পারে, কিন্তু এমন সুপারিশও আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে। আল্লাহ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ـ

"এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে?"[১২৩]

আর আল্লাহর অনুমতিতে সুপারিশ হলেও তা গ্রহণ করা বা না করাও আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকার।

চতুর্থ, আল্লাহর বিচারে কারো কোন অসন্তোষ প্রকাশ করা বা বিচারের রায় অমান্য করার মতো কোন ক্ষমতা থাকবে না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ যে রায় দেবেন, তা বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে। দুনিয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়, এবং কোন কোন সময় রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে আদালতের রায় মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। কোন কোন সময় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মিছিল হয়, শ্লোগান হয়। আখিরাতে আল্লাহ হবেন মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, এবং বিচারের একচ্ছত্র অধিকারী। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটিও করতে পারবে না।[১২৪] সুতরাং সবাইকেই বিচার মেনে নিতে হবে।

পঞ্চম, কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচার হবে চূড়ান্ত, অকাট্য ও বাধ্যতামূলক। সেখানে আপিলের কোন সুযোগ থাকবে না। দুনিয়ার বিচারে অনেক সময় আসামী আপিলের মাধ্যমে বেকসুর খালাস পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু আখিরাতে কোথাও কোন আপিল কোর্ট থাকবে না। আল্লাহর একক রায়ই কার্যকরী হবে, পুনর্বিবেচনা বা রিভিউ এর কোন সুযোগ নেই।

ষষ্ঠ, কিয়ামতের বিচারে আল্লাহর রায়ের উপর জীবন ভিক্ষা দেয়ার মতো কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নেই। দুনিয়ার বিচারে কেউ শাস্তি পেলে দেশের সাংবিধানিক প্রধান তার শাস্তি মওকুফ করে দিতে পারেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন শাস্তি মওকুফ করার মতো কোন শক্তি থাকবে না। মওকুফ করতে হলে আল্লাহই তা করতে পারেন, আর কেউ নয়।

---

১২৩. আল-কুরআন ২: ২৫৫।
১২৪. আল-কুরআন ৭৮ : ৩৭-৩৮।

সারকথা, আখিরাতের কোর্টে আল্লাহ হবেন একচ্ছত্র বিচারক। সেখানে যুক্তিতর্ক, প্রভাব, ভয়, লোভ, মিথ্যা সাক্ষ্য পেশ, সুপারিশ বা বিচারের রায়কে অমান্য করার কোন সুযোগ ও ক্ষমতা কারো থাকবে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলছেন :

(১) لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

(২) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ -

(১) "আজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব কার? কেবলমাত্র আল্লাহর, যিনি এক ও একক, মহাপরাক্রমশালী"।[১২৫]

(২) "সেদিন একে অপরের জন্য কিছু করার থাকবে না। আর সেদিন সকল কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।"[১২৬]

মোটকথা, আখিরাত আছে। কিয়ামতের দিনে বিচার হবে। সে বিচারের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন আল্লাহ। কোন কৌশলে বা শক্তিতেই বিচার এড়াবার, বা তা প্রভাবান্বিত করার বা প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই। সুতরাং সবাইকে এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যেনো সেদিনের বিচারের রায় তার পক্ষেই যায়।

অধিপতি কি শুধু আখিরাতে?

আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ হলেন বিচারদিনের একচ্ছত্র অধিপতি। অথচ আমরা জানি, আল্লাহ দুনিয়াতেও সবকিছুর একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি গোটা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক, মালিক ও অধিপতি।[১২৭] ছায়াপথ, সৌরজগত ও পৃথিবীতে তথা গোটা সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।[১২৮] তাঁরই রাজত্ব আদি ও অন্তে। এখন প্রশ্ন, আল্লাহ যদি দুনিয়াতেও সবকিছুর মালিক ও অধিপতি হন, তা হলে আলোচ্য আয়াতে তাঁকে বিচার দিনের মালিক বলার অর্থ কি? অথবা তার কারণ কি? এ প্রশ্নের জবাব হলো নিম্নরূপঃ

দুনিয়াসহ সমস্ত সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা প্রতিপালক ও অধিপতি হলেন আল্লাহ;

---

১২৫. আল-কুরআন ৪০: ১৬।

১২৬. আল-কুরআন ৮২: ১৯।

১২৭. আসলে এটাই হলো সূরা ফাতিহায় 'রাব্বুল আলামীন' এর মর্মকথা। এছাড়া এ মর্মে কুরআনে আরো বহু আয়াত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, ২ : ১০৭, ৩ : ২৬, ৩ : ১৮৯, ৫ : ১৭, ১৮, ৪০, ১২০, ৭ : ১৫৮, ৪২ : ২৪ : ৪২, ৪২ : ৪৯; ৪৫ : ২৭; ৪৮ : ১৪; ৫৭ : ২, ৫; ৮৫ : ৯।

১২৮. আল-কুরআন ২ : ২৮৪।

ক্ষমতাকে আল্লাহর প্রদর্শিত পথে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা বলেই মানুষ দেশ চালায়, শাসন করে এবং দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য আইন কানুন রচনা করতে পারে।

এতে কোন দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এরপরও আল্লাহ এ দুনিয়াতে মানুষকে শক্তি দিয়েছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সে শক্তি ও এ ক্ষমতার বলেই অনেকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের বিরোধী হয়েও দুনিয়াতে ক্ষমতার দাপট দেখায়। আল্লাহ তাদের দাপট বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবন পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। এভাবে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারাই আল্লাহর বৃহত্তর রাজত্বের আওতায় ক্ষুদ্র পরিসরে মানুষের রূপক রাজত্ব চলে। এজন্যই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানুষের জন্যও 'মুল্‌ক' (রাজত্ব) ও 'মালিক' (রাজা/অধিপতি) পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এমন কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

(১) وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْ الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ -

(২) وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَه مِمَّا يَشَاءُ -

(৩) وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا -

(৪) تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ -

(৫) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ -

(১) "আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা তাই অনুসরণ করতো... ।"[১২৯]

(২) "আর আল্লাহ তাকে (দাউদকে) রাজত্ব (মুল্‌ক) ও হিকমত দান করেন, এবং তিনি যা ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দেন।"[১৩০]

(৩) "আর তাদের পেছনে ছিল এক রাজা (মালিক) যে বল প্রয়োগে সব (ভালো) নৌকা ছিনিয়ে নিতো।"[১৩১]

(৪) "তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব (মুল্‌ক) দাও, আর যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও।"[১৩২]

(৫) "তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি নিজ সৃষ্টির মধ্যে তাদের জন্য পশু

---

১২৯. আল-কুরআন ২ : ১০২।
১৩০. আল-কুরআন ২ : ২৫১।
১৩১. আল-কুরআন ১৮ : ৭৯।
১৩২. আল-কুরআন ৩ : ২৬।

তৈরি করেছি? অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়েছে।"[১৩৩]

উপরের প্রথম দু'টি আয়াতে হযরত সুলাইমান (আ) ও হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তৃতীয় আয়াতে অশুভ দাপটওয়ালা এক শক্তিধর রাজার কথা বলা হয়েছে, যে তার রাজত্ব ও রাজক্ষমতার দাপটে মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নিতো। চতুর্থ আয়াতে তো আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন, আর যার থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নেন। পঞ্চম আয়াতে মানুষের মালিকানা ও অধিকারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বলাবহুল্য, এ মালিকানা, রাজত্ব বা রাজক্ষমতা কোন একচ্ছত্র (absolute) অর্থে নয়, বরং আপেক্ষিক (relative) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একচ্ছত্র মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র রাজত্বের অধিপতি তো স্বয়ং আল্লাহ, তবে আপেক্ষিক অর্থে মানুষকে দুনিয়াতে প্রযোজ্য কিছু ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি দেয়া হয়েছে। মানুষকে সে আংশিক ও সামান্য ক্ষমতা দেয়ার পর তাকে ব্যবহার করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তবে কি কাজে এবং কীভাবে সে শক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত, আর কোথায় সে শক্তিকে ব্যবহার করা উচিত নয়, তাও বলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং মানুষ স্বাধীনভাবে যেভাবে ও যে কাজে সেই প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করে, তার ফলাফল সে পাবে। ভালো ও অনুমোদিত কাজে তা ব্যবহার করলে পুরস্কার পাবে। আর মন্দ ও অননুমোদিত কাজে ব্যবহার করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সূরা ফাতিহার 'মালিকি ইয়াউমিদ্দীন' বলে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রেক্ষিত ও মাত্রায় আল্লাহর আধিপত্য বুঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে তো মানুষকে সীমিত শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে তা প্রয়োগের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন কোন মানুষের বিন্দুমাত্র শক্তি, ক্ষমতা, ও স্বাধীনতাও থাকবে না। কারো মুখ খোলার কোন শক্তি ও সাহস থাকবে না। বরং সে পরিবেশে বিচার ও পরিণামের ভয়ে সবাই পাগলের মতো বিচলিত হয়ে যাবে। স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকাবে না, স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকাবে না; পিতা-মাতা সন্তানের দিকে বা সন্তান পিতা-মাতার দিকে তাকাবে না; তখন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না; বরং প্রত্যেকেই নিজ চিন্তায় পাগলের মতো বিচলিত, ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত থাকবে।[১৩৪] এ মর্মে বহু বর্ণনা কুরআনে এসেছে। তার দু'টি উদাহরণ এখানে দেয়া হলো।

(১) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

---

১৩৩. আল-কুরআন ৩৬ : ৭১।

১৩৪. আল-কুরআন ৮০ : ৩৪-৩৭।

(২) يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ـ

(১) "যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না"।[১৩৫]

(২) "সেদিন রূহ (জিবরাঈল (আ) ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; করুণাময় (আল্লাহ) যাকে অনুমতি দেবেন, সে ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলবে না এবং সে যা বলবে যথার্থ বলবে।"[১৩৬]

অর্থাৎ দুনিয়াতে যে যতো ক্ষমতাবান, শক্তিশালী ও দাপটওয়ালাই হোক, কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো টু শব্দটি করার অবস্থা থাকবে না। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাগলের মতো হয়ে যাবে। এমন কি ফেরেশতারা বাক্যহীন হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছুই বলতে বা করতে পারবে না। একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বিচারকের আসনে আসীন থাকবেন। তিনি যে রায় দেবেন, বিনা দ্বিধায় বিনা বাক্যে নতশিরে সবাই তা মেনে নেবে। এ হিসেবেই বলা হয়েছে, আল্লাহ হলেন বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। সেদিনের একচ্ছত্র অধিপতি হবেন আল্লাহ।

মালিকঃ একটি শাব্দিক আলোচনা

'মালিকি ইয়াউমিদ্দীন' এর 'মালিক' শব্দটির দু'টি কিরাত (উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতি) বর্ণিত আছে। একটি হলো 'মা-লিক' (مٰلِك), যার মীম অক্ষরের পরে একটি আলিফ আছে। দ্বিতীয় হলো 'মালিক'(مَلِك) , যার মীম অক্ষরের পর আলিফ নেই। দুটি কিরাতই বিশুদ্ধ ও সহীহ। সুতরাং দু'টি কিরাতই পড়া যেতে পারে। বাস্তবেও দু'ধরনের কিরাতই চালু আছে। এ দু'টি কিরাত প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে দেয়া হলো :

'মা-লিক' (مٰلِك)

"মা-লিক" শব্দটির ধাতু হলো মিল্‌ক্ (مِلْك)। 'মা-লিক' অর্থ হলো মালিকানা স্বত্বের অধিকারী। এ কিরাত অনুযায়ী 'মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন' অর্থ 'বিচার বা প্রতিদান দিবসের মালিক বা অধিপতি'। অর্থাৎ আল্লাহ হলেন বিচার দিনের মালিক।

তাফসিরকারকদের অনেকেই এ কিরাতটি গ্রহণ করেছেন। তাদের অন্তর্ভুক্ত

---

১৩৫. আল-কুরআন ১১ : ১০৫।
১৩৬. আল-কুরআন ৭৮ : ৩৮।

হলেন আসেম, কাসাই, ইয়াকুব, খালফ প্রমুখ। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর দুই সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) 'মা-লিক' (مٰلِك) কিরাত পাঠ করেছেন।[১৩৭] তাঁদের অনুসরণে পৃথিবীর এক বিরাট জনগোষ্ঠী শব্দটিকে এভাবেই পড়েন।

দু'টি কিরাতই শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কেন (مٰلِك) (মা-লিক) কিরাতটি গ্রহণ করেছেন, তার পক্ষে দু'ধরনের যুক্তি আছে। প্রথম, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হাদিস এ কিরাতকে সমর্থন করে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এর পক্ষে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিও রয়েছে। মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (রহ) এ অভিমতের সমর্থনে দশটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি বর্ণনা করেছেন।[১৩৮] কারণ, 'মালিক' (রাজা বা বাদশাহ) থেকে 'মা-লিক' (মালিকানা স্বত্বের অধিকারী) অধিক অর্থবহ ও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অধিক অর্থবহ হওয়ার কারণগুলো হলো এই :

(১) রাজত্বের সম্পর্ক মানুষের সাথে, আর মালিক (owner)-এর মধ্যে মানব ও অমানব সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(২) মালিক তার মালিকানার জিনিস বিক্রয় করতে পারে, রাজা তার প্রজাকে বিক্রয় করতে পারে না।

(৩) প্রজা তার রাজার রাজত্ব থেকে ভেগে যেতে পারে, কিন্তু মালিকানার জিনিস মালিকের মালিকানার বাইরে যেতে পারে না।

(৪) মালিকের সেবা করা দাসের কর্তব্য, কিন্তু রাজার সেবা করা প্রজার কর্তব্য নয়।

(৫) দাস তার মালিকের অনুমতি ছাড়া কিছুই করতে পারে না, অথচ প্রজা তার বাদশাহর অনুমতি ছাড়াই কাজ করতে পারে।

(৬) দাস তার মালিকের নিকট দয়া ও করুণা আশা করে; অপরদিকে রাজার নিকট প্রজা ন্যায়বিচার আশা করে।

(৭) বাদশাহীর মধ্যে ভীতি বেশি, আর মালিকানার সম্পর্কে কোমলতা অধিক।

(৮) বাদশাহ দুর্বল সৈনিককে বরখাস্ত করে, আর মালিক তার মালিকাধীন

---

১৩৭. হাদিসটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, আবু ইসা মুহাম্মদ আত তিরমিযী, সুনানুত-তিরমিযীতে, কায়রো, ১ম সংস্কারণ, দারুল হাদিস, ১৯৯৯ ইং, হাদিস নং ২৯২৮।

১৩৮. দেখুন, হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী, মা'আরিফুল কুরআন, দিল্লি, ফরিদ বুক ডিপো, ১ম সংস্করণ ২০১২, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৯।

দুর্বলের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয়।

(৯) মালিকানালব্ধ জিনিসের প্রতি মালিকের সম্পর্ক গভীরতর হয়, অন্যদিকে প্রজার প্রতি বাদশাহর সম্পর্ক ততো গভীর হয় না।

(১০) 'মালিক' (مٰلِك)-এর তুলনায় 'মা-লিক' (مٰلِك) শব্দে একটি অক্ষর বেশি আছে। সুতরাং 'মা-লিক' (مٰلِك) পড়লে দশটি সওয়াব বেশি হয়।

সারকথা, রাজা, বাদশাহ (ও রাজত্ব) থেকে মালিকানার ধারণাটি বিভিন্ন দিক দিয়ে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য অনেক তাফসির বিশেষজ্ঞ ও কিরাত বিশেষজ্ঞ 'মালিক' (مٰلِك)-এর পরিবর্তে 'মা-লিক' (مٰلِك) পাঠের পক্ষপাতি।

তবে কিরাত ও তাফসির বিশেষজ্ঞগণের আরেকটি দল 'মা-লিক' (مٰلِك)-এর পরিবর্তে 'মালিক' (مٰلِك) শব্দটিকে অগ্রাধিকার দেন। তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।[১৩৯] যাঁরা 'মালিক' (مٰلِك) শব্দটিকে অগ্রধিকার দেন, তাঁদের পক্ষে পাঁচটি যুক্তি বর্ণনা করা হয়। তা হলো :

(১) বাদশাহী ও রাজত্বের মধ্যে যেরূপ মহত্ত্ব রয়েছে, মালিকানায় তেমন কিছু নেই। সবাই তো মালিক হতে পারে, কিন্তু সবাই তো বাদশাহ হতে পারে না।

(২) মালিক (স্বত্বাধিকারী)-এর হুকুম ও কর্তৃত্ব শুধু মালিকানাধীন জিনিসের উপর বর্তায়, অথচ রাজার হুকুম ও কর্তৃত্ব মালিকানাধীন ও মালিকানাহীন সবার উপর চলে।

(৩) সকলের উপর বাদশাহর আনুগত্য জরুরি, অপরদিকে মালিকের আনুগত্য শুধু দাসের উপর বর্তায়, অন্যের উপর নয়।

(৪) 'রাব্বিল আলামীন' এর মধ্যে মালিকানা (مِلْك)-এর ধারণা সুপ্ত আছে, যার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বাদশাহ অর্থে (مَلِكٌ) বলাই উত্তম।

(৫) কুরআনের শেষ সূরা "সূরা নাস"-এ (مَلِكِ النَّاسِ) আছে। সুতরাং

---

১৩৯. হাদিসটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। হাদিস নং ২৯২৭ দেখুন মুহাম্মদ আততাহের ইব্নে আশুর লিখিত তাফসির, তাফসিরে ইব্নে আশুর, ১ম খণ্ড : ১৭৩

কুরআনের প্রথম ও শেষের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য (مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) অর্থাৎ বাদশাহ অর্থে মালিক উচ্চারণই উত্তম।

প্রকৃতপক্ষে 'মা-লিক' (مٰلِك)ও মালিক (مَلِك) শব্দ দুইটির মধ্যে যে শব্দটিকেই গ্রহণ করা হোক, তাতে মৌলিক কোন পার্থক্য হয় না। উভয় শব্দের মর্মকথা হলো এই যে, আল্লাহ হলেন কিয়ামত বা বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি; সেদিনটিকে আল্লাহর মালিকানাধীনই বলা হোক, বা আল্লাহকে সেদিনের বাদশাহই বলা হোক, তাতে অর্থ বা মর্মের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য হয় না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উভয় প্রকার কেরাত (مَالِك বা مَلِك) শুদ্ধ হলেও এ উপমহাদেশে مَالِك শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। তবে লেখার ক্ষেত্রে (مَلِك) এর পরিবর্তে মীম এর উপর খাড়া যবর দিয়ে (مٰلِك) লেখা হয়, যার উচ্চারণ (مَلِك) এরই মতো।

অষ্টম অধ্যায়

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি

পুরো আয়াতটি হলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি)। পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর পর্যায় থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত লালন, পালন ও প্রতিপালন করেন। তা হলো আল্লাহর করণীয়। এবার শুরু হচ্ছে মানুষের করণীয় ও কর্তব্য। মানুষের কাজ হলো আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আনুগত্য করা।

সুতরাং এখানে আল্লাহর নিকট এ অঙ্গীকার, প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দেয়ানো হচ্ছে যে, "ইয়্যাকা না'বুদু"। অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, তোমারই বন্দেগি করি। মনিব হিসেবে শুধু তোমারই নির্দেশ শিরোধার্য করে নেই। আমরা অন্য কারো উপাসনা করি না। কোন রাজা বাদশাহ কারো সামনে মাথা নত করি না। কোন মানব রচিত মতবাদ বা আইন আমাদের জীবনবিধান নয়। কোন অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্বের প্রতি, অথবা কোন কুসংস্কার বা সামাজিক নিয়ম-নীতির প্রতি আমাদের আনুগত্য বা বিশ্বাস নেই। আমরা তোমারই বান্দা ও দাস। বান্দা বা দাস যেমন কেবলমাত্র মনিব ও মালিকের সেবা ও দাসত্ব করে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মনিবের নির্দেশ অনুযায়ী চলে, আমরাও তেমনি শুধু তোমার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী সব কাজ করি।

আল্লাহর ইবাদত : অর্থ ও তাৎপর্য

শাব্দিক অর্থের প্রেক্ষিতে ইবাদত মানে চরম বিনয়ের সাথে আল্লাহর প্রতি পরম সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন। কারো প্রতি চরম সম্মান জ্ঞাপন করার জন্য পরম বিনয় অবলম্বন করা,[১৪০] অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সম্মান প্রকাশ করা। এ বিনয়ের অভিব্যক্তি হবে স্বেচ্ছায়, নিষ্ঠার সাথে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তা যদি অনিচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে, তা হলে তা কাঙ্ক্ষিত মানের ইবাদত নয়।

---

১৪০. দেখুন, মুহাম্মদ ইবনে উমার ফখরুদ্দীন রাযি, আত্ তাফসীরুল কাবীর, মুলতান (পাকিস্তান), দারুল হাদিস, তা বি, ১ম খণ্ড পৃ: ২০৮
হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী, মা'আরিফুল কুরআন ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ ১৯।

আর যদি সে বিনয় আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য না হয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে হয়, বরং কোন পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়, তা ইবাদত হবে না।

স্বভাবতই ইবাদতের যোগ্য হবেন এমন এক সত্তা যিনি পরম সম্মানের অধিকারী, যাঁর উপরে আর কেউ নেই। নিঃসন্দেহে এমন সম্মানের একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহই হলেন মানুষের নিকট থেকে চরম বিনয়াবনত পরম সম্মানের অধিকারী, ইবাদতের অধিকারী। এ সম্মান তথা ইবাদত যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিবেদন করা হয়, অথবা বিনয়াবনত এ সম্মানে যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা হয়, তা হবে নিরেট 'যুলুম'। 'যুলুম' হলো কোন জিনিসকে অপাত্রে রাখা। এজন্যই কুরআনে শির্ক (কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা অথবা আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা)-কে বড় মাত্রার যুলুম বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৪১]

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি ও জীবনের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত। আল্লাহ অনাদিকাল থেকে আছেন, অনন্তকাল থাকবেন। তাঁর রাজত্বে ফেরেশতাসহ এমন সৃষ্টি আছে যারা বাধ্যতামূলকভাবেই সদা-সর্বদা আল্লাহর মহিমা ও আনুগত্যে মশগুল আছে। কিন্তু তাঁর রাজত্বের পুরোপুরি বিকাশ লাভের জন্য এমন সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল যারা স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছায় আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নিবে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মসমর্পণ করে আনুগত্য করে যাবে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর দাস হিসেবে ঘোষণা দিবে এবং দাস হিসেবে প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করবে। এরূপ সৃষ্টি হলো মানুষ ও জিন। ইবাদত তথা আল্লাহর দাসত্বের জন্যই তাদের সৃষ্টি। সে ইবাদতই গোটা সৃষ্টি ও জীবনের উদ্দেশ্য। অন্যান্য সৃষ্টি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, আর মানুষ ও জিন ইবাদত করবে স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছায়, সচেতন মনে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।"[১৪২]

সুতরাং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত। আল্লাহই হলেন স্রষ্টা ও প্রতিপালক। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক হলো ইবাদতের, দাসত্বের। আল্লাহ হলেন প্রভু ও মালিক, আর মানুষ হলো দাস। দাসের কাজ হলো মনিবের কথা অনুযায়ী কাজ করা এবং কোনভাবেই তাঁর নির্দেশের বাইরে

---

১৪১. আল-কুরআন ৩১ : ১৩।
১৪২. আল-কুরআন ৫১ : ৫৬।

কিছু না করা। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর দেয়া আদর্শ ও জীবন-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

আসলে এ দাসত্বের ধারণার মধ্যেই ইবাদতের মর্ম ফুটে উঠে। আজ পৃথিবীতে দাস প্রথা না থাকলেও ইতিহাস থেকে এবং দাসত্বের সংজ্ঞা ও ধারণা থেকে এর মর্ম উপলব্ধি করে নিতে কষ্ট হয় না। মনিব হলো দাসের দেহমন ও গোটা অস্তিত্বের মালিক। দাসের কাজ হলো সর্বদা সতর্কভাবে মনিবের সেবা করা। তার কথা শুনা, পুরোপুরি আনুগত্য করা। আর কোনক্রমেই কখনো কোনভাবে তার অবমাননা না করা। তার কোন আদেশ বা নির্দেশ অমান্য না করা। এ আনুগত্য সকল ক্ষেত্রে, সকল পর্যায়ে এবং সকল মাত্রায়। কোন দাস একথা বলতে পারবে না যে, আমার ব্যক্তিগত চলাফেরা সম্পর্কে মনিব যে নির্দেশ দেবেন, তাই আমি মান্য করবো, আর সামষ্টিক তথা পরিবারসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব বিধি-নিষেধ বা কাজের নির্দেশ আছে, তা মান্য করবো না।

আল্লাহর সাথে মানুষের দাসত্বের সম্পর্ক ঠিক একই ধরনের। শুধু ব্যক্তিজীবনের নিছক কয়েকটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও পর্যায়ে পূর্ণমাত্রায় আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁর বিধি-নিষেধ মাথা পেতে নিতে হবে এবং বাস্তবায়িত করতে হবে। ব্যক্তি, পারিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী আদর্শ মেনে চলতে হবে। তা না হলে দাসত্ব, বন্দেগি বা ইবাদত হবে না। কারণ ইবাদত বা দাসত্ব মানে হলো আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি আত্মসমর্পণ।

সমাজে কখনো কখনো একটা ভুল ধারণা লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ মনে করে, নামায-রোযা ও বিয়ে-শাদীসহ কয়েকটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ে ইসলামের নিয়ম-নীতি মেনে চললেই পুরো মুমিন-মুসলমান হওয়া যায়। আসলে এরূপ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কেউ যদি আল্লাহর দীনের উপর আংশিক ঈমান আনে, ইসলামের ব্যক্তি পর্যায়ের নির্দেশগুলো মেনে নেয়, আর জীবনের অন্যান্য পর্যায় ও ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলামের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে, তার ঈমান হয় আংশিক। এমন লোকদের উদ্দেশ্য করে কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ.

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। আর (ঈমান আনো) সে কিতাবের উপর যা তাঁর রাসূলের উপর এবং

তাঁর পূর্বে নাযিল করা হয়েছে।"[১৪৩]

অর্থাৎ তোমরা আসলে ঈমান আননি, অথবা তোমাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়। কাজেই ঈমান আনো বা ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করো । কেননা, আংশিক কুরআনে বিশ্বাস মানে আংশিক ইসলাম গ্রহণ করা; কাজেই এমন মানুষের ইসলাম পূর্ণ নয়। কিন্তু এরপরও যারা আংশিক ঈমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায়, তাদেরকে ধমকের সুরেই আল্লাহ বলেছেন :

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ -

"তোমরা কি কিতাব (কুরআন)-এর কিছু অংশের উপর ঈমান আনতে চাও, আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করতে চাও ?"[১৪৪]

কয়েকটি আনুষ্ঠানিক উপাসনা ও বিয়ে-শাদির মতো কয়েকটি ক্ষুদ্র পরিসরের কর্মকাণ্ডে ইসলামকে সীমাবদ্ধ রাখলে প্রকৃত পক্ষে কুরআনের বিশাল অংশকেই অস্বীকার করা হয়। কারণ, নামায-রোযাসহ এসব কর্মকাণ্ডের বিষয় কুরআনের অতি নগণ্য অংশেই বর্ণিত হয়েছে। এ অর্থেই বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً -

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ইসলামের ভিতর পুরোপুরি প্রবেশ করো।"[১৪৫]

কারণ, ইসলামে আংশিক আনুগত্যের কোন সুযোগ নেই। মুমিন হতে হলে পূর্ণ মুমিন হতে হবে, আর মুসলমান হতে হলে পূর্ণ মুসলমান হতে হবে। তখনই আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব হবে, ইবাদত হবে।

একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদত

আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা, এখানেই কথাটি শেষ নয়। ইবাদত করতে হবে। আল্লাহর এবং একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারো নয়। অন্য কাউকে এ ইবাদতে শরিক করা যাবে না। ইবাদত একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়টি আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী এবং অন্যান্য বুদ্ধিবিত্তিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথম : আলোচ্য ব্যাকাংশে إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর বাচনভঙ্গি প্রমাণ করে যে, ইবাদত একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ক্রিয়া

---

১৪৩. আল-কুরআন ৪ : ১৩৬।
১৪৪. আল-কুরআন ২ : ৮৫।
১৪৫. আল-কুরআন ২ : ২০৮।

(فعل) পূর্বে এবং কর্ম (مفعول) পরে আসে। এ হিসেবে কথাটার রূপ نَعْبُدُكَ (আমরা তোমার ইবাদত করি) হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু এর স্থলে কর্মপদটিকে গুরুত্ববোধক إِيَّاكَ রূপ দিয়ে তাকে ক্রিয়াপদ نَعْبُدُ এর পূর্বে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ করলে এরূপ দাঁড়ায়, একমাত্র তোমারই আমরা ইবাদত করি। এ ব্যাক্যাংশটির এই বিশেষ রূপ দিয়ে ইবাদতকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়: 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি' কথাটির যৌক্তিকতা এ আয়াতের পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহই হলেন স্রষ্টা, প্রতিপালক, করুণাময় এবং শেষ বিচারের মালিক। অর্থাৎ মানুষের অতীত (সৃষ্টি), বর্তমান (প্রতিপালন) ভবিষ্যৎ (বিচার দিনের মালিক বা আখিরাত) এর একমাত্র নিয়ন্তা হলেন আল্লাহ এবং এ সকল পর্যায়ে পরম করুণা ও অতি দয়ার সাগর হলেন তিনি। সুতরাং ইবাদত তো তাঁরই প্রাপ্য, অন্য কারো নয়।

তৃতীয়: ইবাদত হলো চরম কৃতজ্ঞতা প্রর্দশন করা, যা এমন সত্তার জন্যই সাজে যিনি অসংখ্য ও সীমাহীন নিয়ামত দান করেছেন। এমন সত্তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। আল্লাহ বলেন :

(১) كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ -

(২) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا -

(৩) وَإِن تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ-

(৪) وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

(১) "তোমরা **কীভাবে** আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে (আল্লাহকে অস্বীকার করবে), অথচ তোমরা জীবনহীন ছিলে, তখন আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন।"[১৪৬]

(২) "তিনিই সে সত্তা (আল্লাহ) যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[১৪৭]

(৩) "তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তা হলে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই যালিম, অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[১৪৮]

---

১৪৬. আল-কুরআন ২ : ২৮।
১৪৭. আল-কুরআন ২:২৯
১৪৮. আল-কুরআন ১৪ : ৩৪।

(৪) "এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"[১৪৯]

অর্থাৎ আল্লাহ শুধু মানুষকে সৃষ্টিই করেননি, বরং পৃথিবী ও সৃষ্টি জগতের সবকিছুই মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, এবং মানুষকে অগণিত, অসংখ্য ও সীমাহীন নিয়ামত দ্বারা সিক্ত করেছেন। সুতরাং ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা একান্তভাবে তাঁরই প্রাপ্য, অন্য কারো না।

চতুর্থ, ইবাদত হলো চরম মাত্রার বিনয়ের প্রকাশ। মানুষের পক্ষে সে পরম মাত্রার বিনয় একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে পারে, কারণ একমাত্র আল্লাহই হলেন মহাসম্মানের অধিকারী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও পরাক্রমশালী। কাজেই আল্লাহ ছাড়া ইবাদত আর কারো প্রাপ্য নয়।

পঞ্চম, আল্লাহ হলেন 'অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব' (وَاجِبُ الْوُجُوْد), যিনি আদিতে ছিলেন, এখন আছেন এবং অন্তেও থাকবেন। সৃষ্টির সবকিছু শেষ হবে, কিন্তু তাঁর শেষ নেই। অন্যদিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুই 'সম্ভাব্য অস্তিত্ব' এর গুণসম্পন্ন। মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, এখন আছে, আবার সে মরে যাবে এবং আল্লাহরই ইচ্ছায় পুনরুত্থিত হবে। সুতরাং 'সম্ভাব্য অস্তিত্বের' মানুষের পক্ষে 'অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব' আল্লাহর ইবাদত করাই যথার্থ। কাজেই ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য, অন্য কারো নয়। এ আলোচনা থেকে তাওহীদ ও একত্ববাদের ধারণা বেরিয়ে আসে, যে সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে।

তাওহীদ ও একত্ববাদ

"ইয়্যাকা না'বুদু" এর অন্তর্নিহিত মর্ম হলো এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। প্রকৃতপক্ষে কালেমা তাইয়্যেবা বা কালেমা তওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর অর্থ ও মর্মকথাও তাই। অর্থাৎ আল্লাহর কোন শরিক নেই। অস্তিত্বের দিক দিয়ে অন্য কেউ আল্লাহর অংশীদার নেই, আর ইবাদত পাওয়ার দিক দিয়েও কেউ তাঁর সাথে শরিক হওয়ার যোগ্য নেই।

ইসলামে শির্কের কোন স্থান নেই। শির্ক প্রধানত দুই প্রকার : আকিদায় শির্ক (شِرْكٌ فِي الْعَقِيْدَةِ) এবং আমলের শির্ক (شِرْكٌ فِي الْعَمَلِ)। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন প্রকার আকিদার শরিক দেখা যায়। এর কয়েকটি উদাহারণ এখানে দেয়া হলো।

---

১৪৯. আল-কুরআন ৫ : ৬।

(১) মানুষের উপাসনা করা। যেমন, খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে: আল্লাহ (পিতা), ঈসা (আ) (পুত্র) ও মরিয়ম আল্লাহর স্ত্রী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا إِلٰهٌ وَاحِدٌ -

"তারা কুফরী করেছে (সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে), যারা বলে, আল্লাহ তো তিন (প্রভু)-এর মধ্যে একজন, অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।"[১৫০]

ইহুদিদের একটি দল উযাইর নামক এক ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তান বলে তার উপাসনা করতো।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ -

"ইহুদিরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র।"[১৫১]

(২) দেব-দেবীর পূজা করা। এ ধর্মবিশ্বাসে প্রভু ভগবানের সঙ্গে অগণিত দেবদেবীরও বিশ্বাস করা হয়। দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর পূজা করা হয়।

(৩) কোন সৃষ্ট জিনিসের পূজা বা উপাসনা করা। যেমন, কোন কোন সম্প্রদায় ভগবানের সাথে আগুনের পূজা করে, জীবজন্তুর উপাসনা করে, বৃক্ষের পূজা করে।

(৪) পাদ্রী পুরোহিত ও সন্ন্যাসীকে প্রভুর পর্যায়ে স্থাপন করা। যেমন, কেউ কেউ ধর্মযাজক বা ধর্মীয় গুরুদেরকে প্রভুর আসনে আসীন করার মাধ্যমে শির্ক করে। আল্লাহ বলেন :

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلٰهًا وَاحِدًا -

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত-পুরোহিত-পাদ্রী ও সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীদেরকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকেও। অথচ তারা এক মা'বুদের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল।"[১৫২]

(৫) ফেরেশতা বা অতি প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করা। যেমন, কেউ কেউ

---

১৫০. আল-কুরআন ৫ : ৭৩।
১৫১. আল-কুরআন ৯ : ৩০।
১৫২. আল-কুরআন ৯ : ৩১।

বিশ্বাস করে যে আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতা বা কোন অতি প্রাকৃতিক সত্তা পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।[১৫৩] সুতরাং তাদের সুনজর ও সহানুভূতি পাওয়ার জন্য তাদের উপাসনা করা হয়।

এগুলো হলো আকিদা বা বিশ্বাসের শির্ক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্বীকার করাই হলো আকিদার শির্ক। ইসলামে এ শিরকের কোন স্থান নেই। এ শির্ক জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ এসব শির্ক থেকে পবিত্র। আল্লাহ হয়তো মানুষের অন্যান্য অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু আকিদার শির্ককে কোনক্রমেই ক্ষমা করবেন না। কারণ, এটা হলো সাংঘাতিক যুলুম। আল্লাহ বলেন,

(১) "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; তারা যাকে (আল্লাহর) সাথে শরিক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।"[১৫৪]

(২) "আল্লাহ ব্যতীত তাদের কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? তারা যাকে (আল্লাহর) শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।"[১৫৫]

(৩) "নিঃসন্দেহে শির্ক হলো চরম যুলুম।"[১৫৬]

(৪) "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না; শির্ক ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক নির্ধারণ করে সে এক মহাপাপ করে।"[১৫৭]

সুতরাং ইসলামে কোন প্রকার আকিদার শিরকের স্থান নেই। বরং এক আল্লাহতেই বিশ্বাস করতে হবে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার শির্ক হলো আমলের শির্ক (شِرْكٌ فِي الْعَمَلِ) কোন কোন মানুষ এমন অছে যারা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে খাঁটি ও নির্ভেজাল ঈমানদার। সেখানে শির্ক নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমল ও কর্মে সে বিশ্বাস থেকে কখনো বিচ্যুতি ঘটে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মেনে নিয়ে ঈমান আনার পর সকল কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করা অবশ্য-কর্তব্য। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে,

---

১৫৩. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি, আত্ তাফসীরুল কাবীর, মুলতান (পাকিস্তান), দারুল হাদিস।
১৫৪. আল-কুরআন ৯ : ৩১।
১৫৫. আল-কুরআন ৫২ : ৪৩।
১৫৬. আল-কুরআন ৩১ : ১৩।
১৫৭. আল-কুরআন ৪ : ৪৮।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ -

"বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেনো তোমরা তিনি ব্যাতীত অন্য কারো ইবাদত না করো।"[১৫৮]

অর্থাৎ বিধান ও আইন দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারো নয়। উক্ত আয়াতের শেষাংশ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আল্লাহর আইন মেনে নেয়া এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদতের এ কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের ইবাদত নির্ভেজাল হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। কোন রাজা বাদশাহ বা সংস্থাকে যদি এমন আইন প্রণয়নের অবাধ, একচ্ছত্র ও সীমাহীন অধিকার দেয়া হয়, যা জনকল্যাণের পরিপুষ্থ অথবা কুরআন-হাদিস ও রাসূলের আদর্শের পরিপন্থি, তাতে আমলের শির্কের প্রশ্ন এসে যায়।

তবে এখানে বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা দরকার। কুরআন ও হাদিসে অনেক বৈষয়িক ও পার্থিব ব্যাপারে শুধু মূলনীতি দেয়া আছে। এসব মূলনীতির আওতায় থেকে কোন দেশ বা সমাজের জন্য নির্দিষ্ট কোন আইন বা বিধান করা শির্কের পর্যায়ে পড়বে না। বরং তা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করতে সহায়ক হবে। কিন্তু যখনই সে সংস্থাকে কুরআন ও হাদিসের পরিপন্থি আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়িত করার একচ্ছত্র অধিকার দেয়া হয়, তখনই তাকে আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শরিক করার প্রশ্ন আসে।

এমনিভাবে বিচার বিভাগকে যদি একচ্ছত্র ক্ষমতা দেয়া হয়, যাতে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং তা কার্যকরী করতে পারে, সেখানেও বিধানদাতা হিসেবে আমলের শির্কের এর প্রশ্ন আসে। যেমন পুরুষে পুরুষে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ, সমকামিতা নিষিদ্ধ এবং সেহেতু এখন যদি কোন আদালতের রায়ে সমকামিতাকে আইনসঙ্গত করে দেয়া হয়, তা হলে এটি হবে বিধানদাতা হিসেবে আদালতকে আল্লাহর সাথে শরিক করার সমতুল্য। একটু চিন্তা করলে বাস্তব জীবনের অনেক কর্মকাণ্ডেই ঈমান ও আমলের মধ্যে সাংঘর্ষিক আচরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। এগুলো আমলের শির্ককের অন্তর্ভুক্ত।

আমলের শির্কও জঘন্য অপরাধ। মুখে ঈমানের ঘোষণা দিয়ে কর্মে তার বিপরীত কোন আচরণ করা মুনাফিকী, ধোঁকাবাজীটাও শির্ক বা কমপক্ষে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী এজন্য শাস্তি পেতে হবে।

---

১৫৮. আল-কুরআন ১২: ৪০।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ বলে সূরা ফাতিহায় এ অঙ্গীকার করা হয় যে, একমাত্র আল্লাহরই ইবদাত করবো। তার সাথে কোন প্রকার শরিক করবো না। আকিদা বা বিশ্বাসেও কাউকে আল্লাহর সাথে শরিক করবো না। বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডেও আমলের শির্ক করবো না। কোন প্রকার শির্ক করলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর অন্তর্গত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হলো।

এর মর্ম হলো তাওহীদ ও একত্ববাদ। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। অন্য কোন মা'বুদ নেই। তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য নেই।

আল্লাহর ইবাদত থেকে কাম্য

আল্লাহর ইবাদত করা মানুষের কর্তব্য। সূরা ফাতিহায় এ কর্তব্য পালনের প্রত্যয়ই ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কেন ইবাদত? ইবাদতের উদ্দেশ্য কি? ইবাদত থেকে কাম্য কি?

ইবাদতের একাধিক ধরনের উদ্দেশ্য চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথম, আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করেন, সুতরাং ইবাদত তাঁরই প্রাপ্য। দ্বিতীয়, আল্লাহ অনেক নিয়ামত দিয়েছেন, সুতরাং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর ইবাদত করা দরকার। তৃতীয়, আল্লাহ ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, কাজেই ইবাদত করতে হবে। চতুর্থ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য ইবাদত করা প্রয়োজন। পঞ্চম, আল্লাহকে ভালোবেসে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই ইবাদত করা।

ইবাদতের এসব উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। এর ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। অনেকে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। কারো কারো মতে উপরে উল্লেখিত পঞ্চম উদ্দেশ্যটি অজর্নই ইবাদতের কাম্য। অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন এবং ফলস্বরূপ আল্লাহকেই পাওয়া। এ বিষয়টির আরেকটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আল্লাহর নিয়ামত, প্রতিপালন ও করুণার শুকরিয়া হিসেবেই ইবাদত নয়, কারণ এগুলোর প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের যথাযোগ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন অসম্ভব। এজন্যও ইবাদত নয় যে, আল্লাহ ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন বরং শুধু নির্দেশ পালনের চেয়ে ইবাদতে আরো বেশি স্বতঃস্ফূর্ততা থাকা প্রয়োজন। আবার ইবাদত দোযখের ভয়েও নয়, জান্নাত পাওয়ার জন্যও নয়। ভয়ে বা লোভে আল্লাহর ইবাদত করাও স্বার্থপরতার লক্ষণ। বরং ইবাদত করা প্রয়োজন আল্লাহকে ভালোবেসে। আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই আল্লাহর ইবাদত, অন্য কিছুর জন্য

নয়। আল্লাহকে ভালোবেসে, আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে যদি আল্লাহকে পাওয়া যায়, তা হলে তো সবই পাওয়া হলো।

ইবাদতের এ উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে উচ্চতর মানসিকতার নিদর্শন। কিন্তু এরূপ মানসিক অবস্থা অর্জন করা সবার জন্য সহজ নয়, যদিও তা কাম্য। সুতরাং এরূপ অবস্থা লক্ষ্য ও কাম্য হতে পারে, তবে অবশ্যকর্তব্য নয়। এজন্যই ভয় ও আশা (خَوْفًا وَطَمَعًا) সহকারে আল্লাহকে ডাকার জন্য কুরআনে তাগিদ করা হয়েছে।

(১) وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا -

(২) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا -

(১) "দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, আর তাঁকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশার সাথে ডাকবে।"[১৫৯]

(২) "তারা (রাত্রে) শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, ভয় ও আশার সাথে।"[১৬০]

সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির মানসিকতা সহকারেই আল্লাহকে ডাকা এবং ইবাদত করা উচিত, আর এতে আল্লাহর ভয় এবং ক্ষমা ও মুক্তির আশা তো থাকবেই।

নামায রোযাসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং জীবন পথের সকল কর্মকাণ্ডে একই কথা প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ নামাযের কথা ধরা যাক। কেউ যদি নামাযের প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য রাখে, ঠিকভাবে রুকু করে, সুন্দরভাবে সিজদা করে এবং এভাবে সবগুলো কাজই করে, তবে সুন্দরভাবে নামাযের ফরয-ওয়াজিব-সুন্নত আদায় হলো, নামাযের দেহ ও অবয়বটি অতি সুন্দর হলো। কিন্তু এতে কি নামাযের প্রাণ আছে? নামাযে যথার্থ প্রাণ থাকতে হলে লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু হবেন আল্লাহ, রুকু-সিজদা নয়। সিজদা র সময় যদি নামাযী আল্লাহকে তার সামনে উপস্থিত জেনে মাথা নত করে সিজদায় উপনীত হয়, তা হলে সিজদা টির বাহ্যিক রূপটি সুন্দর হতে বাধ্য, যা হবে নামাযের দেহ। আর সামনে উপস্থিত স্বয়ং আল্লাহকে সিজদা করার মূল লক্ষ্য হবেন আল্লাহ; আল্লাহর সামনে নামাযীর সমস্ত অস্তিত্বকে বিনয়ে নত করে দেয়া, নিজেকে প্রেমিকের সামনে সমর্পণ করে দেয়া। এটি হবে নামাযের প্রাণ। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ নামাযকে 'ইহ্সান' (احسان) পর্যায়ের

---

১৫৯. আল-কুরআন ৭ : ৫৬।

১৬০. আল-কুরআন ৩২ : ১৬।

ইবাদত বলেছেন। এভাবে আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং বাস্তব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে প্রকৃত ও কাম্য পর্যায়ের ইবাদতে পরিণত করতে হলে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে হবে স্বয়ং আল্লাহ, নিছক ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা নয়। এ অর্থেই মুসলমানদের সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য হলেন আল্লাহ।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

"বলো, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একান্তভাবে আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।[১৬১]

সারকথা, ইবাদত হলো মানুষের কর্তব্য, তবে ইবাদতই মূল লক্ষ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলেন আল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টি। এমন মন নিয়ে ইবাদত করলেই আল্লাহকে পাওয়া যায়, যাকে পাওয়ার জন্যই ইবাদত, আর যাকে পেলে সবকিছুই পাওয়া হলো।

ইবাদতের সামষ্টিকতা

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) বাক্যটিতে একা ইবাদতের পরিবর্তে সামষ্টিক ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। আরবীতে نَعْبُدُ শব্দটি বহুবচন, যার একবচন হলো اَعْبُدُ। এখানে প্রশ্ন, সূরা ফাতিহা তো প্রত্যেক মুসল্লী একাকী পাঠ করছে, তবে কেন এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে? একজন পাঠকের জন্য আমি একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (اَعْبُدُ إِيَّاكَ) না বলে বরং 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি' কেন বলা হয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে বহুবচন শব্দ ব্যবহারের নিয়ম-নীতির দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। আসলে প্রধানত দুটি কারণে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। প্রথম, সংখ্যায় বেশি হলে বহুবচন হয়। অর্থাৎ সংখ্যার অধিক্য বুঝাবার জন্য বহুবচন হয়। আরবিসহ সকল ভাষাতেই এ একই নিয়ম। দ্বিতীয়, একজন হলেও সম্মানিত ব্যক্তি বা সত্তা বহুবচন ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, আল্লাহ অধিকাংশ সময়ই নিজের জন্য বহুবচন ব্যবহার করেন।[১৬২] দুনিয়াতেও সম্মানিত ব্যক্তিগণ নিজের জন্য অনেক সময় একবচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ সম্মানের জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতটিতে সম্মানের জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়নি। কেননা,

---

১৬১. আল-কুরআন ৬ : ১৬২।

১৬২. যেমন আল্লাহ বলেন, "আমরা কুরআনকে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি" (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)। 'আমি' এর স্থলে 'আমরা' বলা হয়েছে।

আয়াতটিতে মানুষ আল্লাহর সামনে চরম বিনয়ের সাথে ইবাদতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সুতরাং এখানে বহুবচন ব্যবহারের অন্য কারণটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ এখানে সংখ্যাধিক্যের অর্থেই বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে এ সংখ্যাধিক্যের বিষয়টির একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে।[১৬৩]

প্রথম, এখানে বহুবচন দ্বারা এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জামাতের সাথেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ইবাদত সালাত তথা নামায পড়া উচিত।

দ্বিতীয়, জামাতে নামায না পড়ে যদি একাকীও পড়া হয়, তা হলে نَعْبُدُ (আমরা তোমার ইবাদত করি) বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমি ইবাদত করছি এবং আমার সাথে ফেরেশতারাও নামায পড়ছেন। অর্থাৎ আমি একাই নই, বরং সবাই ইবাদত করছে।

তৃতীয়, মুসলমানরা একে আপরের ভাই তাদের মধ্যে সম্পর্ক হলো ভ্রাতৃত্বের। এক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট শুধু নিজের ইবাদতের কথা না বলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ সকলের তরফ থেকে ইবাদতের কথা বলা হচ্ছে। এতে করে কেবল নিজ স্বার্থই নয় বরং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ চিন্তাও প্রকাশ পায়।

চতুর্থ, এখানে আল্লাহ যেনো এ ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌সহ আল্লাহর সকল প্রশংসা করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং সে যেনো কেবল নিজ কল্যাণের চিন্তাই না করে বরং সকল মুসলমানের মঙ্গলের চিন্তা করে এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলে, যাতে সকলের কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ অর্থে এখানে আল্লাহর ইবাদতের কথা বলে সকলের জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনা রয়েছে।

এভাবে কেউ সূরা ফাতিহা এবং তার অন্তর্ভুক্ত এ আয়াতটি একাকী পাঠ করলেও সামষ্টিকভাবে সকলের পক্ষ থেকেই ইবাদতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। সকলের ইবাদতই আল্লাহর প্রাপ্য। যেনো এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, হে আল্লাহ, তুমিই আমাদের সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং বিচারদিনের মালিক; সুতরাং আমরা সবাই মিলে বিনয়ের সাথে একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। এ সামষ্টিক ঘোষণায় আল্লাহর প্রতি মানুষের বিনয়ের মাত্রা বাড়ে এবং আল্লাহর সম্মান ও মহত্ত্বেরও আধিক্য প্রকাশ পায়। এতে করে সকলের তরফ থেকে বিনয়ের সাথে আল্লাহর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। আর এতে সামষ্টিকভাবে জামাতে নামায আদায়, সকল ব্যাপারে সামষ্টিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের মানসিকতা, এবং আল্লাহর দেয়া জীবন-দর্শনের সামাজিক ও সামষ্টিক বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পায়।

---

১৬৩. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি তাঁর আত্‌তাফসীরুল কবীর, প্রাগুক্ত গ্রন্থে إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর তাফসির প্রসঙ্গে এ ধরনের ব্যাখ্যাগুলো পেশ করেছেন।

মানুষের স্বাধীনতা

তাওহীদ ও একত্ববাদের মধ্যে সুপ্ত আছে মানুষের স্বাধীনতা। বন্দেগি, দাসত্ব ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য, অন্য কারো নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা কোন কিছুর কাছে মাথা নত করার দরকার নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট মানুষের মাথা উন্নত ও স্বাধীন। অথচ বাস্তব জগতে মানুষকে বিভিন্ন প্রকার অধীনতার শিকার হতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ হলো এই :

(১) ধর্মীয় গুরু ও পুরোহিত। তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ধর্মের অনুসারীরা প্রায় প্রভুর স্থানে বসিয়ে তাদের আনুগত্যের শিকল গলায় ঝুলায়। এরূপ আচরণকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ বলেন: "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত-পুরোহিত-পাদ্রী ও সংসার বিরাগী ও সন্ন্যাসীদেরকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকেও। অথচ তারা এক মা'বুদের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল।"[১৬৪] অর্থাৎ ধর্ম গুরু ও পুরোহিতদের প্রভুসুলভ আনুগত্য আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতের ধারণার পরিপন্থি।

(২) দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও শাসক। অনেক সময় মানুষ রাজা বা কোন সংস্থার সীমাহীন আনুগত্যের অধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহর ইবাদত মানে হলো আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া। আল্লাহ বলেন: "আইন ও বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন তোমরা যেনো তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত না করো।"[১৬৫] সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করার অর্থ শুধু আল্লাহকেই আইনদাতা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া। তবে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রায়োগিক প্রয়োজনে আল্লাহর দেয়া আদর্শের আওতায় থেকে বিধি-বিধান তৈরি করা যাবে। কারণ আল্লাহর আইনের প্রায়োগিক প্রয়োজনেই তা দরকার।

(৩) মানব রচিত মতবাদ বা বাতিল ধর্মবিশ্বাস। মানুষ এতে অনেক সময় এমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, সে তার স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি ও বিবেক হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ "নিঃসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন (জীবন-ব্যবস্থা)।"[১৬৬] অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মানব রচিত মতবাদ বা কোন বাতিল ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর

---

১৬৪. আল-কুরআন ৯ : ৩১।
১৬৫. আল-কুরআন ৯ : ৩১।
১৬৫. আল-কুরআন ১২ : ৪০।
১৬৬. আল-কুরআন ৩ : ১৯।

একত্ববাদ, তাওহীদ ও একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য মানুষকে সকল মানব রচিত মতবাদ এবং বাতিল ধর্মের আনুগত্য ও অধীনতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের বাচনভঙ্গি প্রসঙ্গঃ অনুপস্থিত অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে উপস্থিত সম্বোধনের তাৎপর্য

এ পর্যায়ে সূরা ফাতিহায় বর্ণিত কয়েকটি আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। সূরা ফাতিহার প্রথম দিকে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এমনভাবে যেনো আল্লাহ সামনে উপস্থিত নন, বরং অনুপস্থিত (غَائِبْ)। যেমন, বলা হয়েছে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য"। বলা হয়নি, হে আল্লাহ, তোমারই সকল প্রশংসা। মালিকি ইয়াউমিদ্দীন (তৃতীয় আয়াত) পর্যন্ত আল্লাহকে সরাসরি সম্বোধন করার পরিবর্তে আল্লাহর অনুপস্থিতিকে (third person) বর্ণনাভঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু চতুর্থ আয়াত থেকে বর্ণনাভঙ্গী পরিবর্তন করে আল্লাহকে উপস্থিত (حَاضِرْ) মনে করে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে, "হে আল্লাহ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি"। অনুপস্থিত (غَائِبْ) থেকে উপস্থিত (حَاضِرْ) হিসেবে বর্ণনাভঙ্গী পরিবর্তনের তাৎপর্য কি? তাফসিরকারকগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১৬৭]

প্রথমঃ প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে অনুপস্থিতি (غَائِبْ)-এর ভঙ্গিমায়, কেননা অনুপস্থিতিতে প্রশংসাই প্রকৃত প্রশংসা। উপস্থিতিতে প্রশংসা করলে তাতে সত্যিকার প্রশংসা হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। মনের অভ্যন্তরে কারো ব্যাপারে ঘৃণা থাকলেও সামনা-সামনি তা প্রকাশ না করে অনেক সময় প্রশংসা করা হয়। বিভিন্ন কারণ, উদ্দেশ্য ও স্বার্থে তা করা হয়, যা মানুষের অজানা নয়। বলাবাহুল্য, অনুপস্থিতিতে কারো প্রশংসা করায় সাধারণত এমন কোন কারণ বা উদ্দেশ্য থাকে না বরং তা হয় নিখাদ প্রশংসা। সুতরাং অনুপস্থিতভাবে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। তবে কারো আনুগত্যের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি আলাদা। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য, ইবাদত ও সেবার প্রতিশ্রুতি উপস্থিতিতেই অধিক কার্যকরীভাবে হতে পারে। কাজেই অনুপস্থিতভাবে আল্লাহর প্রশংসার পর আল্লাহকে উপস্থিতভাবে সরাসরি সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'হে আল্লাহ, আমরা কেবল তোমারই

১৬৭. দেখুন শাইখুত্তাফসীর ইদরিস কান্ধলভী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ২০,২১।

ইবাদত করি।'

দ্বিতীয় : অনুপস্থিতভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী দ্বারা যখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে যে, 'হে আল্লাহ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং সাহায্য প্রার্থনা করি।' নৈকট্য লাভের জন্য অনুপস্থিতির প্রশংসা বেশি কার্যকরী। আর সাহায্য পাওয়ার জন্য সরাসরি প্রার্থনা অধিক কার্যকরী।

তৃতীয় : আল্লাহর নিকট সাহায্য ও হিদায়াতের প্রার্থনা করার পূর্বে اياك نعبد বলে আল্লাহকে সম্বোধন করে ইবাদত নিবেদন করা হয়েছে, কারণ বিনয় ও আত্মসমর্পণ উপস্থিতিতেই অধিক কার্যকরী হয়।

এ বাচনভঙ্গি থেকে কুরআনের সাহিত্যমান, বর্ণনাভঙ্গির উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি

'ইয়্যাকা না'বুদু' বলার পর রয়েছে 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' (আমরা তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি)। এই আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহর ইবাদতের ঘোষণা, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির পর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা (আয়াত-৪)।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আর এর বিপরীতে মানুষের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অতি সীমিত। সকল কাজেই মানুষ আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সুতরাং সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। "ইয়্যাকা নাস্তাঈন" বলে এখানে একদিকে আল্লাহর মহত্ব এবং অপরদিকে মানুষের বিনয় প্রকাশ করা হয়েছে।

ইয়্যাকা নাস্তাঈন : অর্থ ও তাৎপর্য

إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ শব্দটির মূল হলো عَوْنٌ (সাহায্য)। عَوْنٌ থেকে উৎসারিত نَسْتَعِيْنُ অর্থ হলো আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ আমরা আল্লাহর সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফিক কামনা ও প্রার্থনা করি। সাধারণভাবে কথাটা হওয়ার কথা ছিল نَسْتَعِيْنُكَ (আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি)। কিন্তু এখানে ক্রিয়ার পূর্বে কর্মের ব্যবহার দ্বারা জোর দিয়ে বলা হয়েছে إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি আমরা)। বাক্যের এ ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনাকে একমাত্র আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে আয়াতটির প্রথম অংশের বাচনভঙ্গিও লক্ষ্যণীয়। সেখানে একই বাচনভঙ্গিতে কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি ইবাদতের অঙ্গীকারকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বাসের দিক দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহকেই স্বীকার করতে হবে। আনুষ্ঠানিক ইবাদতও কেবল আল্লাহকেই নিবেদন করতে হবে। জীবনে চলার ক্ষেত্রে শুধু তাঁরই অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

কিন্তু সকল প্রকার আকীদার শির্‌ক এবং আমলের শির্‌ক থেকে আত্মরক্ষা করে একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করা তথা জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে একান্ত ভাবে আল্লাহর বন্দেগি ও আনুগত্য করা সহজ কাজ নয়। আকীদার মধ্যে অজান্তে নানা বিচ্যুতি চলে আসতে পারে, আর বাস্তব জীবনে চলার পথেও আল্লাহ ছাড়া অনেক রূপক প্রভুর আনুগত্য এসে যেতে পারে। সুতরাং একান্ত

ভাবে আল্লাহর ইবাদত করার সামর্থের জন্য আল্লাহর সাহায্যের বিকল্প নেই। এ কারণেই আল্লাহর ইবাদত করার ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির পরই তাতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

তবে আল্লাহর সাহায্য শুধু বিশ্বাস ও ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, বরং ইবাদত ছাড়াও জীবনের সকল কাজেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। কোন কাজেই মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতাবান নয়। আল্লাহ হলেন পরম ক্ষমতাবান, যিনি কোন কাজে কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। অন্যদিকে মানুষের ক্ষমতা একান্তভাবেই সীমিত। তাই সে সকল কাজে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এমন কি মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও নিজে একা তৈরি করতে পারে না। যে খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদন করে, সে ব্যক্তি খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ প্রস্তুত করতে পারে না, জীবন ধারণের জন্য দরকারি অন্যান্য জিনিসের তো প্রশ্নই উঠে না। এজন্য মানুষে মানুষে পারস্পারিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আর সবচেয়ে বেশি আবশ্যক হলো আল্লাহর সাহায্য। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য।

১। মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়,
২। ইবাদত ও আনুগত্যে আল্লাহর সাহায্য,
৩। দুনিয়াতে আল্লাহর সাহায্য,
৪। মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়ার অনুমতি আছে কিনা,
৫। সাহায্য প্রার্থনার সামষ্টিকতা।

এখানে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়

আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে একটি সত্য প্রকাশিত হচ্ছে যে, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী নয়। শারীরিক দিক থেকে অনেক সৃষ্টির তুলনায়ও সে দুর্বল। তাকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা আল্লাহর জ্ঞান-প্রজ্ঞার তুলনায় কিছুই নয়। কিছুক্ষণ পর সে জীবিত থাকবে কিনা, তাও সে জানে না। অন্যদিকে আল্লাহ হলেন সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাবান। সুতরাং মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

মানুষ আসলেই অসহায়। সবচেয়ে বিজ্ঞ ডাক্তারের সামনেই হয়তো একটা রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ডাক্তার হয়তো জানে তার কি রোগ। কিন্তু তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। রোগী মরে যায়। দুনিয়ার মাপকাঠিতে পরাক্রমশালী শাসকের দাপট ও ত্রাসে হয়তো মানুষ কম্পমান থাকে; কিন্তু দিনে দিনে তার দেহে ক্ষয় আসে। ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে নুয়ে পড়ে। অন্যের সাহায্য ছাড়া দাঁড়াতেও পারে না। এক সময়ের দাপটের

শাসক নিজকেও রক্ষা করতে পারে না! অনেক সময় প্রচণ্ড ক্ষমতা ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও রাজার রাজত্ব চলে যায়। সে অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে, তার কিছুই করার থাকে না। ইতিহাসে এরূপ অনেক বাস্তব ঘটনা রয়েছে যে, এক সময়ের মহাপ্রতাপশালী সম্রাটের মাথা কেটে তার রক্তাক্ত মন্ডু নিয়ে শত্রুপক্ষ আনন্দের মজলিস বসিয়েছে। হায়, এক সময়ের ত্রাস ও দাপটের কী করুণ পরিণতি! আসলে মানুষ যতোই শক্তি প্রদর্শন করুক, বাস্তবে সে খুবই অসহায়।

মানুষ সত্যিই দুর্বল ও অসহায়। সে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং মুখাপেক্ষী। সে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ফল তার হাতে নয়। অনেকে অক্লান্ত ও আপ্রাণ চেষ্টা করেও তেমন ফল পায় না। আবার অনেকে তেমন চেষ্টা না করেও অকল্পনীয় ফল পেয়ে যায়। যেখানে আল্লাহর সাহায্য থাকে, সেখানে ফল পাওয়া যায় কল্পনার অতীত। কাজেই মানুষ একান্তভাবেই আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল। একমাত্র আল্লাহ হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী। এ মর্মেই আল্লাহ বলেন :

(১) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ- اللهُ الصَّمَدُ -

(২) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ ۖ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ -

(১) "বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)।"[১৬৮]

(২) "হে মানুষ, তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী; একমাত্র আল্লাহই হলেন অমুখাপেক্ষী, পরম প্রশংসিত।"[১৬৯]

যেহেতু মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী, সেহেতু তার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। সুতরাং প্রতিটি কাজে দুটি বিষয় থাকতে হবেঃ (১) প্রচেষ্টা, (২) আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা। এটি হলো "ইয়্যাকানাস্তাঈন" এর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

মানুষের আয়ত্তে আছে দুটো জিনিস : (১) ইচ্ছা (কোন কাজ করার মানসিক সিদ্ধান্ত); (২) কাজটি করার জন্য প্রচেষ্টা। ইচ্ছা ও চেষ্টা হলো "যরূরী শর্ত" (necessary condition) এ ইচ্ছা ও চেষ্টা কোনমতেই "যথেষ্ট শর্ত" (sufficient condition) নয়। আল্লাহর সাহায্য হলো "যথেষ্ট শর্ত"।

মানুষের কাজ হলো ইচ্ছা (মানসিক সিদ্ধান্ত) করা ও চেষ্টা করা। ইচ্ছা ও

---

১৬৮. আল-কুরআন ১১২ : ১-২।
১৬৯. আল-কুরআন ৩৫ : ১৫।

চেষ্টা তার আয়ত্তে আছে, কিন্তু ফল তার আয়ত্তের বাইরে। "যরুরী শর্ত" তথা ইচ্ছা ও চেষ্টার সাথে যখন "যথেষ্ট শর্ত" (আল্লাহর সাহায্য) মিলিত হয়, তখনই কাম্য ফল পাওয়া যায়। আল্লাহর সাহায্যের সাথে সাফল্যের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে কখনো এমন প্রাপ্তি ও সাফল্য দেখা দেয়, যা পাওয়ার কল্পনাও মানুষ করে না। সুতরাং সকল কাজে চেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন, এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনা থাকা উচিত।

সত্যপথ সন্ধান, ইবাদত ও আনুগত্যে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা অনেক সময় সত্যপথ খুঁজে নেয়া সহজ হয় না। বিজ্ঞানীদের তত্ত্বেও দেখা যায়, আজ যা সত্য বলে ধরা হয়, কাল তা-ই ভুল প্রমাণিত হয়। মানুষের জীবনাদর্শের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। জীবন-বিধান হিসেবে সত্যকে খুঁজে নেওয়ার চেতনাই অনেকের মধ্যে থাকে না। আবার যাদের মধ্যে এ চেতনা থাকে তারাও সঠিক পথনির্দেশনা না পেলে ভ্রান্ত পথকে সঠিক পথ হিসেবে গ্রহণ করে বসে। সুতরাং দেখা যায়, অনেকেই স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির পূজা-অর্চনা করে এবং নানা প্রকার কুসংস্কারকেই ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বলে মনে করে। এক্ষেত্রে চেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকলে সত্যপথ পাওয়া সহজ হয়। কাজেই সত্য পথ পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

সত্যপথের সন্ধান পাওয়াই কিন্তু যথেষ্ট নয়। হক ও বাতিল, আর সত্য ও মিথ্যাকে জানার পরও ঠিক পথে থাকার জন্য মানসিক শক্তির প্রয়োজন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে দুটি বিপরীতমুখী শক্তি কাজ করে। এক, প্রবৃত্তি যা মানুষকে ভালো-মন্দ নির্বিচারে মন্দের দিকে আকর্ষণ করে এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। কুপ্রবৃত্তিকে নফ্‌সে আম্মারাহ্ বলা হয় (نَفْسُ اَمَّارَه)। দুই, বিবেক যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এমন সুস্থ মনকে নফসে লাওয়ামাহ (نَفْسُ لَوَّامَه) বলা হয়। এ দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুস্থ মানসিকতার প্রয়োজন, যা অর্জন করা সহজ নয়। তদুপরি রয়েছে শয়তানের কুমন্ত্রণা। জিন শয়তানের কুমন্ত্রণা আসে অদৃশ্যভাবে, আর মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণা আসে বাতিল মত, পথ, মতবাদ ও আদর্শের প্রতি ভ্রান্ত যৌক্তিকতা ও প্রভাবের মাধ্যমে, এবং দুনিয়ার অশালীন ক্রিয়া-কর্মের আকর্ষণের প্রতি লোভনীয় প্ররোচনা, প্রচারণা-পরিবেশনার মাধ্যমে।

দুনিয়াতে যা কিছু নিষিদ্ধ তা-ই মানুষকে বেশি আকর্ষণ করে। নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা, নাচ-গান, ন্যায়-অন্যায় নির্বিচারে দুনিয়ার ধন-সম্পদ

আহরণ, অবাঞ্ছিত ভোগ-বিলাস, এসবই আকর্ষণীয় জিনিস। এসবের লোভ থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা নিঃসন্দেহে কঠিন। এসব অন্যায়-অশ্লীলতার আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করে সত্য-সোজা পথে থাকার জন্য সুস্থ মন (نَفْسٌ لَوَّامَة) প্রয়োজন। আল্লাহর সাহায্য এতে সহায়ক হয়।

একইভাবে ইবাদতেও আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। মানুষ অনেক সময় দুনিয়ার আকর্ষণ ও কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে এবং শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ ও আল্লাহর বিধি-বিধানকে ভুলে যায়, ইবাদত-বন্দেগিতে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য পেলে নিষিদ্ধ কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ এবং সহায়ক হয়। ঠিকভাবে ইবাদত করা সহজ হয়, ইবাদতের সুফল পাওয়া যায়। যেকোনো ভালো কাজ ও ইবাদতের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়, যার মাত্রা নির্ভর করে নিয়্যত, নিষ্ঠা ও মনোযোগের উপর। একই ভালো কাজ করে কেউ হয়তো আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রতিদানই পায় না;[১৭০] কেউ হয়তো দশগুণ পুণ্য পায়, আবার কেউ সাতশতগুণ বেশি পুণ্য ও প্রতিদান পায়। মানুষের চেষ্টা এবং আল্লাহর সাহায্য থাকলে যথার্থ মন ও মানসিকতা[১৭১] নিয়ে নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে ভালো কাজ ও ইবাদত করা সম্ভব, যাতে পরিপূর্ণ প্রতিদান পওয়া যায়। এজন্যই মহানবী আমাদেরকে এ দু'য়াটি শিক্ষা দিয়েছেন।

رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার যিকর (মৌখিক তাসবীহসহ তোমার বিধি-বিধান স্মরণ রেখে কাজ) করা, তোমার শুকরিয়া আদায় করা এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার ব্যাপারে সাহায্য করো।"[১৭২]

সারকথা, সত্যপথ খুঁজে পাওয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে একনিষ্ঠ ও মনোযোগী হওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য

---

১৭০. যারা শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত বা ভালো কাজ করবে, তারা আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রতিদান পাবে না। কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে, "তোমাদের কর্মের যে উদ্দেশ্য তা তো দুনিয়াতেই পেয়ে গেছ; সুতরাং এখানে কোন প্রতিদান নেই।" এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিমে একটি হাদিস আছে যাতে বলা হয়েছে যে, নিয়্যতের পরিশুদ্ধতার অভাবে আল্লাহ অনেক দানবীর, মুজাহিদ এবং আলেমকেও দোযখে নিক্ষেপ করবেন। দেখুন, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা হাদিস-১৫২। আরো দেখুন, মুসনাদে আহমদ-২/৩২২।

১৭১. আল্লাহকে মানুষের "মনের নিয়ন্ত্রণকারী" (مُقَلِّبُ الْقُلُوْبِ) বলা হয়। তবে আল্লাহ জোর করে কারো মন কোন দিকে ঘুরিয়ে দেন না। মানুষ যদি মনকে ঠিক রাখতে চায়, আল্লাহ তাতে সাহায্য করেন।

১৭২. নাসায়ী, হাদিস নং- ১৩০২

প্রয়োজন। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ঠিকভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়, অথবা ইবাদত করলেও পূর্ণ ফল পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। মযবুত ইচ্ছা, সত্যিকার প্রচেষ্টা ও আল্লাহর সাহায্য থাকলে মানুষের জীবনকে ইবাদতে পরিণত করা সম্ভব, যার জন্য মানুষের সৃষ্টি।

দুনিয়াতে আল্লাহর সাহায্য

আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী দুনিয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে রয়েছে কার্যকারণ (cause) ও কার্যফল (effects বা results)। এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো এই যে, মানুষ কিছু করলে তার ফল পাবে। আল্লাহ বলেন: - وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

" আর (কথা হলো) এই যে, মানুষ তাই পায় যার জন্য সে চেষ্টা করে।"[১৭৩]

এ হিসেবে কাফিররাও যদি দুনিয়ার কাজ করে, তারা তার ফল পাবে। নিয়ম অনুযায়ী কৃষিকাজ করলে ফসল উৎপন্ন হবে। দক্ষতার সাথে ব্যবসা করলে মুনাফা হবে, ইত্যাদি। কিন্তু এরপরও দেখা যায়, অনেকে একই নিয়মে এবং সমান দক্ষতার সাথে কাজ করে অন্যের চেয়ে বেশি পায়, আবার একই কাজ করে অনেকে কম পায়। কারণ একক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য আছে, অন্যক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য নেই। আসলে আল্লাহ সীমাহীন ভাণ্ডারের অধিকারী। দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর দান। মানুষের যা আছে, সবই তাঁরই নিকট থেকে পাওয়া; আর যা নাই, তাও তাঁর নিকট পাওয়া যেতে পারে। মানুষ চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। মানুষের চেষ্টার ফল হিসেবে আল্লাহ কাউকে বেশি দিতে পারেন, আবার কাউকে কমিয়ে দিতে পারেন। কাউকে রাজত্ব দিতে পারেন, কারো রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারেন।[১৭৪]

সুতরাং দুনিয়ার কাজেও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করে দুনিয়াতে কাম্য শক্তি ও অবস্থান লাভের জন্য তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনায় উৎসাহিত করেন। এ বিষয়টি কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ مُوْسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ۔

"মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং সবর করো। পৃথিবীর মালিক তো আল্লাহই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা

---

১৭৩. আল-কুরআন ৫৩ : ৩৯।
১৭৪. আল-কুরআন : ৩২৬।

তার উত্তরাধিকারী করেন। আর পরিণাম (সাফল্য) তো মুত্তাকীদের জন্য।"[১৭৫]

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্যের সাথে দৃঢ়পদ থেকে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এটি হলো মুত্তাকীদের অন্যতম গুণ। এ গুণের অধিকারীরাই পরিণামে দুনিয়াতেও সফল হবে, আখিরাতেও সাফল্যের অধিকারী হবে। সুতরাং দুনিয়ার সাফল্যের জন্য অন্যান্য গুণের সাথে আল্লাহর সাহায্য একটি শর্ত।

মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়ার অনুমতি আছে কিনা

দুনিয়া ও আখিরাত, পার্থিব কাজ ও ইবাদত, সকল ব্যাপারেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। সুতরাং সবকিছুতে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে, এবং একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য চাইতে হবে, অন্য কারো নয়। 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' বলে এ ঘোষণাই করা হয় যে, হে আল্লাহ, আমরা একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, অন্য কারো নয়। সূরা ফাতিহার এ বাচনভঙ্গীর সারমর্মও তাই। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আরবী ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে ক্রিয়া (فِعْل) পূর্বে এবং কর্ম (مَفْعُوْل) পরে আসে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে কর্মপদকে ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহার করে সাহায্য প্রার্থনাকে আল্লাহর নিকট সীমিত (حَصْرٌ) করে দেয়া হয়েছে। যদি একমাত্র আল্লাহর সাহায্য চাওয়া না হতো তা হলে বলা যেতো نَسْتَعِيْنُكَ (অর্থাৎ আমরা তোমার সাহায্য চাই)।

কিন্তু ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্য কামনা ও গ্রহণ, এবং অন্যকে সাহায্য দানের সুযোগ আছে। অসুস্থ হলে ডাক্তারের সাহায্য চাওয়ার অনুমতিই শুধু নয়, বরং এর উৎসাহ রয়েছে। অভাবে ও বিপদে মানুষকে সাহায্য করার শুধু অনুমতিই নয়, বরং সাহায্য করা অনেকটা বাধ্যতামূলক। অভাবে ও বিপদে সাহায্য চাওয়া এবং সাহায্য দানের ব্যবস্থা ইসলামী জীবন-দর্শনে রয়েছে। আসলে ইসলাম চায়, একটা সাহায্য-সহযোগিতাপূর্ণ সংবেদনশীল সমাজ গড়ে উঠুক, যেখানে ধনী-গরীব স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল ও সুস্থ্য-অসুস্থ সবাই একে অপরের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। আল্লাহ বলেন :

(১) وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى -

(২) وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

(১) "সৎকর্ম ও তাক্ওয়া বিষয়ে তোমরা পরস্পর সাহায্য করো।"[১৭৬]

(২) "তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[১৭৭]

অর্থাৎ ইসলামী জীবন-দর্শনে আল্লাহ ছাড়া মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া এবং

---

১৭৫. আল-কুরআন ৫ : ২।
১৭৬. আল-কুরআন ৫ : ২।
১৭৭. আল-কুরআন ৫১ : ১৯।

তা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। তা হলে প্রশ্ন উঠে, সূরা ফাতিহার আলোচ্য এর তাৎপর্য বুঝতে হলে বিষয়টির আরেকটু গভীরে প্রবেশ করা দরকার। প্রতিটি ব্যাপারে থাকে কার্যকারণ ও কার্যফল। আবার এ দু'য়ের মধ্যে থাকতে আয়াতে একমাত্র আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা এবং অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা না করার তাৎপর্য কি?

এর তাৎপর্য বুঝতে হলে বিষয়টির আরেকটু গভীরে প্রবেশ করার দরকার। প্রতিটি ব্যাপারে থাকে কার্যকারণ ও কার্যফল। আবার এ দু'য়ের মধ্যে থাকতে পারে কার্য উপকরণ বা কার্যমাধ্যম। সবকিছুর একচ্ছত্র কার্যকারণ (absolute cause) হলেন আল্লাহ। জমিতে যদি একটা বীজ বপন করা হয়, সেখানে একটা চারা জন্মে এবং গাছটি বড় হয়ে ফল দেয়। এ বীজের মধ্যে চারা অঙ্কুরিত হওয়ার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট আল্লাহই দিয়েছেন। মাটি থেকে রস আহরণ করা, চারাগাছ হওয়া, তা বড় হয়ে ফুল ও ফল দেয়া ইত্যাদি গুণ, বৈশিষ্ট ও ক্ষমতা আল্লাহরই দান। এ হিসেবে ফসল উৎপন্ন হওয়া এবং ফল দেয়ার একচ্ছত্র কার্যকারণ হলেন আল্লাহ। আল্লাহ যদি বীজের এ ক্ষমতা ও গুণ রহিত করেন, তা হলে অন্য কেউ বীজের মধ্যে এ ক্ষমতা দিতে পারবে না।

কিন্তু অপরদিকে বলা যায় যে, কৃষকের চাষ ও বীজ বপনের কারণেই ফসল উৎপন্ন হয়। এখানে এই ফসল উৎপাদনের কারণ কি আল্লাহ, নাকি কৃষক? আসলে ফসল উৎপন্ন হওয়ার মৌলিক ও একচ্ছত্র কার্যকারণ হলেন আল্লাহ। কারণ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফসল উৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়াটিই আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে কৃষক হলো কার্য উপকরণ বা কার্য মাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে কার্য উপকরণের মাধ্যমে আল্লাহই ফসল উৎপাদন করেন। আল্লাহ বলেন,

أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ - أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَه أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ-

"তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছ কি? তাকে কি তোমরা অঙ্কুরিত কর, নাকি আমি অঙ্কুরিত করে থাকি?"[১৭৮]

এখানে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, ফসল উৎপাদনের তিনটি দিক আছেঃ (১) ফসল উৎপাদনের একচ্ছত্র বা মৌলিক কার্যকারণ (আল্লাহ); (২) ফসল উৎপাদনের মাধ্যম বা কার্য উপকরণ (কৃষক); এবং (৩) কার্যফল (ফসল)।

এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। মানুষ যদি কোন কিছু অর্জন করতে চায়, তা হলে প্রকৃত কার্যকারণ আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, অন্য কারো নিকট চাওয়া যাবে না। তবে এতে করে ফসল উৎপাদনে কৃষকের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। কোন দেশ যদি কৃষি উন্নয়ন করতে চায়,

---

১৭৮. আল-কুরআন ৫৬ : ৬৩-৬৪।

তা হলে কৃষকদেরকে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কৃষককেও যথার্থভাবে কৃষিকাজ করার পর আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তখনই ভালো উৎপাদন (কার্যফল) পাওয়া সম্ভব।

আল্লাহকে একচ্ছত্র ও প্রকৃত কার্যকারণ বিশ্বাস করে কাজের মাধ্যম হিসেবে মানুষের সহযোগিতা চাওয়াতে কোন বাধা বা অসুবিধা নেই। অসুস্থ হলে ডাক্তারের সাহায্য চাওয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পারস্পারিক সহযোগিতা চাওয়া ও দেয়াও একইভাবে অনুমোদিত ও উৎসাহিত। মানুষের সহযোগিতা কামনা করার সাথে সাথে সাহায্যের জন্য আল্লাহর নিকটও প্রার্থনা করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট কি ধরনের সাহায্য চাওয়া অনুমোদিত আর কি ধরনের সাহায্য অনুমোদিত নয়, তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো :

প্রথম: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে একচ্ছত্র কার্যকারণ (absolute cause) বিশ্বাস করে তার নিকট সাহায্য চাওয়া কুফরী ও শির্ক (আকিদাগত শির্ক), যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহকে একচ্ছত্র কার্যকারণ হিসেবে বিশ্বাসের পর এমন ধারণা করা যে, আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে কোন ব্যাপারে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে, সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে দিতে পারে। অর্থাৎ তাকে লাভ করতে পারলে প্রকারান্তরে আল্লাহকেই পাওয়া হলো। অর্থাৎ তাকে আল্লাহর অর্পিত (delegated) একচ্ছত্র কার্যকারণ হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এরূপ বিশ্বাস এবং এ ধরনের কারো নিকট সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ এটা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করার মতোই শির্ক। এ ধরনের বিশ্বাস ও আচরণকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ বলেন :

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى -

"জেনে রাখ, একনিষ্ঠভাবে দীন ও আনুগত্য আল্লাহর জন্য। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে তারা বলে, আমরা তো তাদের উপাসনা এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও কাফিরকে হিদায়াত করেন না।"[১৭৯]

---

১৭৯. আল-কুরআন ৩৯ : ৩।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কাউকে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা, এবং সেজন্য তার সাথে উপাস্যের সমতুল্য আচরণ করা শির্ক ও কুফরী। আর সেহেতু তা নিষিদ্ধ।

তৃতীয় : আল্লাহর কোন সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ করা নিষিদ্ধ যা শিরকের পর্যায়ে পড়ে। যেমন, কোন কবরে বা মাজারে গিয়ে মাজার পূজা করা এবং কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা, তার নিকট মনোবাঞ্ছা পুরণের জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এটিও শির্ক, যা হারাম। কারণ মৃত ব্যক্তির পক্ষে নিজের উপকারের জন্যও কিছু করা সম্ভব নয়, প্রার্থনাকারীর জন্য সে কি করতে পারবে?

চতুর্থ : একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে একমাত্র আল্লাহতেই বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা। তবে প্রয়োজনে দুনিয়াতে কোন মানুষের নিকট কোন সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ নয়, এবং তাতে কোন অপরাধ নেই। এরূপ সাহায্য সহযোগিত চাওয়া, পাওয়া ও দেয়া ইসলামী জীবন-দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ। এরূপ পারস্পারিক সহযোগিতার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করে।[১৮০]

সাহায্য প্রার্থনার সামষ্টিকতা

আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এখানে সামষ্টিকভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। একথা বলা হয়নি যে, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি' (اَسْتَعِيْنَ), বরং বলা হয়েছে, 'আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি' (نَسْتَعِيْنَ)। নামাযে বা নামাযের বাইরে পাঠক একা সূরা ফাতিহা পাঠক করলেও সামষ্টিক সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এক বচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহার পাঠকারীর সম্মানের জন্য নয়। এটি এই বিনয় প্রকাশের জন্য যে, শুধু পাঠকারী একাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়, বরং সকল মানবতা এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টিই আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

এছাড়া বহুবচন ব্যবহারের মাধ্যমে একাকী নামায পড়ার পরিবর্তে জামাতে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহিত করা রয়েছে। এখানে মুসলমানদের ব্যক্তিগত কল্যাণ চিন্তার পরিবর্তে সামষ্টিক কল্যাণ বিবেচনা করার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা এটাই মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দাবি।

---

১৮০. আল-কুরআন ৫ : ২।

দশম অধ্যায়

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

আমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দাও

সূরা ফাতিহার প্রথম দিকে আল্লাহর প্রশংসা ও ইবাদতের অঙ্গীকারের পর রয়েছে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় সাহায্য হলো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথে হিদায়াতের সাহায্য। আর তা হলো সূরা ফাতিহার প্রধান দু'আ। এর মর্ম হলো আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করা। হিদায়াত একটা ব্যাপক শব্দ। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো সরল সোজা সত্য পথ দেখানো। সে পথে পরিচালিত করা, দৃঢ়পদ রাখা, এবং এভাবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া।

আমাদের গন্তব্যস্থল কি এবং সেখানে পৌঁছার জন্য সোজা পথ কি, তা বুঝা যায় মানব সৃষ্টির প্রথম ঘটনাবলী থেকে। মানব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে এ বিষয়টিকে এভাবে বললেন: "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাতে যাচ্ছি।"[১৮১] কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথম মানুষ আদম (আ) ও হাওয়াকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠালেন না। বরং তাদেরকে বসবাস করতে দিলেন জান্নাত, যেনো জান্নাতই মানুষের বাসস্থান।[১৮২] কিন্তু পরে এক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার উসিলা সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হলো।[১৮৩] বলা হলো, ফল খাওয়ার অপরাধে তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হচ্ছে। তোমরা সে নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার এ বাসস্থানে (গন্তব্যস্থলে) ফিরে আসতে পারবে যদি আসন্ন হিদায়াত (পথ নির্দেশনা) অনুসরণ করো।[১৮৪] সে পথ অনুসরণ না করলে এ গন্তব্যস্থলে আসতে পারবে না, বরং অন্যস্থানে অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্থান দোযখে গিয়ে পতিত হবে।[১৮৫]

হিদায়াত : অর্থ ও তাৎপর্য

হিদায়াতের শাব্দিক অর্থ হলো দয়া ও কোমলতা সহকারে পথ দেখানো। আর এজন্যই হিদায়াত দ্বারা সাধারণত: মঙ্গল ও কল্যাণের পথ দেখানোকে

---

১৮১. আল-কুরআন ২ : ৩০।
১৮২. আল-কুরআন ২ : ৩৫।
১৮৩. আল-কুরআন ২ : ৩৫-৩৬।
১৮৪. আল-কুরআন ২ : ৩৮।
১৮৫. আল-কুরআন ২ : ৩৯।

বুঝানো হয়ে থাকে। এ অর্থে হিদায়াত প্রার্থনা করা মানে মঙ্গল ও কল্যাণের পথ তথা সরল সোজা সত্য পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা করা। সুতরাং প্রধানত এ অর্থেই কুরআনে হিদায়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

(১) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

(২) وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

(৩) وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

(৪) الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا -

(১) "আমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দাও।"[১৮৬]
(২) "আর তাকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথে হিদায়াত করেন।"[১৮৭]
(৩) "আর নিঃসন্দেহে তুমি সিরাতুল মুস্তাকীমেরই হিদায়াত করো।"[১৮৮]
(৪) "সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত দিয়েছেন।"[১৮৯]

এসব আয়াতে মঙ্গলজনক পথ তথা কল্যাণকর সত্যপথ দেখানো অর্থেই হিদায়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১৯০] তবে কুরআনে মাত্র একটি আয়াতে একটু ভিন্ন অর্থে হিদায়াত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

فَاهْدُوْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيْمِ -

"সুতরাং তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করো।"[১৯০/ক]

এখানে মন্দ পাপিষ্ঠ লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করাকে ঠাট্টার সুরে জাহান্নামের দিকে হিদায়াত বলা হয়েছে। যেমন ভাবে পাপিষ্ঠ ও মুনাফিকদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির "সুসংবাদ" দেয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন।[১৯১] বলা বাহুল্য, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন হতে পারে; কোনমতেই তা সুসংবাদ নয়। কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমান পরিচয় দিয়েও পেছন থেকে ইসলামের প্রতি ছুরিকাঘাত করে। তারা যেরূপ

---

১৮৬. আল-কুরআন ১ : ৫।
১৮৭. আল-কুরআন ১৬ : ১২১।
১৮৮. আল-কুরআন ৪২ : ৫২।
১৮৯. আল-কুরআন ৭ : ৪৩।
১৯০. শাইখুত তাফসীর ইদরীস কান্ধলভী তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, দিল্লী, ভারত, ফরিদ বুক ডিপো, ১ম সংস্করণ, ২০১২, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪।
১৯০/ক. আল কুরআন-৩৭ : ২৩
১৯১. আল-কুরআন ৪ : ১৩৮।

বিদ্রুপাত্মক আচরণ করে, তেমনি বিদ্রুপের সুরেই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইসলামী পারিভাষিক অর্থে হিদায়াত হলো আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবনাদর্শের দিকে পথ প্রদর্শন করা। হিদায়াতের ন্যূনতম পর্যায় হলো পথ প্রদর্শন করা। এ হিসেবে অনেকেই এ দু'আটির অনুবাদ এভাবে করেন,"আমাদেরকে সোজা পথ প্রদর্শন করো।" কিন্তু এ পথ প্রর্দশন হলো হিদায়াতের ন্যূনতম পর্যায়। হিদায়াত এর অর্থ আরো ব্যাপক। সেহেতু অনেক তাফসিরকারক সোজা পথ প্রদর্শন, সে পথে পরিচালিত করা, সে পথে দৃঢ়পদ রাখা, এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়াকেও হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৯২] মুমিন-মুসলমান ও নেককার বান্দাগণ যখন নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে হিদায়াতের দু'আ করেন, তখন এ ব্যাপক অর্থেই হিদায়াতের দু'আ অর্থবহ হয়। অন্যথায়, হিদায়াত প্রাপ্ত তথা সত্যপথ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে হিদায়াতের দু'আ করা নিরর্থক হয়ে পড়ে।

এ ব্যাপক অর্থে হিদায়াত প্রার্থনার মর্ম দাঁড়ায় এই : হে আল্লাহ, আমাদেরকে সরল সোজা সত্যপথ প্রদর্শন করো, সে পথে পরিচালিত করো, সে পথে দৃঢ়পদ রাখো, এবং সে পথে পরিচালিত করে আমাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দাও। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়ে তোমার মনোনীত পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম (সোজা পথ) দেখাও, সে পথে পরিচালিত করো, দৃঢ়পদ রাখো এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আমাদের গন্তব্যস্থান বেহেশ্‌ত পৌঁছে দাও। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, পর্যায় ও শাখা-প্রশাখায়, এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি বিভাগের চিন্তা, কর্ম ও বিধি-বিধান তথা গোটা জীবন-ব্যবস্থায় যা সত্য, নির্ভুল ও কল্যাণময় তা-ই আমাদের দেখাও এবং সেপথে চলার তৌফিক দান করো। এ পথে চলে দুনিয়াতে যে কল্যাণ পাওয়া যায়, তা দাও। আর আখিরাতে যে মুক্তি ও সাফল্য পাওয়া যায়, তা দান করো। এটাই হলো আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনার ব্যাপক অর্থ ও মর্ম।

হিদায়াতের রোডম্যাপ কুরআন

হিদায়াত প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া থেকে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, সত্যপথ পাওয়ার জন্য পথ প্রর্দশন বা হিদায়াত প্রয়োজন আছে। সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি রহস্যে গভীর চিন্তা করলে মানুষ হয়তো এতটুকু বুঝতে পারবে যে, এর পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন। কিন্তু সে স্রষ্টার পথ নিজেই খুঁজে পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সত্যপথ খুঁজে পাওয়ার মতো যথেষ্ট জ্ঞান-প্রজ্ঞা মানুষের নেই। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রয়োজন।

---

১৯২. শাইখুত তাফসীর ইদরীস কান্ধলভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৬

কুরআনের ভূমিকা সূরা ফাতিহায় এ হিদায়াতের প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছেঃ আমাদেরকে সোজা পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম এর হিদায়াত দাও।

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের প্রার্থনার জবাব দেন, প্রার্থনা কবুল করেন।[১৯৩] সুতরাং প্রশ্ন উঠে, আল্লাহ হিদায়াতের এ প্রার্থনার কি কোন জবাব দিয়েছেন? আর দিয়ে থাকলে তা কী? এ প্রশ্নের উত্তর হলো এই যে, আল্লাহ সত্যিই এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সূরা ফাতিহার পরের সূরা তথা সূরা বাকারার শুরুতেই বলা হয়েছে, এ কুরআনই হলো হিদায়াত, যাতে কোন সন্দেহ নেই; তবে তাকওয়ার মানসিকতা সহকারে তা পাঠ করলেই হিদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। এ মর্মেই বলা হয়েছে, আল্লাহর কিতাব কুরআন হলো "তাকওয়া অবলম্বন কারীদের জন্য হিদায়াত"[১৯৪]। তবে কুরআন শুধু তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্যই নয়, বরং সকলের জন্যই হিদায়াত[১৯৫]। সকল মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যেই কুরআন নাযিল হয়েছে। কিন্তু এ থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য তাকওয়া শর্ত।

কাজেই এ কুরআনের ভূমিকাতেই হিদায়াতের প্রার্থনা দিয়ে পাঠকের মানসিক প্রস্তুতি তথা তাকওয়ার মানসিকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। হিদায়াতের গ্রন্থ কুরআন পাঠ করার পূর্বেই মনের গভীরে হিদায়াতের কামনা ও বাসনা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরূপ কামনা ও বাসনা নিয়ে কুরআন পাঠ করলেই কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়া সম্ভব। এ মানসিক প্রস্তুতি ও কামনা ছাড়া যদি কেউ কুরআন পাঠ করে, সে হয়তো যুক্তি-তর্কের কষ্টিপাথরে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কুরআন প্রদর্শিত জীবন-ব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু হিদায়াত লাভ সম্ভব নাও হতে পারে।

সারকথা, কুরআন হলো হিদায়াত[১৯৬]। অর্থাৎ কুরআনে দেয়া জীবনাদর্শ ও রোডম্যাপ অনুসরণ করলেই দুনিয়া থেকে জান্নাতে ফিরে যাওয়া যাবে। আলোচ্য আয়াতে এ হিদায়াতের পথ তথা জীবনাদর্শের গুণবাচক নামকরণ করা হয়েছে 'সিরাতুল মুস্তাকীম'।

সিরাতুল মুস্তাকীম কি?

'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর সরল অর্থ 'সোজা পথ'। আর তা হলো সে পথ যাকে অনুসরণ করে দুনিয়াতে সুখী সুন্দর ও শান্তির জীবন যাপন করা যায়, এবং জীবন সায়াহ্নে দুনিয়া থেকে সরাসরি ও সোজা মানুষের গন্তব্যস্থল জান্নাতে পৌঁছা যায়।

---

১৯৩. আল কুরআন- ৪০ : ৬০।
১৯৪. আল কুরআন- ২:২।
১৯৫. আল কুরআন- ২:১৮৫।
১৯৬. আল কুরআন ১৭:৯।

'সিরাত' মানে পথ। আমরা জানি, কোন নির্দিষ্ট পথে চলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া যায়। যেমন রয়েছে সড়ক পথ, জনপথ, বিমান পথ ইত্যাদি। এখানে 'সিরাত' বলে 'পথ' বুঝানো হয়েছে রূপক অর্থে। পথ মানে জীবন পথ বা জীবনে চলার পথ। এ অর্থে পথ মানে জীবনাদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা, যাকে আরবীতে দীন (دين) বলা হয়।

আর মুস্তাকীম অর্থ সোজা, যাতে কোন বক্রতা নেই। সিরাতুল মুস্তাকীম মানে সোজা পথ, অর্থাৎ সোজা দীন (জীবন-ব্যবস্থা) যাতে কোন বক্রতা নেই, ভেজাল নেই, বা ভুল-ত্রুটি নেই। তা হলো এমন দীন, যা মানুষেকে নিষ্কলুষ নির্ভুল সত্য-সঠিক জীবন-ব্যবস্থা দেয়।

আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা (দীন) "ইসলাম" হলো সিরাতুল মুস্তাকীম, যার বর্ণনা কুরআনে আছে, আর যা বাস্তবায়ন করে রাসূলুল্লাহ (সা) "সুন্নাহ্" নামক "উস্ওয়ায়ে হাসানা" বা উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন, যা জীবনে বাস্ত বায়িত করলে গোটা জীবনটাই ইবাদতে পরিণত হয়। সুতরাং এ সবকয়টি অর্থেই 'সিরাতুল মুস্তাকীম' ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কুরআন, দীন ইসলাম, রাসূলের আদর্শ, আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ইবাদত, এগুলোর প্রতিটির বেলায়ই 'সিরাতুল মুস্তাকীম' পরিভাষাটি প্রযোজ্য। আসলে এ সবকিছুর সারকথা একই। তবু যেহেতু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসব বিষয়ের মাধ্যমে সিরাতুল মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, সেহেতু এখানে সে প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্তভাবে আলাদা আলাদা বর্ণনা দেয়া হলো।

দীন ইসলামই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম

ইসলামই আল্লাহর দেয়া দীন বা জীবন-ব্যবস্থা। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত "সিরাত" বা পথ। আর আল্লাহর পথ ইসলামই সিরাতুল মুস্তাকীম। আল্লাহ বলেন :

(১) قُلْ إِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا-

(২) إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ -

(৩) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ -

(৪) فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُّرِدْ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ-

(১) "বলো, আমার প্রতিপালক আমাকে সোজা পথের (সিরাতুল মুস্তাকীমের) হিদায়াত দান করেছেন, যা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দীন।"[১৯৭]

(২) "নিঃসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন (জীবন-ব্যবস্থা)।"[১৯৮]

(৩) "আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।"[১৯৯]

(৪) "আল্লাহ কাউকে হিদায়াত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আর কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষকে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, যার জন্য (ইসলাম অনুসরণ) আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ এভাবেই লাঞ্ছিত করেন। এটাই তোমার প্রতিপালকের পথ, সিরাতুল মুস্তাকীম। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য আমি নিদর্শনসমূহকে বিশদভাবে বিবৃত করেছি।"[২০০]

প্রথম আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহর দেয়া দীন বা জীবন-ব্যবস্থাই সিরাতুল মুস্তাকীম। দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামই আল্লাহর দেয়া দীন। অর্থাৎ ইসলামই সিরাতুল মুস্তাকীম। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। চতুর্থ আয়াতে আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইসলামই সিরাতুল মুস্তাকীম, আর সেহেতু আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তাকে ইসলামের উপর দৃঢ়পদ রাখেন। সারকথা, ইসলামই সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ। ইসলাম ব্যতীত অন্য সবই বাতিল বা বক্র পথ, এবং তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। হিদায়াত পেতে হলে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে হবে।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা বা সোজা পথ একটাই হয়। তেমনি এ দুনিয়া থেকে বেহেশ্‌তে পৌঁছার সোজা বা সরল পথ একটাই হতে পারে। যদি রেখাটি সরল বা সোজা না হয় তা হলে তা লক্ষ্যবিন্দু বা গন্তব্যস্থলে না পৌঁছে অন্য কোথাও গিয়ে পৌঁছবে। তেমনি দুনিয়া থেকে আখিরাতের বেহেশতে পৌঁছতে হলে সোজা পথ একটাই, তা হলো ইসলাম।

---

১৯৭. আল-কুরআন ৬ : ১৬১।
১৯৮. আল কুরআন ৩:১৯।
১৯৯. আল-কুরআন ৩ : ৮৫।
২০০. আল-কুরআন ৬ : ১২৫-১২৬।

বলাবাহুল্য, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি পর্যায় ও ক্ষেত্র সম্পর্কে বিধি-বিধান, মূলনীতি ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এ সবগুলোই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান হওয়ার জন্য এ পূর্ণাঙ্গ ইসলামে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। বলা হয়েছে, 'তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করো[২০১]।' পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা মানে হলো নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করে দেয়া, আল্লাহতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, এবং আল্লাহর খাঁটি বান্দা হয়ে যাওয়া।

বলাবাহুল্য, সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজাপথ ছাড়াও দুনিয়াতে অনেক বক্রপথ বা বাতিল দীন আছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই শয়তান আল্লাহকে বলেছিল :

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ-

"সে (শয়তান) বললো, তুমি আমাকে (মানুষের জন্য) শাস্তি দিলে, এজন্য আমি তোমার (দেয়া) সিরাতুল মুস্তাকীমে তাদের (মানুষের) জন্য ওত পেতে বসে থাকবো।"[২০২]

শয়তান মানুষকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে গযবে পতিত হয়। কিন্তু সে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ নিয়ে আল্লাহর পথ সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে ভুল পথে চালানোর প্রত্যয় ঘোষণা করে। এসব পথ হলো বাতিল পথ। ইসলাম ব্যতীত এ ধরনের সকল পথই বক্রপথ, ভ্রান্তপথ এবং শয়তানের পথ।

সুতরাং সূরা ফাতিহায় সিরাতুল মুস্তাকীমে হিদায়াত প্রার্থনার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে সকল বক্র ও বাতিল পথ তথা শয়তানের পথ থেকে রক্ষা করে সিরাতুল মুস্তাকীম তথা দীন ইসলামের হিদায়াত দাও এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

কুরআন হলো সিরাতুল মুস্তাকীম

আয়াতে যে সিরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াতের প্রার্থনা রয়েছে, কুরআনই হলো সে হিদায়াত। সূরা ফাতিহায় হিদায়াতের দু'আর পর সূরা বাকারার প্রথমেই আল্লাহ সে দু'আর জবাব দিয়ে বলেছেন যে, এ কুরআনই হিদায়াত।

الٓمٓ -ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

২০১. আল কুরআন ২:২০৮।
২০২. আল-কুরআন ৭ : ১৬।

أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"আলিফ-লাম-মীম। এটি হলো সে কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, যা হলো মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত। যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। আর (ঈমান আনে) তার উপর যা তোমার উপর নাযিল হয়েছে, এবং তার উপর যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছে, আর যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে হিদায়াতের উপর আছে। আর তারাই সফলকাম।"[২০৩]

এখানে কারা হিদায়াত-প্রাপ্ত বা কারা সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর আছে তাদের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলে দেয়া হয়েছে হিদায়াত কি, বা সিরাতুল মুস্তাকীম কি। কুরআনই হিদায়াত, কুরআনই সিরাতুল মুস্তাকীম। তবে এ কুরআন থেকে তারাই উপকৃত হবে যাদের মধ্যে তাকওয়া বা ইতিবাচক মানসিকতা আছে। যারা না দেখেই আল্লাহ, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে, আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান রাখে, সে অনুযায়ী আমল করে, তারাই হিদায়াতের উপর তথা সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর আছে। তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।

সূরা বাকারার উল্লেখিত আয়াতে (আয়াত-২) কুরআনকে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য হিদায়াত বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন শুধু তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্যই নয়, বরং সকল মানুষের জন্যই হিদায়াত। এরশাদ হচ্ছে,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضاً أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যের পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"[২০৪]

এ আয়াতের মর্ম হলো এই যে, সকল মানুষের হিদায়াতের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যেই

---

২০৩. আল-কুরআন ২ : ১-৫।
২০৪. আল কুরআন ২:১৮৫।

কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তবে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। তা হলো এই যে, কুরআন সকল মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল হলেও শুধু তারাই এ থেকে হিদায়াত পাবে, যাদের মধ্যে তাকওয়া আছে, বা তাকওয়ার ইতিবাচক মানসিকতা আছে।

অর্থাৎ কুরআনেই সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথের হিদায়াত রয়েছে। কুরআনেই সে পথের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কুরআনই গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য স্পষ্ট রোডম্যাপ প্রদান করে। কুরআনে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রের সকল পর্যায়ের বিধি-বিধান, মূলনীতি ও পথনির্দেশ রয়েছে। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনসহ মানব জীবনের সকল পর্যায় অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিচার-ব্যবস্থাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম দিয়েছে কল্যাণময় ব্যবস্থা।[২০৫] তা অনুসরণ করলে দুনিয়াতেও সুখী সুন্দর শান্তির জীবন লাভ হবে, আর সে পথ অসুসরণ করে আমরা গন্তব্যস্থল বেহেশ্‌তে পৌঁছতে পারবো। সুতরাং কুরআন সিরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াত দেয়, সোজা পথ দেখায়।[২০৬] এজন্যই বলা হয়েছে,

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ-

"নিঃসন্দেহে এ কুরআন সেই পথের হিদায়াত দান করে যা সবচেয়ে সোজা ও সুদৃঢ়।"[২০৭]

রাসূলের আদর্শ হলো 'সিরাতুল মুস্তাকীম'

কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথের বর্ণনা দিয়েই আল্লাহ ক্ষান্ত হননি। বরং পথের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সে পথে চলার বাস্তব মহড়া দেয়ার জন্য এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্তে তিনি পাঠিয়েছেন একজন পারদর্শী নেতা। তিনি হলেন আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)। পূর্বেই উল্লেখ্য করা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাবার মুহূর্তেই ঘোষণা করেছেন, এ নশ্বর পৃথিবীতে যারা আল্লাহর প্রেরিত হিদায়াত গ্রহণ করে সোজা পথে চলবে, তারা আবার বেহেশতে ফিরে যেতে পারবে।

---

২০৫. শুধু তাই নয়। কুরআনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক জ্ঞানেরও ইঙ্গিত রয়েছে, যা অনুসরণ করে অনেক নতুন উদ্ভাবন হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, Scientific Indications in the Holy Quran (prepared by a group of researchers), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

২০৬. শুধু কুরআনই নয়, আগের উম্মতগণের জন্য তাওরাত, ইন্‌জিলসহ আল্লাহর অন্যান্য কিতাব এসেছিল তৎকালীন মানুষের হিদায়াতের জন্য। দেখুন আল-কুরআন ৩ : ৪; ৫ : ৪৬; ৬ :৯১।

২০৭. আল-কুরআন ১৭ : ৯।

আল্লাহর নিকট থেকে মানুষের নিকট এ হিদায়াত প্রেরণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হলো রিসালাত। আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য হিদায়াত ও দীনে হক বা সিরাতুল মুস্তাকীম দিয়ে রাসূল পাঠান।

(১) يس - وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

(২) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

(১) "ইয়াসীন। জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রেরিত রাসূলের অন্যতম। তুমি সিরাতুল মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত।"[২০৮]

(২) "সুতরাং তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। নিঃসন্দেহে তুমি সিরাতুল মুস্তাকীমে রয়েছ।"[২০৯]

এখানে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করছেন, শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রাসূলের আদর্শই সিরাতুল মুস্তাকীম। কিন্তু রাসূলের আদর্শ কি? কি জন্য দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণের আগমন? এক কথায় তাঁদের কাজ হলো আল্লাহর দীনের বাস্তবায়ন করা। রাসূলের এ কাজকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-দর্শন পৃথিবীতে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়, আল্লাহ প্রদত্ত জীবনাদর্শ অনুযায়ী আমল করে তার বাস্তব রূপায়ণ করা। তৃতীয়, সমগ্র মানবতাকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেয়া এবং গোটা বিশ্বে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। বস্তুত প্রথম ও দ্বিতীয় কাজ হলো সকল রাসূলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আর তৃতীয় কাজটি হলো রাসূলের প্রধান কাজ ও দায়িত্ব।

এবার রাসূলের আদর্শ ও কাজের প্রথম বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়, উপরে কুরআন থেকে উদ্ধৃত দুটি আয়াতেই মহানবীর সিরাতুল মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে কুরআনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে কুরআনের শপথের মাধ্যমে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে. কুরআনে প্রদত্ত জীবন-বিধান ও আদর্শের মাপকাঠিতে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নাযিলকৃত ওহী তথা কুরআনকে অবলম্বন করার প্রেক্ষিতেই নবী (সা) সিরাতুল মুস্তাকীমে বিদ্যমান।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো কুরাআনের বাস্তব রূপায়ণ। এর উপায় হলো কুরআনের বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা এবং সে অনুযায়ী আমল। নিজ কর্ম, ব্যাখ্যা ও অনুমোদনের মাধ্যমে রাসূল (সা) এ কাজটি করেছেন। এগুলোকে একত্রে

---

২০৮. আল-কুরআন ৩৬ : ২-৪।

২০৯. আল-কুরআন ৪৩ : ৪৩।

সুন্নাহ বা রাসূলের আদর্শ বলা হয়।

রাসূলগণের মৌলিক বৈশিষ্ট হলো আল্লাহর কিতাব আনয়ন এবং আমল ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার বাস্তব রূপায়ণ। আর রাসূলের প্রধান দায়িত্ব ও কাজ হলো আল্লাহর এ জীবন-বিধানকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। সকল বাতিলকে পরাভূত করে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ -

"তিনিই (মহান আল্লাহ) যিনি হিদায়াত ও দীনে হক (সত্য-সঠিক জীবন-ব্যবস্থা) সহকারে তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন যেনো সে এ জীবন-ব্যবস্থাকে সকল জীবন-ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে।"[২১০]

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার দুটি দিক আছে। এক, বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থাৎ যৌক্তিকভাবে ইসলামী আদর্শকে অন্যান্য সকল বাতিল মতবাদের উপর বিজয়ী করে দেয়া। দুই, মানব সমাজের প্রতিটি পর্যায় ও ক্ষেত্রে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এর মাধ্যম হলো মানুষকে সত্য দীন বা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া। সুতরাং রাসূলের মৌলিক ও প্রধান কাজই হলো মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া। এ বিষয়টির ঘোষণা দেয়ার জন্যই আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা)- কে নির্দেশ দিয়েছেন।

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ -

"বলো এটাই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিই সজ্ঞানে, আমি ও আমার অনুসারীগণও।"[২১১]

সুতরাং নবী ও রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দেয়াকেই তাঁদের প্রধান কাজ বলে বিবেচনা করেছেন এবং সে ঘোষণাই দিয়েছেন।

إِلَيْهِ أَدْعُوْ وَإِلَيْهِ مَآبِ -

"আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দিই এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।"[২১২]

সুতরাং নবীগণের প্রধান কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দেয়া, পবিত্র করা, সুপথে নিয়ে আসা এবং বাতিল মতবাদ ও ধর্মাবলীর উপর

---

২১০. আল-কুরআন ৯ : ৩৩।
২১১. আল-কুরআন ১২ : ১০৮।
২১২. আল-কুরআন ১৩ : ৩৬।
২১৩. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, আল-কুরআন ১৬ : ১২৫; ২২ : ৬৭; ২৮ : ৮৭; ২ : ১৫১; ২ : ১২৯; ৩ : ১৬৪; ৬২ : ২; ৯ : ৩৩; ৬১ : ৯ ।

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা। কুরআনে রাসূলের এ দায়িত্বের কথা বিভিন্নভাবে বার বার উল্লেখিত হয়েছে।[২১৩]

শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোন নবী আসবেন না। সুতরাং তাঁর ইন্তিকালের পর এ দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর বর্তায়। আসলে নবীদের এ দায়িত্ব পালনের জন্যই শেষ নবীর উম্মতকে 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ-

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের (কল্যাণের) জন্য, তোমরা সৎকাজের উপদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।"[২১৪]

সারকথা, সূরা ফাতিহায় আমরা আল্লাহর নিকট যে হিদায়াত চাই, সে হিদায়াত রয়েছে রাসূলের আদর্শে। রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করলেই হিদায়াত পাওয়া যায়। আর রাসূলের আদর্শের মর্ম হলো কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করা, সে মতে জীবন পরিচালনা করা, মানুষকে সেদিকে দাওয়াত দেয়া এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন করা। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হলো এ কাজ করা এবং এর জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। প্রয়োজনে এর জন্য ধনসম্পদ জীবন সবকিছুই বিলিয়ে দেয়া। এ মর্মে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ রয়েছে।[২১৫] এমনকি বলা হয়েছে,আল্লাহর পথে কাজ করার জন্য মুমিনদের জান ও মালকে আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।[২১৬] এটাই হলো মহানবীর আদর্শ। মহানবীর এ আদর্শকে মানুষের জন্য অনুকরণীয় ও উত্তম আদর্শ বলা হয়েছে,[২১৭] যা অনুসরণ করে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থল জান্নাতে যাওয়া যায়।

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী-ঝর্ণা প্রবাহিত; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে; এটি হলো মহাসাফল্য।"[২১৮]

---

২১৪. আল-কুরআন ৩ : ১১০।
২১৫. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, আল-কুরআন ২ : ২১৮; ৩ : ১৪২; ৮ : ৭২; ৮ : ৭৪; ৯ : ১৬; ৯ : ৮৮; ৪৯ : ১৫; ৬১ : ১১; ২৯ : ৬; ৯ : ৭৩; ৬৬ : ৯; ৫ : ৩৫; ২২ : ৭৮।
২১৬. আল-কুরআন ৯ : ১১১।
২১৭. আল-কুরআন ৩৩ : ২১।
২১৮. আল-কুরআন ৪: ১৩।

সুতরাং আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনার জবাব রয়েছে রাসূলের আদর্শের মধ্যে। হিদায়াত চাইলে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। সে আদর্শই ইসলাম। সে আদর্শই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ, যার বর্ণনা রয়েছে কুরআনে।

আল্লাহর ইবাদত হলো সিরাতুল মুস্তাকীম

পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে সে অনুযায়ী আমল। আমল দু'প্রকার: নামায-রোযাসহ আনুষ্ঠানিক ইবাদত; [২১৯] এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্র ও পর্যায়ে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্র ও পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসন তথা আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা মেনে চলাই আসল ইবাদত। আর সে ইবাদতের জন্যই মানুষের সৃষ্টি। মানুষ যদি আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান অনুযায়ী জীবনের সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়ের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, তা হলে তার গোটা জীবনটাই ইবাদতে পরিণত হবে। সে কোন খারাপ কাজ করবে না, সর্বদা সর্বত্র ভালো কাজ করবে। সর্বদা আল্লাহর অনুমোদিত পথে চলবে। এটাই প্রকৃত ইবাদত, আর এটাই সোজা পথ। এ ইবাদত বা পূর্ণ ইসলামের সোজা পথে চলেই পৃথিবীর জীবনে মঙ্গল ও কল্যাণ (حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا) লাভ করা যাবে, আর এ সোজা পথ ধরেই বেহেশতের গন্তব্যস্থলে গিয়ে আখিরাতের কল্যাণ (حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ) লাভ করা যাবে। এরূপ ইবাদতকে আল্লাহ 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলে ঘোষণা করেছেন।

(১) إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

(২) وَأَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

(১) "নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার রব (প্রতিপালক) এবং তোমাদের রব, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম।"[২২০]

---

২১৯. নামায-রোযা-যাকাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদত মানবজীবনে সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি নিয়ে আসে। এসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার বইপত্র আছে। উদাহরণ স্বরূপ, নামায সম্পর্কে দেখুন, আবদুল খালেক, নামায, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১। যাকাত কীভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে, সে সংক্রান্ত সাহিত্যের একটি জরিপের জন্য দেখুন, Abul hasan M. Sadeq, A Survey of the Institution of Zakah: Issues Theories and Administration, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1994.

২২০. আল-কুরআন ৩ : ৫১।

(২) "আর তোমরা আমার ইবাদত করো, এটাই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ।"[২২১]

এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর ইবাদতই সিরাতুল মুস্তাকীম। সারকথা, জীবনকে ইবাদতে পরিণত করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সাথে ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়ে ইসলামী জীবনাদর্শ ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। তখনই গোটা জীবন হবে ইবাদতময়। এরূপ ইবাদতই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসেবে নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদতই সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথে দৃঢ়পদ থাকার প্রমাণ।

হিদায়াত বা সোজা পথ পাওয়ার শর্ত

পৃথিবীতে বহু মূল্যবান মণি-মুক্তা হীরা-জহরত আছে। অনেকেই তা চায়, কিন্তু সবাই তো তা পায় না। তা পাওয়ার জন্য যথার্থ যোগ্যতা, দক্ষতা, চেষ্টা ও সাধনা থাকতে হবে। এগুলো হলো তা পাওয়ার শর্ত। তেমনিভাবে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ বর্তমান থাকলেই সবাই তা পাবে না। তা পাওয়ার জন্য শর্ত আছে। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

প্রথম, ইতিবাচক মানসিকতা সহকারে সত্য অনুসন্ধান করা। সে মানসিকতা হলো সত্যকে পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা, এবং সত্যকে পাওয়ার পর তা গ্রহণ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বাতিলের পরিণাম সম্পর্কে ভীত হয়ে নিষ্ঠা সহকারে তা থেকে আত্মরক্ষা করার সংকল্প, আর হক ও সত্যের অনুসরণ করার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি, যাকে ইসলামী পরিভাষায় "তাক্ওয়া" বলা হয়। এ অর্থেই বলা হয়েছে, কুরআন হলো তাক্ওয়ার অধিকারীদের জন্য হিদায়াত।[২২২] তাকওয়ার মানসিকতা না হলে কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়া যাবে না। ইতিহাস সাক্ষী, অনেক জ্ঞানী, গুণী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত পথের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তা থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারেন নি। কারণ সত্যপথ পেয়ে তা অবলম্বনের প্রবল বাসনা ও তাড়না সেখানে অনুপস্থিত ছিল।

দ্বিতীয়, তাক্ওয়ার মানসিকতা সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। অর্থাৎ হিদায়াত পাওয়ার প্রবল কামনা এবং সত্যপথ লাভের চরম আকাঙ্খা নিয়ে কুরআন পাঠ করতে হবে। কুরআন পাঠ ও পর্যালোচনা করে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এর বক্তব্য ও আদর্শের যথার্থ উপলব্ধিই হিদায়াত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং তাকে গ্রহণ করতে হবে, যাতে সত্যপথের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

---

২২১. আল-কুরআন ৩৬ : ৬১ ।
২২২. আল-কুরআন ২:২।

সারকথা, হিদায়াত পেতে হলে তাক্ওয়ার মানসিকতা সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে এবং নিষ্ঠার সাথে তা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে। এরশাদ হচ্ছে :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هَـؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَّرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ـ

"আমি আপনার প্রতি এ কুরআন নাযিল করেছি, যা সকল বিষয়ের সঠিক বর্ণনাকারী, মুসলমানদের জন্য হিদায়েত, রহমত এবং সুসংবাদবাহী।"[২২৩]

তৃতীয়, হিদায়াত পেতে হলে রাসূলের আদর্শ বা সুন্নাহকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাসূলের ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআনের নির্দেশ পালন সম্ভব নয়। যেমন কুরআনে নামায ও রোযার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে সুন্নাহতে। তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে, রাসূল (সা) নিজ থেকে কোন কথা বলেননি। তিনি যা বলেছেন, ওহীর মাধ্যমেই বলেছেন। [২২৪]

সুতরাং কুরআনের হিদায়াত অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে রাসূলের আনুগত্য তথা সুন্নাহকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,"(হে নবী, তাদের) বলে দাও, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। যদি তারা (এই দাওয়াত গ্রহণ না করে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে (জেনে রেখো যে,) আল্লাহ নিঃসন্দেহে কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।"[২২৫]

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ (প্রেরণ করেছেন, যেনো তিনি এ দীনকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"[২২৬] (হে নবী, তাদের) বলে দাও, "তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং আত্মরক্ষা করো, কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও তবে জেনে রাখ আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রচার করা।"[২২৭]

"যে রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমি তোমাকে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি।"[২২৮]

---

২২৩. আল-কুরআন ১৬:৮৯।
২২৪. আল-কুরআন ৫৩:৪।
২২৫. আল-কুরআন ৩: ৩২।
২২৬. আল-কুরআন ৯:৩৩।
২২৭. আল-কুরআন ৫ :৯২।
২২৮. আল-কুরআন ৪:৮০।

চতুর্থ, হিদায়াতের ইচ্ছা ও জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বরং তা অনুসরণের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। যদি হিদায়াতের পথে চলার ইচছা ও প্রচেষ্টা থাকে, তা হলে আল্লাহ সে পথে চলাকে সহজ করে দেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

"আর যারা আমার পথে জিহাদ করে (প্রচেষ্টা চালায়) তাদেরকে অবশ্যি আমার পথের হিদায়াত দেবো।"[২২৯]

হিদায়াত পাওয়ার জন্য 'জিহাদ' শর্ত। জিহাদের অর্থ হলো সত্যপথ অনুসন্ধান, গ্রহণ ও অনুসরণের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য জান ও মালের বিনিময়ে হলেও সকল প্রকার চেষ্টা করা। কারণ, কুরআন ও রাসূলের আদর্শ সম্বলিত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা যুক্তিতর্কের কষ্টি পাথরে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হওয়া এবং তার উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও যদি তার জন্য প্রচেষ্টা না থাকে, তা হলে সে সত্যের অনুসরণ সম্ভব হবে না। হিদায়াত পাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং সত্যপথের যৌক্তিক উপলব্ধি এবং আত্মিক বিশ্বাস ও ঈমানের সাথে সাথে তা অর্জন ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এটাই সত্যপথে জিহাদ। তা থাকলেই আল্লাহ সত্যপথের হিদায়াত দেবেন এবং তখনই সিরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াত পাওয়া যাবে।

হিদায়াত প্রার্থনা কেন প্রয়োজন

এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে একটা প্রশ্ন নিয়ে খানিকটা চিন্তা করা যেতে পারে। তা হলো এই যে, আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি? আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞানের দ্বারাই ফেরেশতা ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে।[২৩০] সুতরাং এ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষকে হিদায়াত দানের প্রয়োজন আছে কি? এছাড়া আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন: মানুষ যদি সৃষ্টি রহস্য চিন্তা করে, তা হলে বলতে বাধ্য হবে যে, 'হে আল্লাহ, তুমি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি।' আল্লাহর এ বক্তব্য থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, মানুষ চিন্তার মাধ্যমে নিজ জ্ঞানেই সত্যপথ খুঁজে নিতে পারবে। যদি তা-ই হয়, তবে হিদায়াত প্রার্থনার কি প্রয়োজন? কেনই বা হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে?

এ প্রশ্নের একটি সহজ জবাব এই যে, মানুষকে দেয়া জ্ঞান হলো আপেক্ষিক

---

২২৯. আল-কুরআন ৫৩ : ৩৪।

২৩০. ফেরেশতারা যখন নিজকে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভেবে মানব সৃষ্টির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, তখন আল্লাহ জ্ঞানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। দেখুন, আল-কুরআন ২ : ৩০-৩৩।

ও সীমিত। সত্য ও সোজা পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান নিতান্ত কম ও অপ্রতুল। আল্লাহর যে সীমাহীন জ্ঞান আছে, যে অসীম জ্ঞানের বলে আল্লাহ ভালোভাবে জানেন মানুষের জন্য কোনটি মঙ্গল আর কোনটি অমঙ্গল, তা উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান মানুষের নেই। আল্লাহ বলেন :

(১) وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا -

(২) وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَآءَ -

(১) "আর তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"[২৩১]

(২) "তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।"[২৩২]

জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই মানুষ একবার যে মতবাদ দেয়, পরে তার ভুল ধরা পড়ে। এভাবে মানব রচিত মতবাদগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা মানুষের নিকটই ধরা পড়ে। ফলে সে আবার অন্য মতবাদ দেয়। আবার তারও অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়। এভাবে ভুলের পর ভুল চলতেই থাকে।

এক সময় মানব রচিত মতবাদ পুঁজিবাদকেই শ্রেষ্ঠ মতবাদ বলে মনে করা হতো। পুঁজিবাদের শোষণ ও করুণ পরিণামের ফলে মানবতার মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্র নামক আরেকটি মানব রচিত মতবাদের সৃষ্টি হলো। কিন্তু তা মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। এ হলো বসন্ত রোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কলেরা রোগে আশ্রয় নেয়ার মতো। অথবা এ যেনো প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ঝাপিয়ে পড়ার মতো। সুতরাং বিশ্বের মানুষ সমাজতন্ত্রকে ত্যাগ করেছে, কারণ তা কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দিতে পারেনি। কিন্তু মুক্তি কোথায়? প্রকৃতপক্ষে মুক্তি হলো সে আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থায়, যিনি ভালোভাবে জানেন কিসে রয়েছে মানুষের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ আর কিসে আছে অমঙ্গল ও অকল্যাণ।

মানুষের 'স্রষ্টা' আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানে মানুষের কল্যাণের উপযোগী যে জীবন-বিধান দিতে পারেন, তা নিজ থেকে বের করা বা উদ্ভাবন করার মতো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মানুষের নেই। তার পক্ষে শত ভ্রান্ত মতবাদের আগাছার ভিতর থেকে সত্যপথকে খুঁজে নেয়া সম্ভব নয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই প্রথম মানবকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় আল্লাহ বলেছিলেন, যারা দুনিয়াতে আমার প্রেরিত হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই।[২৩৩] তারা আবার বেহেশতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে নির্ভয়ে ও

২৩১. আল-কুরআন ১৭ : ৮৫।
২৩২. আল-কুরআন ২ : ২৫৫।
২৩৩. আল-কুরআন ২ : ৩৮।

নিশ্চিন্তে। অর্থাৎ সোজা পথ পাওয়ার জন্য আল্লাহর হিদায়াত প্রয়োজন হবে। এ হিদায়াত রয়েছে কুরআনের মধ্যে,[২৩৪] আর সেহেতু কুরআন পাঠের প্রথমেই হিদায়াতের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এবং হিদায়াতের তৌফিক লাভের লক্ষ্যে সূরা ফাতিহায় আল্লাহর নিকট হিদায়াতের প্রার্থনা রয়েছে।[২৩৫] এজন্যই হিদায়াতের প্রার্থনা প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন, কোন কারণে কারো নিকট যদি হিদায়াত না পৌঁছে, তা হলে তার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান অবগত হওয়া কীভাবে সম্ভব? তার পক্ষে আল্লাহকে চেনা এবং আল্লাহর দীনের অনুসরণ করা যরূরী কিনা? এর জবাব হলো এই যে, মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা যতোটুকু উপলব্ধি ও অনুধাবন করা সম্ভব, তার জন্য ততোটুকু কর্তব্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়েছেন, তা দিয়ে সৃষ্টিরহস্য চিন্তাভাবনা করা সম্ভব। যখন যেখানে যেভাবে যা প্রয়োজন, তা সঠিক ভারসাম্য অনুযায়ী তৈরি করা কোন সুনিপুণ স্রষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর সবকিছুতে এমন বৈজ্ঞানিক সুসম্পর্ক, ভারসাম্য ও কার্যকারণ-কার্যফলমূলক সতঃসিদ্ধ বিধি বর্তমান রয়েছে যে, তা গাণিতিক ফর্মুলার মতো মিলে যায়। এখন থেকে একশত বছর পর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে কোন একটা বিশেষ নক্ষত্র কোথায় কোন অবস্থানে থাকবে, তা গাণিতিকভাবে হিসাব করে বলা যায়। সৌরগজতের আকর্ষণ-বিকর্ষণে গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে এমনভাবে আবর্তন করছে যে, এক বিন্দু পরিমাণ ভারসাম্য নষ্ট হলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সৃষ্টির প্রতিটি ব্যাপারে চিন্তা করলে মানুষের বিবেক এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবে যে, এ সৃষ্টিজগত এমনিতে হয়ে যায়নি, বরং এর পেছনে অবশ্যই কোন স্রষ্টা আছেন, ব্যবস্থাপক আছেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, যারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে, তারা বলে, হে আমাদের রব (প্রতিপালক), তুমি একে অনর্থক সৃষ্টি করোনি।"[২৩৬]

এখান থেকে বুঝা যায়, মানুষকে আল্লাহ যতোটুকু জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি হওয়া কর্তব্য। এজন্য আবু হানিফা (রহ) বলেন, কারো নিকট হিদায়াত না পৌঁছলেও নাজাতের জন্য তার নিজ জ্ঞান-প্রজ্ঞা দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদে বিশ্বাস অবশ্যকর্তব্য। তাছাড়া সে নাজাত পাবে না।[২৩৭] তবে বিস্তারিত ইসলামী জীবন-বিধান অনুসরণ করা এবং জীবনে চলার পথে

---

২৩৪. আল-কুরআন ২ : ২।
২৩৫. আল-কুরআন ১ : ৬।
২৩৬. আল-কুরআন ৩ : ১৯১।
২৩৭. হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী, তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআন, দিল্লি, ভারত, ফরিদ বুক ডিপো, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ২০১২।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য তার জন্য জরুরী নয়। কারণ বিস্তারিত জানা ও বুঝা হিদায়াত ব্যতীত নিজ জ্ঞানে সম্ভব নয়।[২৩৮] উল্লেখযোগ্য, এ কথা শুধু তাদের জন্য প্রযোজ্য, যাদের নিকট হিদায়াত পৌঁছেনি কিন্তু সমাজের কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই আজ আর এ কথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, তার নিকট হিদায়াত পৌছেনি। কারণ, সর্বত্র সকল ভাষায় কুরআন হাদিস পাওয়া যায়, সকল স্থানেই ইসলামের বাণী পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ হিদায়াতের বাণী সকলের নিকটই পৌঁছে গেছে। এখন সকলের কর্তব্য তা গ্রহণ করা, নিকটই পৌঁছে গেছে। এখন সকলের কর্তব্য তা গ্রহণ করা, আমল করা, আর হিদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা।

এখানে কারো মনে একটা প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে, "যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত, তারা কেন আবার হিদায়াতের প্রার্থনা করবে?" প্রশ্নটির আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক। যারা কুরআন ও রাসূল প্রদর্শিত হিদায়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে তারা নিঃসন্দেহে হিদায়াত প্রাপ্ত। তারা যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে এবং বিশেষ করে, প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন বার বার আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করে। এ যেনো হিদায়াত প্রাপ্তদের জন্য আবার হিদায়াত প্রার্থনা, অথবা "অর্জিত বস্তুর অর্জন," যা তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব। সোজা কথায়, যারা হিদায়াতের উপরই আছে, যারা পূর্ব থেকেই অথবা ইতোমধ্যেই হিদায়াত প্রাপ্ত, তাদের জন্য আবার হিদায়াত প্রার্থনা অনর্থক নয় কি? যদি অনর্থক না হয়, তা হলে হিদায়াত প্রার্থনার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, হিদায়াতপ্রাপ্ত মুসলমানদের বেলায়ও হিদায়াত প্রার্থনা অনর্থক নয়, বরং এরও যুক্তিসঙ্গত অর্থ আছে। বিষয়টির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি ও ব্যাখ্যা রয়েছে।

প্রথম, ঈমানদার ও নেক্কার মুসলমানরা বর্তমানে হিদায়াতের উপর আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের বেলায় হিদায়াত প্রার্থনা হলো ব্যাপক অর্থে হিদায়াতে স্থিতিশীল থাকার কামনা ও দু'আ, যেনো আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াতের উপর দৃঢ়পদ রাখেন, যেনো হিদায়াতে কোন বিচ্যুতি না আসে, যেনো আল্লাহ শেষ পর্যন্ত হিদায়াতের উপর পরিচালিত করে তাদেরকে বেহেশতের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেন। এ অর্থেই হিদায়াতের উপর দৃঢ় থাকার জন্য আরো দু'আ রয়েছে। যেমন–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا-

---

২৩৮. আর এজন্যই আল্লাহ হিদায়াত দিয়ে রাসূল পাঠিয়েছেন (আল কুরআন ৯ : ৩৩); আর হিদায়াত স্বরূপ কুরআন পাঠিয়েছেন (আল-কুরআন ২ : ২); এবং প্রেরিত হিদায়াতের অনুসরণ করতে বলেছেন (আল কুরআন ২ : ৩৮)।

"হে আমাদের প্রতিপালক, হিদায়াতের পর আমাদের অন্তঃকরণে বক্রতা দিওনা।"[২৩৯]

এ অর্থে হিদায়াত প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো হিদায়াতের উপর স্থিতিশীল ও দৃঢ় থাকার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা।

দ্বিতীয়, মুসলমানদের হিদায়াত প্রর্থনার উদ্দেশ্য হলো পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পালনের তাওফীক চাওয়া। অনেকের ঈমান পূর্ণ নয়।
কেউ কেউ ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ইবাদত যথা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি মান্য করে, কিন্তু কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য সামাজিক ও সামষ্টিক বিধি-বিধানকে গ্রাহ্য করে না। তাদের ঈমান পূর্ণ নয়। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেনঃ

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ-

"তোমরা কি আল্লাহর কিতাব (কুরআন)-এর কিছু অংশের উপর ঈমান আনবে, আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে?"[২৪০]

সুতরাং আল্লাহ এমন আংশিক ঈমানদারদেরকে পূর্ণাঙ্গ ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়েছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا-

"তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ঈমান আনো।"[২৪১]

এক্ষেত্রে ঈমান প্রার্থনার অর্থ হলো পূর্ণ ঈমানের তৌফিক প্রার্থনা।

তৃতীয়, পরিধি ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে ঈমানের আওতা পূর্ণাঙ্গ হলেও ঈমানের গুণগত মানের পার্থক্য থাকতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে যে, জ্বলন্ত অগ্নিতে হাত রাখলে হাত পুড়ে যাবে, তবে কোন মতেই সে তাতে হাত দেবে না। তেমনি কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে যে, মন্দ কাজ করলে দোযখে তীব্র তাপের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে, সে কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। কোন সাধারণ মুসলমানের মধ্যে দৃশ্যমান আগুনের দাহশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেও অদৃশ্য দোযখের আগুনের বিশ্বাস ততো দৃঢ় না-ও হতে পারে। এমন কারণেই মূসা (আ)ও আল্লাহর প্রতি দৃশ্যমান দৃঢ় বিশ্বাস লাভের জন্য আল্লাহকে তাঁর দর্শন দানের অনুরোধ করেছিলেন, যদিও আল্লাহতে তাঁর অবিশ্বাস ছিল না। সারকথা, ঈমানের বিভিন্ন মাত্রা আছে,

---

২৩৯. আল-কুরআন ৩ : ৮।
২৪০. আল-কুরআন ২ : ৮৫।
২৪১. আল-কুরআন ৪ : ১৩৬।

এবং ঈমান বাড়ে ও কমে।[২৪২] এ প্রেক্ষিতে হিদায়াত প্রার্থনার অর্থ হবে হিদায়াতের মাত্রা বৃদ্ধি। অর্থাৎ ঈমান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকট দু'য়া।[২৪৩]

চতুর্থ, হিদায়াত প্রার্থনার অর্থ হলো ঈমান অনুযায়ী আমলের তৌফিক প্রার্থনা। ঈমানের বহিঃপ্রকাশ হলো ইসলামী জীবন-বিধান অনুসরণ করা অর্থাৎ আমল ও কর্মে ঈমানের রূপায়ণ। অনেকের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হলেও আমলে তাদের ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন, কেউ কেউ গোটা কুরআনকে মেনে নিলেও নামায-রোযার বাইরে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে না। তারা আংশিক ইসলামের অনুসারী। এমন মুসলমানদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً-

"তোমরা যারা ঈমান এনেছো, পূর্ণাঙ্গভাবে তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো।"[২৪৪]

এক্ষেত্রে হিদায়াত প্রার্থনার মর্ম হলো আল্লাহর নিকট ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হওয়ার সামর্থের জন্য দু'আ করা।

পঞ্চম, হিদায়াত প্রার্থনার আরেকটি মর্ম হলো মধ্যপন্থা প্রাপ্তির জন্য দু'আ করা। কেননা, স্বল্পতা ও আধিক্যের দুই চরম মাত্রা (اِفْرَاط وَتَفْرِيْط)-এর মাঝে মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং সত্য পন্থা। শরিয়তের আওতায় থেকে দুনিয়ার চাহিদা পূরণ এবং আখিরাতের জন্য আমলের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ পথ। এজন্যই আল্লাহ বলেন :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا-

"আর এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি"।[২৪৫]

এ অর্থে একজন মুসলামনের পক্ষে সোজা পথের হিদায়াত প্রার্থনার মানে হলো মধ্যপন্থা লাভের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

ষষ্ঠ, আল্লাহর সৃষ্টিজগতে চিন্তা ভাবনা দ্বারা মানুষ হয়তো আল্লাহকে চেনার কিছু প্রমাণ পেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের অগণিত প্রমাণাদি তার অজানাই থেকে যায়। এক্ষেত্রে হিদায়াতের দু'আ দ্বারা আল্লাহর এসব

---

২৪২. ইবনে মাজাহ-৭৩ ও ৭৫

২৪৩. হিদায়াতের মাত্রার কোন শেষ নেই। দেখুন, কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসিরে মাজহারী, (উর্দু অনুবাদ), মাওলানা আব্দুল দায়েম আল জালালী, দারুল আশা'আত, করাচী, পাকিস্তান, তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ ২৮।

২৪৪. আল-কুরআন ২ : ২০৮।

২৪৫. আল-কুরআন ২ : ১৪৩।

অসংখ্য প্রমাণাদির সন্ধান পেয়ে তাঁকে ভালোভাবে চেনা ও জানার সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

সপ্তম, হিদায়াতের প্রার্থনা দ্বারা আল্লাহতে সম্পূণরূপে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার দু'আ করা হয়। এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারলে মানুষ আল্লাহর সর্বপ্রকার নির্দেশ মেনে নিতে এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। যদি নিজ সন্তানকে কুরবানী করতে বলা হয়, তাও সে বিনা দ্বিধায় করতে পারে। যেমনটি করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)।[২৪৬] তখন মানুষের জীবন, মৃত্যু, ইবাদত ও সকল কর্মই হয়ে যায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।[২৪৭]

---

২৪৬. চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ, এ তিনটি ব্যাখ্যা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি তাঁর আত্তাফসিরুল কাবীরে সূরা ফাতিহার তাফসিরে দিয়েছেন। দেখুন, মুহাম্মদ ইবনে উমার ফখরুদ্দীন রাযি, আত তাফসিরুল কাবীর, দারুল হাদিস, ১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, মুলতান, পাকিস্তান।

২৪৭. আল-কুরআন ৬:১৬২।

একাদশ অধ্যায়

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

তাদের পথে যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো

সূরা ফাতিহার অন্যতম প্রধান বক্তব্য হলো আল্লাহর নিকট সোজা পথ বা 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর হিদায়াত প্রার্থনা করা, তাঁদের পথে হিদায়াত যারা আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়েছেন, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে নয়।

এখানে পথের পথিক দ্বারা পথের বৈশিষ্ট্য জানার এবং পরিচয় লাভের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জগতের মানুষ প্রধানত: দু'টি শিবিরে বিভক্ত। হিদায়াতের পথে চলে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত মনীষীগণের দল। আরেকটি দল হলো তাদের, যারা বাতিল পথে চলে আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপে পতিত হয়েছে এবং অভিশপ্ত হয়েছে। এখানে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে চলার জন্য এবং অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষের কাদের বন্ধুত্ব ও সঙ্গ গ্রহণ করা উচিত, আর কাদের বন্ধুত্ব ও সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

কুরআনের বিভিন্নস্থানে প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এতে আছে হিদায়াত প্রাপ্ত মানুষ ও জাতিসমূহের ইতিহাস, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছেন। এতে আরো আছে হিদায়াত বঞ্চিত মানুষ ও জাতিসমূহের ইতিহাস। কুরআনের ভূমিকা হিসেবে সূরা ফাতিহায় প্রথমেই এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহর নিকট হিদায়াতপ্রাপ্ত ও অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে চলার ব্যাপারে সাহায্যের দু'আর মাধ্যমে পাঠকের মনে এমন মানসিক অবস্থা ও কামনা-বাসনা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তারা কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ পূর্বক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ অনুসরণ করে। ইতিহাস বর্ণনার পূর্বে সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করা একটি সুন্দর কৌশল।[২৪৮]

---

২৪৮. কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন যেনো আমরা শিক্ষাগ্রহণ করি। এসব ঘটনাবলীর জন্য দেখুন (১) আবদুল ওয়াহ্হাব আন্নাজ্জাব, কাসাসুল আম্বিয়া, দারু ইহয়াইত্তুরাছিল আরাবি, বৈরুত; ১৪১৭ হিঃ (২) মাওলানা হিফযুর রহমান (অনুবাদক: মাওলানা নূরুর রহমান), কাছাছুল কুরআন, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৯; (৩) মাওলানা তাহের সূরাটি কাছাছুল আম্বীয়া (অনুবাদকঃ মাওলানা সামসুল হক), সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৩।

হিদায়াতপ্রাপ্ত ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত যে মনীষীদের ইতিহাস কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নবী, সিদ্দীক, শহিদ ও নেক্‌কার ব্যক্তিগণ। তাঁদের পথে চলার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য সকলেরই কাম্য। সুতরাং তাঁদের ঈমান, বিশ্বাস, আচরণ, ব্যবহার, কর্ম ও ত্যাগ স্বীকারের প্রতিটি ঘটনা মনোযোগের সাথে পাঠ করা উচিত এবং তা অনুসরণের চেষ্টা করা উচিত। ইতিবাচক মানসিক অবস্থা ও চেষ্টা ব্যতীত শুধু দু'আয় তেমন লাভ হবে না।

মহানবী (সা)-এর আচরণ থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাই যে, রাসূল (সা) এর মনের কামনাকেও আল্লাহ কবুল করেছেন।[২৪৯] তাঁর বেলায় শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহয্যের জন্য দু'আ করাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি জিহাদের ময়দানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন। নিজের যতোটুকু সাধ্য আছে, তার সবটুকু ব্যয় করেছেন এবং তার সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্যও প্রার্থনা করেছেন। আর তখনই তিনি সাহায্য পেয়েছেন। একইভাবে আমাদের দু'আ কার্যকরী হবার জন্য উচিত হবে হিদায়াত ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও জাতিসমূহের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

আজও প্রতিটি নামাযে সূরা ফাতিহা বার বার পাঠ করা হচ্ছে। এতে প্রার্থনা হচ্ছে হিদায়াতের অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে চলার এবং অভিশপ্ত পথভ্রষ্টদের পথ থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু দেখা যায়, অনেক নামাযীই রীতিমতো নামায পড়ার পরও অভিশপ্তদের আচরণ করে ফেলে। তার প্রধান কারণ হলো, যন্ত্রের মতো নামায পড়া, মন্ত্রের মতো দু'আ পাঠ করা, তা উপলব্ধি না করা, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণে চেষ্টার অভাব। এ ব্যাপারে সবারই সতর্ক হওয়া উচিত।

আল্লাহর নিয়ামত : অর্থ ও তাৎপর্য

যে পথে গমন করলে আল্লাহর নিয়ামত পাওয়া যায়, সে পথে হিদায়াতের জন্য এখানে দু'আ আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ নিয়ামত মানে কি? কেননা, কোন সৃষ্টি এবং কোন মানুষই আল্লাহর নিয়ামত ছাড়া নেই। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং যারা আল্লাহর অবাধ্য, তারাও আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে। এ হিসেবে কাফিরদের চলার পথকেও কি নিয়ামত প্রাপ্তদের পথ বলা যায়? মোটেই নয়। বরং এ দু'আয় উল্লেখিত নিয়ামত হলো অর্জিত নিয়ামত। সূরা ফাতিহায় যে নিয়ামতের উল্লেখ করা

---

২৪৯. প্রথমে কিবলা ছিল মসজিদে আকসা। কিন্তু রাসূল (সা) এর মনে এ কামনা জাগলো যে, কা'বার দিকে ফিরে নামায পড়ার অনুমতি যদি হতো ! রাসূলের এ কামনার ফলে আল্লাহ তা'আলা নামাযের মধ্যেই মসজিদে আকসার পরিবর্তে কা'বাকে কিবলা করে দেন। দেখুন, আল-কুরআন ২ : ১৪৪।

হয়েছে, তাতে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ নিয়ামত বুঝানো হয়নি। বরং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য, এবং আল্লাহর পথে চরম ত্যাগ স্বীকার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যে নিয়ামত অর্জন করেছেন, এখানে সে নিয়ামতই বুঝানো হয়েছে। যাঁরা সে নিয়ামত অর্জন করতে পেরেছেন, তাদের পথে হিদায়াতের দু'আ রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে সংক্ষেপে নিয়ামতের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ব্যাপকভাবে নিয়ামতকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ নিয়ামত। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফির, অনুগত-বিদ্রোহী, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সবাইকে আল্লাহ নিয়ামত দান করে থাকেন। মানুষের জীবনই তো একটা বড় নিয়ামত। আল্লাহ বলেন :

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ -

"তোমরা কীভাবে আল্লাহর কুফরী করো (আল্লাহকে অস্বীকার করো বা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হও), অথচ তোমরা মৃত ছিলে, তখন আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন।"[২৪৯/ক]

মানব সৃষ্টি, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, দৃষ্টিশক্তি, বাচনশক্তি, জ্ঞানবুদ্ধি, পৃথিবীতে জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ, সবই আল্লাহর নিয়ামত। যার চোখ নেই, সে বুঝে দৃষ্টিশক্তি কতো বড় নিয়ামত। এভাবে মানবদেহে যে সব দৈহিক ও ইন্দ্রিয় শক্তি আছে, সবই আল্লাহর নিয়ামত।

প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবই আল্লাহর নিয়ামত।

(১) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا -

(২) وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ -

(৩) وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا -

(১) "তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।"[২৫০]

(২) "তোমাদের নিকট যতো নিয়ামত আছে, সবই আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত।"[২৫১]

২৪৯/ক. আল-কুরআন ২ : ২৮।
২৫০. আল-কুরআন ২ : ২৯।
২৫১. আল-কুরআন ১৬ : ৫৩।

(৩) "তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারবে না।"[২৫২]

এসব আয়াতে যে নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে তা হলো সাধারণ নিয়ামত।

এ নিয়ামত মুসলমানদের মতো অমুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, সবাই পেয়ে থাকে। কুরআনে ইহুদিদের অনেক অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে। এরপরও তাদের দেয়া হয়েছে অনেক নিয়ামত।[২৫৩] বনী ইসরাঈল তথা ইহুদিদের প্রতি নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন,

يَابَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ-

"হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের উপর যে নিয়ামত সমূহ দিয়েছি তা স্মরণ করো।"[২৫৪]

আল্লাহ সবাইকেই এ সাধারণ নিয়ামত দান করেন। দুনিয়ার কার্যকারণ অনুযায়ী যারাই অর্জন ও উপার্জনের যতোটুকু শর্ত পূরণ করে, তারা সে অনুযায়ী ফল লাভ করে; অর্থাৎ দক্ষতা, নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা অনুযায়ী মানুষ দুনিয়ার অর্জন বা নিয়ামত লাভ করে। আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে আল্লাহ পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন। এথেকে অনেক কাফির আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে যে, তারা ঠিক পথেই আছে, নয়তো তারা দুনিয়াতে এতো সাফল্য লাভ করতে পারতো না। এমন আত্মতৃপ্তি হলো চরম ভুল। আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ-

"কাফিররা যেনো কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; বরং আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[২৫৫]

সারকথা, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সাধারণভাবে এবং কার্যকারণের কর্মফল অনুযায়ী সবাই দুনিয়ার সাফল্যের নিয়ামত পায়। এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কিন্তু শুধু মুমিন-মুসলমানরাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, আর বাকি সবাই অকৃতজ্ঞ থাকে। আল্লাহ বলেন,

(১) وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ-

---

২৫২. আল-কুরআন :১৪:৩৪।
২৫৩. আল-কুরআন :১৬:১৮।
২৫৪. আল-কুরআন ২ : ৪০।
২৫৫. আল-কুরআন ৩ : ১৭৮।

(২) وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ -

(১) "আমার বান্দাদের মধ্যে খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই (তাদের স্রষ্টার) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।"[২৫৬]

(২) "আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।"[২৫৭]

এ নিয়ামত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভালো-মন্দের উপর নির্ভর করে না। এ নিয়ামত দুনিয়াতেও কল্যাণের নিদর্শন নয়, আখিরাতেও মুক্তির কারণ নয়। বরং এ নিয়ামত পেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে এবং ভালো পথে না চললে দুনিয়াতেই তারা শাস্তির শিকার হতে পারে, আর আখিরাতে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক কঠিন শাস্তি। সূরা ফাতিহায় নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে হিদায়াতের দু'আ দ্বারা এরূপ সাধারণ নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের সন্ধান পাওয়া উদ্দেশ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রকার নিয়ামত হলো অর্জিত নিয়ামত। তা হলো আল্লাহর সে নিয়ামত, যা আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণকর জীবনাদর্শ অনুসরণপূর্বক ভালো কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে লাভ করা যায়। এ নিয়ামত সাধারণ নিয়ামত নয়, বরং ভালো কাজের মাধ্যমে "অর্জিত নিয়ামত"। তা হলো আল্লাহর আনুগত্য, সত্য প্রচার ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে অর্জিত নিয়ামত। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো উল্লেখ করে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে এ বিশেষ "অর্জিত নিয়ামত" লাভ করা যায়। আর এ ইতিহাসের মাধ্যমে নিয়ামতের পথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

নবী লূত (আ)-এর ঘটনায় অর্জিত নিয়ামতের একটা উদাহরণ পাওয়া যায়। মিসরে বসে ইবরাহীম (আ) ও তাঁর ভাতিজা হযরত লূত (আ) পরামর্শ করেন এবং সত্যের দীন প্রচারে দু'জন দু'দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যান ফিলিস্তিনে, আর হযরত লূত (আ) যান জর্ডানে। হযরত লূত (আ) জর্ডানের তৎকালীন সুদূক ও আশুরা নামক স্থানে যান এবং সত্যের দাওয়াত দেন। তিনি দেখলেন, সেখানকার মানুষ জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। তার মধ্যে অন্যতম ছিল সমকামিতা (لواطة)। তিনি তাদেরকে এসব খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এবং সত্যপথে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তারা তাতে কর্ণপাত করলো না। তিনি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন: আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা করছি, এতে তোমাদেরই কল্যাণ। আমি তো তোমাদের নিকট কোন খাবার চাইনা,অর্থ চাইনা। নিজের খেয়ে নিজের পরে তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য দিনরাত

---

২৫৬. আল-কুরআন ৩৪ : ১৩।

২৫৭. আল-কুরআন ৭ : ১৭।

পরিশ্রম করে যাচ্ছি।

এরপরও তারা কর্ণপাত করলো না। বরং নিজদের খারাপ কাজেই লিপ্ত রইলো। শুধু তাই নয়, তারা বৈঠক করে ঠিক করলো যে, হযরত লূত (আ)-কে সে জনপদ থেকে বহিষ্কার করা হবে। সুতরাং আল্লাহ তাদের শাস্তির জন্য অতি সুন্দর যুবকদের বেশে ফেরেশতা পাঠালেন। তাঁরা হযরত লূত (আ)-এর বাড়িতে মেহমান হিসেবে হাযির হলেন। হযরত লূত (আ) এ দুর্ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে, তাঁর সম্প্রদায়ের সমকামী লোকেরা এসব সুন্দর ছেলেদের দেখে অশালীন কাজে লিপ্ত হতে পারে, যাতে মেহমানদের অপমান ও অসম্মান হবে। যুবকগণ হযরত লূতকে অভয় দিয়ে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই; কারণ, তাঁরা হলেন ফেরেশতা; তাদের সাথে খারাপ ব্যবহারের শক্তি ওদের নেই; বরং তাদের শাস্তির জন্যই তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত রাত্রে যুবকরূপী মেহমানদের পরামর্শে হযরত লূত (আ) এলাকা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী রয়ে গেলো। তখন এ গোটা জনপদকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পাথরের বৃষ্টি হয়, আর গোটা এলাকাকে উল্টে দেয়া হয়। সেখানে গভীর গর্ত সৃষ্টি হয়। মনে করা হয়, জর্ডানের "মৃত সাগর" নামক হ্রদটি হলো সে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান। আল্লাহ পাপিষ্ট মানুষগুলোকে ধ্বংস করে এমনভাবে মারলেন যাতে সে জনপদে এমন এক অস্বাভাবিক বিরাট জলাশয়ের সৃষ্টি হলো যে, হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনো সে পানিতে কোন মাছ বা প্রাণী নেই। সেখানে মাছ ছাড়লেও মরে যায়। এজন্য এর নাম "মৃত সাগর"। এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ-

"আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছি পাথর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, তবে লূত পরিবারের উপর পাঠানো হয়নি; আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম রাত্রের শেষাংশে, আমার "নিয়ামত" স্বরূপ; যারা শুকরিয়া আদায় করে, আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।"[২৫৮]

এখানে কয়েকটা বিষয় চিন্তার দাবি রাখে। লূত পরিবারের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত কি ছিল? আর সে নিয়ামতের কারণ কি ছিল?

সামগ্রিক শাস্তি ও বিপদ থেকে রক্ষা করে লূত পরিবারকে রক্ষা করা আল্লাহর নিয়ামত। এটি হলো সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত একটা ব্যবস্থা। যখন কোন জনপদে গযব নাযিল হয়, সাধারণত সেখানকার ভালো-মন্দ সকলের উপরই

---

২৫৮. আল-কুরআন ৫৪ : ৩৪-৩৫।

বিপদ আসে। এজন্যই আল্লাহ বলেন, "তোমরা সে শাস্তি ও আযাবকে ভয় করো যা শুধু তোমাদের মন্দ লোকদের উপর আপতিত হবে না, বরং সাধারণভাবে সকলের উপরই আসবে।"[২৫৯]

কিন্তু লূত (আ)-এর উপর সে সাধারণ আযাব আসেনি। সাধারণ নিয়ম থেকে এরূপ ব্যতিক্রমী আচরণ দ্বারা লূত (আ) ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করা আল্লাহর "নিয়ামত"। মানুষকে তাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কারণে লূত (আ) এ নিয়ামত পেয়েছেন। কাজেই এ নিয়ামত হলো "অর্জিত নিয়ামত"। প্রকৃতপক্ষে এ নিয়ামত অর্জনের যে কারণ, তাও আল্লাহর নিয়ামত। দুনিয়ার অগণিত ঈমানহীন মানবতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার পরও কাউকে ঈমানের মতো সৌভাগ্য দেয়াটাই নিয়ামত। ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহর দীন পাওয়া, আল্লাহর দীনকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারা, সে দীনের উপর শুধু নিজের আমলই নয়, বরং অন্যকে সে দীনের দিকে দাওয়াত দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা, সে দাওয়াত দিতে গিয়ে অত্যাচার-নির্যাতন ও বহিষ্কারের শিকার হওয়া, এবং এরপরও এ পবিত্র কাজ করে যাওয়া, এ সবই আল্লাহ প্রদত্ত সৌভাগ্য ও নিয়ামত। সুতরাং ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি বলেছেন, ঈমানটাই নিয়ামত।[২৬০] হযরত লূত (আ) এমন সবগুলো নিয়ামতের অধিকারী ছিলেন।

অর্জিত নিয়ামতের আরেকটি উদাহরণ হলো নবী ইবরাহিম (আ)-এর প্রতি আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ। যখন তাঁর পথভ্রষ্ট জাতি তাঁকে লেলিহান আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো, তখন আল্লাহ সে আগুনের দাহ্যশক্তিকে রহিত করে দেন এবং সেখানে পরম আরামদায়ক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মনোরম তাপমাত্রার ব্যবস্থা করেন। এ নিয়ামত হলো ইবরাহীম (আ)-এর ত্যাগের অর্জন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অর্জিত নিয়ামত শুধু দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের, আর সেহেতু দুনিয়ার নিয়ামতও ক্ষণস্থায়ী। আসল নিয়ামত হবে আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে মুক্তি পাওয়া, নাজাত পাওয়া, এবং নিয়ামতে ভরপুর বেহেশ্‌তে স্থান পাওয়া। সে অর্জিত নিয়ামতের আসল রূপ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপহার স্বরূপ জান্নাত লাভ করা। কুরআনের বহু আয়াতে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতময়

---

২৫৯. আল-কুরআন ৮ : ২৫।
২৬০. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি, দেখুন, তাফসির কাবীর, প্রথম খণ্ড পৃঃ ২২২।

জান্নাত।"[২৬১] "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীরা থাকবে বেহেশ্‌তে ও নিয়ামতের মধ্যে।"[২৬২] "তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, (যারা থাকবে) নিয়ামতপূর্ণ বেহেশতে।"[২৬৩] "সেখানে তাদের জন্য আছে চিরস্থায়ী নিয়ামত।"[২৬৪]

এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আখিরাতে মুক্তি পেয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশাধিকার লাভ করাটাই বড় পাওয়া এবং সব চাইতে মূল্যবান নিয়ামত। বলাবাহুল্য, সে নিয়ামত হলো অর্জিত নিয়ামত। মানুষকে তা অর্জন করতে হবে। এ পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করা উচিত যে, ঈমান ও আমলের মাধ্যমে আখিরাতের নিয়ামতময় জীবন অর্জন করা কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং তা হলো বাধ্যতামূলক কর্তব্য। যারা ঈমান ও আমলের এ কর্তব্য পালন করে না, তারা আখিরাতে নিয়ামত থেকে শুধু বঞ্চিতই হবে না, বরং এ কর্তব্য পালন না করার কারণে চরম শাস্তির অধিকারী হবে। অর্থাৎ একজন মানুষ পাবে 'অর্জিত নিয়ামত' অথবা 'অর্জিত শাস্তি'। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ - وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ -

"নিঃসন্দেহে নেক্‌কাররা থাকবে নিয়ামতের মধ্যে। আর পাপীরা থাকবে জাহান্নামে।"[২৬৫]

ঈমান ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য না করাটাই ঔদ্ধত্য, সীমালঙ্ঘন, অকৃতজ্ঞতা ও পাপ। দাস যদি মনিবের কথার বিরুদ্ধে চলে, মনিবের কথা শিরোধার্য করে না নেয়, তার দাসত্ব বাতিল হবে এবং সে চরম শাস্তি পাবে। তার অর্জন হবে শাস্তি ও জাহান্নাম।

সুতরাং ঈমান ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে অর্জিত নিয়ামত লাভের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং সে তাওফীক লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'য়া করতে হবে। সূরা ফাতিহায় এ শিক্ষা রয়েছে।

নিয়ামত প্রাপ্ত কারা এবং তাদের পথ কি?

বিষয়টি পরিষ্কার যে, এখানে নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে হিদায়াত দানের জন্য আল্লাহর নিকট দু'য়া রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, কারা নিয়ামতপ্রাপ্ত, কীভাবে নিয়ামত অর্জন করা যায়, আর নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে চলার অর্থই বা কি?

---

২৬১. আল-কুরআন ৩১ : ০৮
২৬২. আল-কুরআন ৫২ : ১৭
২৬৩. আল-কুরআন ৫৬ : ১১-১২
২৬৪. আল-কুরআন ৯ : ২১।
২৬৫. আল-কুরআন ৮২ : ১৩-১৪।

পূর্বের আলোচনায় এ সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে। কুরআনের অন্যত্র এসব প্রশ্নের আরো স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়। একটি আয়াতে কয়েকজন নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের উল্লেখ আছে।

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا -

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাঁদের সাথে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন; নবী, সিদ্দীক (পরম সত্যনিষ্ঠ), শহিদ ও নেক্কারদের মধ্য থেকে। তাঁরা কতইনা উত্তম সঙ্গী।"[২৬৬]

অর্থাৎ নবী, পরম সত্যনিষ্ঠ (সিদ্দীক), শহিদ ও নেক্কারগণ হলেন নিয়ামতপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান মানুষ। এসব বিশেষ ব্যক্তিত্বের গুণাবলী ও কর্মকাণ্ড অপরিচিত নয়। কুরআন, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাসে তাঁদের মহৎ চরিত্র, আচরণ ও কর্মকাণ্ডের কথা লিপিবদ্ধ আছে। যেমন, সালেহীন বা নেক্কারদের গুণাবলী ও আমল সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ -

"তারা আল্লাহ এবং বিচারদিনের (আখিরাতের) প্রতি ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করে এবং ভালো কাজে সহযোগিতা করে; তারাই হলো নেক্কার।"[২৬৭]

অর্থাৎ আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে গোটা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও ধারণ, এরপর সেমতে নিজ জীবন চালানোই শুধু নয়, বরং নেক্কাররা সমাজে এর প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করে এবং মানব কল্যাণের নিমিত্ত ভালো কাজে পারস্পারিক সহযোগিতা করে। এ ধরনের লোকেরাই হলো নেক্কার।

এরপর সিদ্দীক (পরম সত্যনিষ্ঠ) পরিভাষাটি লক্ষণীয়। আরবীতে "صِدِّيْقٌ (সিদ্দীক) হলো" صَادِقٌ এর আধিক্যবোধক শব্দ (صِيْغَةُ الْمُبَالَغَه), যার অর্থ করা হয়েছে পরম সত্যনিষ্ঠ। অতএব صَادِقٌ (সাদেক)-এর অর্থ হবে সত্যনিষ্ঠ। এ সত্যনিষ্ঠ ও পরম সত্যনিষ্ঠ সম্পর্কে কুরআনে অনেক বর্ণনা

---

২৬৬. আল-কুরআন ৪ : ৬৯।
২৬৭. আল-কুরআন ৩ : ১১৪।

আছে। এখানে সাধারণ সত্যনিষ্ঠ সম্পর্কে কুরআন থেকে একটা উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ -

"মুমিন হলো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, পরে (ইসলামী জীবন বিধানের কোন ব্যাপারে কোন প্রকার) সন্দেহ পোষণ করে না, এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই হলো সত্যনিষ্ঠ।"[২৬৮]

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পরিচয় এখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর বিধান এবং রাসূলের আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাস এবং বিনা দ্বিধায় তাকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করে নিয়ে নিজ জীবনে তা বাস্তবায়িত করা এবং পৃথিবীতে তা বাস্তবায়নের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা, এগুলো হলো সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পরিচয়।

আলোচ্য আয়াতে আরো দু'প্রকার নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছেন: নবী ও শহিদ। নবী-রাসূলগণের কি কাজ, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব-চরিত্র তার বর্ণনায় কুরআনপরিপূর্ণ। এছাড়া যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন সম্পদ সবকিছুই বিলিয়ে দেয়, তারা হলো শহিদ। আলোচ্য আয়াতটি ছাড়াও অন্যান্য আয়াতে নিয়ামত প্রাপ্তদের বর্ণনা এসেছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি আয়াত দেয়া হলো।

(১) إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيْمِ-

(২) الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ۚ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ - يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ -

(৩) إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيْمٍ-

(৪) أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ - فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ-

(১) "যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতময় জান্নাত।"[২৬৯]

---

২৬৮. আল-কুরআন ৪৯ : ১৫।
২৬৯. আল-কুরআন ৩১ : ৮।

(২) "যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজের মাল ও জান দিয়ে (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সাফল্যমণ্ডিত। তাদের রব-প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টির এবং বেহেশ্‌তের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিয়ামত।"[২৭০]

(৩) "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীরা থাকবে বেহেশ্‌তে ও নিয়ামতের মধ্যে।"[২৭১]

(৪) "তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, (যারা থাকবে) নিয়ামতপূর্ণ বেহেশতে।"[২৭২]

সংক্ষেপে, যারা আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করে নেয় (ঈমান রাখে), সেমতে কাজ করে এবং জীবন পরিচালিত করে (নেক আমল করে), সকল খারাপ কাজ ত্যাগ করে এবং দীনের প্রয়োজনে দেশত্যাগ করে (হিজরত করে), সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ অনুসরণে সতর্ক ও ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী (তাকওয়ার অধিকারী), এবং এভাবে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। তারাই হলো নিয়ামতপ্রাপ্ত, সাফল্যের অধিকারী। তারাই আখিরাতে অনন্তকালের অসীম নিয়ামতের বেহেশতে থাকবে।

তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করে দেয়, আল্লাহর কিতাব কুরআনকে লিখিত জীবনবিধান ও সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে, রাসূলের আদর্শকে নিজ জীবনের আদর্শ হিসেবে শিরোধার্য করে নেয় এবং সেমতেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে চালায়। নিজের জীবনে ইসলামের শুধু এরূপ পূর্ণাঙ্গ রূপায়নই নয়, বরং আল্লাহর দীন বাস্তবায়নের জন্য ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ বিলীন করে দেয়। আর মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে।

যারা নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গভাবে এসব গুণাবলির অধিকারী হবে, তারাই হবে আল্লাহর পরম নিয়ামত ও সাফল্যের অধিকারী। যাদের মধ্যে এসব গুণের সমারোহ কম মাত্রায় হবে, তারা হবে সে অনুপাতে কম নিয়ামতের অধিকারী। কিন্তু যারা ন্যূনতম গুণের অধিকারীও হবে না, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।

সূরা ফাতিহায় আল্লাহর নিকট নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথে হিদায়াত দানের দু'আর মাধ্যমে আমরা পূর্ণমাত্রায় সেসব গুণাবলী অর্জনের তাওফিক কামনা করি।

---

২৭০. আল-কুরআন ৯ : ২০-২১।
২৭১. আল-কুরআন ৫২ : ১৭।
২৭২. আল-কুরআন ৫৬ : ১২।

আমরা যদি হিদায়াত লাভের শর্ত পূরণ করে সজাগ ও সতর্ক মনে দু'আ করি এবং তা অর্জনের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করি, তা হলে আল্লাহ অবশ্যই এতে আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদের ইচ্ছাশক্তি, সিদ্ধান্ত ও প্রচেষ্টা অনুপাতেই সাহায্য ও সাফল্য লাভ হবে। সুতরাং সাধ ও সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। দু'আর সাথে থাকা চাই যথাযোগ্য প্রচেষ্টা। তখনই নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে হিদায়াত লাভ সম্ভব হবে।

দু'আটির বাচনভঙ্গি

নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে হিদায়াত দান করার জন্য দু'য়াটি ছিল, "হে আল্লাহ, আমাদেরকে সোজা পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীমে হিদায়াত করো, তাদের পথে, যাদের উপর তুমি নিয়ামত দান করেছো।"

এ দু'আটির বাচনভঙ্গি লক্ষ্য করার মতো। তাফসিরকারগণ বলেছেন :

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বাক্যটি পূর্বের আয়াতের 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর বদল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ হলো তাদের পথ, যাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত বর্ষিত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের 'বদল' এর রীতি বাদ দিলে আরবীতে বাক্য দু'টিকে একত্রিত করলে এরূপ দাঁড়ায়

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم-

অর্থাৎ (হে আল্লাহ) তুমি আমাদেরকে এমন ব্যক্তিদের সিরাতুল মুস্তাকীম প্রদর্শন করো যাদের উপর তুমি নিয়ামত নাযিল করেছো।"

এরূপ একত্রে বা এক বাক্যের পরিবর্তে দুটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, এবং একটি শব্দকে পূর্বোল্লেখিত আরেকটির বদল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণে এরূপ বদল (بدل)-এর ব্যবহার উন্নত সাহিত্যমানের স্বাক্ষর বহন করে। পূর্বে কিছু বলে তার পর আবার তার বদলে অন্য শব্দ বা একই শব্দ অন্যভাবে ব্যবহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়া বুঝায় এবং অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে। কথাটিকে একত্রেই বলা যেতো, কিন্তু গুরুত্ব ও স্পষ্ট বর্ণনা দেয়ার জন্যই আলাদা করে বলা হয়।

এবার একটু অর্থের দিকে তাকানো যায়। দেখা যাক, বদল হিসেবে বলায় গুরুত্ব কীভাবে বেড়েছে। সোজাভাবে দুআটি হলোঃ হে আল্লাহ, আমাদেরকে নিয়ামত প্রাপ্তদের সোজা পথ প্রদর্শন করো। এ দু'আটিকে বদল রীতিতে ভেঙ্গে দুটি বাক্যে ভাগ করায় মর্ম দাঁড়ায়ঃ হে আল্লাহ, আমাদেরকে সোজা পথ দেখাও, সে পথ, যে পথে চলার কারণে পূর্ববর্তীদের তুমি নিয়ামত দান

করেছ। এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে : যে পথে চলে নবী, সিদ্দীক, শহিদ ও নেক্‌কারগণ আল্লাহর নিয়ামত পেয়েছেন, তা-ই সিরাতুল মুস্তাকীম। আমরা সেই সিরাতুল মুস্তাকীমেরই হিদায়াত চাই। অন্য কোন পথের নয়।

আরবী ভাষায় এবং কুরআনের আরো অন্যান্য স্থানে এরূপ বদল এর পদ্ধতি আরো ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا -

"হে আমাদের রব, আমরা এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম; বিভ্রান্ত করেছিলাম যেভাবে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।"[২৭৩]

বাংলা ভাষায়ও এ ধরনের ব্যবহার বিরল নয়। যেমন, কাউকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার জন্য জোর দিয়ে এরূপ বলা, "যখন দাঁড়াও, সোজা হয়ে দাঁড়াও।" এখানে সোজা হয়ে দাঁড়াবার জন্য জোর তাগিদ রয়েছে। যদি বলা হয়, "সোজা হয়ে দাঁড়াও।" তবে তাগিদটা কম হয়।

২৭৩. আল-কুরআন ২৮ : ৬৩।

দ্বাদশ অধ্যায়

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

তাদের পথে নয়, যারা অভিশাপ বা ক্রোধে পতিত, আর যারা পথভ্রষ্ট

পুরো দু'আটি (আয়াতটি) হলো : "হে আল্লাহ, আমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দান করো; তাদের পথে, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো; তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত বা ক্রোধে পতিত এবং যারা পথভ্রষ্ট।"

বর্তমান আয়াতাংশে নিয়ামতপ্রাপ্ত মানুষের আরো অতিরিক্ত পরিচয় ও ব্যাখ্যা রয়েছে।[২৭৪] নিয়ামত প্রাপ্ত মানুষ হলো তারা যারা আল্লাহর গযব বা ক্রোধে পতিত হয়নি, যারা পথভ্রষ্টও নয়। কোন মানুষ এরূপ থাকতে পারে, যারা কোন মন্দ কাজ করে আল্লাহর ক্রোধে (গযবে) পতিত হয়, আবার নেক কাজ করে নিয়ামতও লাভ করে। হিদায়াত লাভের জন্য আল্লাহর নিকট যে, তার দ্বারা এমন সাময়িক নিয়ামতপ্রাপ্ত মানুষের পথ কাম্য নয়। বরং এমন নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে হিদায়াত কাম্য, যারা কোন সময়ই আল্লাহর গযবে পতিত হয় না, যারা সর্বদা সত্যপথে অবিচল ও দৃঢ় থাকে, যারা কখনো পথভ্রষ্ট হয় না।

আমরা আল্লাহর নিকট এমন নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে হিদায়াত চাই, যারা আল্লাহর ক্রোধে তথা গযবে পতিত নয় এবং যারা পথভ্রষ্ট নয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এমন পথ থেকে বাঁচাও, যা সত্যকে জানার পরও মন্দ ও অসৎ কাজের দিকে নিয়ে যায়। আমাদেরকে সে পথ থেকেও রক্ষা করো, যা অজ্ঞতার জন্য ভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে। বলাবাহুল্য, কামনা ও কর্ম এবং দু'আ ও আচরণ যদি পরস্পরবিরোধী হয়, তা হলে সে দু'আ হয় অর্থহীন। সুতরাং দু'আর সাথে থাকতে হবে প্রচেষ্টা। কাজেই "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম" দু'আর সাথে সাথে সকল জানা মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে হবে। "ওলাদ্যাল্লীন" বলে দু'আ করার সাথে সাথে সত্যকে জানার ও মানার চেষ্টা চালাতে হবে।

---

২৭৪. আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী সূরা ফাতিহার এ শেষ আয়াত غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ হলো صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم এর বদল (بدل)। বদলে ব্যবহৃত আয়াতটির মাধ্যমে নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের আরো পরিচয় ও ব্যাখ্যা দেয়াহয়েছে।

'মাগ্‌দূব' ও 'দ্যাল্লীন' (ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্ট): অর্থ ও তাৎপর্য

'মাগদূব' বা ক্রোধে পতিত মানুষ কারা? আর 'দ্যাল্লীন' বা পথভ্রষ্ট মানুষ কারা? এখানে এ প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করা হচ্ছে।

এ আয়াতে আল্লাহর ক্রোধে পতিত মানুষ দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা হক ও সত্যপথকে জানে, বুঝে ও চিনে। তারা ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। কিন্তু তারা খারাপ পথে চলে, অন্যায় কাজ করে, এমন কাজ করে যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তারা এরূপ করে প্রবৃত্তির তাড়নায়, স্বার্থের বশবর্তী হয়ে, এবং অহমিকার শিকার হয়ে। মহানবীর আবির্ভাবের সময় ইহুদিদের এরূপ চরিত্র ছিল। তারা তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে চিনতে পারে। কিন্তু অহমিকা, সাম্প্রদায়িকতা ও পার্থিব স্বার্থের জন্য তাঁকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা সামান্য পার্থিব স্বার্থের জন্য দীনের হুকুম-আহকাম পরিবর্তন করে ফেলতো, নবী-রাসূলদের অবমাননা করতো, এক কথায় সত্যকে জানার পরও সত্যপথের সীমালঙ্ঘন করতো। এ কারণেই আল্লাহর গযব বা ক্রোধে পতিত মানুষ দ্বারা ইহুদি সম্প্রদায়কে বুঝানোর তাফসিরই বহুল পরিচিত। ইহুদিরা যে আল্লাহর ক্রোধে পতিত তা একটি আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহুদিদের ইতিহাস বর্ণনার প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ۔

(অবশেষে) তাদের উপর আপতিত হলো লাঞ্ছনা ও দারিদ্র এবং তারা আল্লাহর গযব বা ক্রোধে পতিত হলো।[২৭৫]

এ আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা আল্লাহকে এবং সত্য দীনকে জেনে-শুনেও প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়ার আচরণকে শুধু ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোন কারণ নেই। ইহুদি ছাড়াও যারাই সত্যকে চেনা ও জানার পরও প্রবৃত্তির লালসা পূরণে অথবা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সত্যকে বিসর্জন দেয়, তারা সবাই আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত। পবিত্র কুরআনে এসব লোকদের প্রসঙ্গেও আল্লাহর ক্রোধে (غَضَبٌ) পতিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোন ধরনের আচরণের জন্য, কোন ধরনের মানুষ আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়, সে ব্যাপারে কুরআন থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হলো।

---

২৭৫. আল-কুরআন ২ : ৬১।

(১) وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ -

(২) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ -

(৩) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ -

(১) "আর যারা কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ।"[২৭৬]

(২) "আর যে ব্যক্তি সেদিন যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন অথবা নিজ সৈন্যদের নিকট ফিরে আসা ছাড়া (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে প্রত্যাবর্তন করবে আল্লাহর ক্রোধ (غَضَبٌ) নিয়ে, আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।"[২৭৭]

(৩) "সে বললো : তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি ও ক্রোধ (غَضَبٌ) অবধারিত হয়ে গেছে।"[২৭৮]

উপরে উল্লেখিত তিনটি আয়াতে তিন ধরনের মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত। সবার জন্যই আল্লাহর গযব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম, যারা মুসলমান অবস্থা থেকে নাস্তিক হয়ে যায়; যারা জন্মগতভাবে অথবা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমান পরিচয় লাভের পর ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়, তাদের উপর আল্লাহর গযব (ক্রোধ)। তবে যারা বিপদে প্রাণ রক্ষার জন্য শত্রুদের নিকট কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, অথচ ভিতরে ঈমান থাকে, তারা আল্লাহর গযবে পতিত নয়। দ্বিতীয়, যারা জিহাদে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ (غَضَبٌ)। তবে যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তনের জন্য বা নিজ দলে ফিরে আসতে এরূপ করলে কোন দোষ নেই। তৃতীয়, নবী হুদ (আ)-এর সম্প্রদায় তাদের নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব ও ক্রোধ আপতিত হয়।

উপরে উল্লেখিত আল্লাহর ক্রোধে পতিত তিন প্রকারের মানুষ ইহুদি নয়। অথচ তারাও আল্লাহর ক্রোধ বা গযবে পতিত। কাফির, আল্লাহর পথে জিহাদে বিমুখ মানুষ, যারা নবী ও তাঁদের আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, এককথায় ধর্মবিমুখ ও ধর্মবিরোধী মানুষ আল্লাহর ক্রোধে পতিত।

---

২৭৬. আল-কুরআন ১৬ : ১০৬।
২৭৭. আল-কুরআন ৮ : ১৬।
২৭৮. আল-কুরআন ৭ : ৭১।

এবার আয়াতে উল্লেখিত পথভ্রষ্ট (ضَالِّيْنَ) বিশেষণের কথা ধরা যাক। পথভ্রষ্ট (ضَالِّيْنَ) হলো তারা, যারা সত্য পথকে জানে না বুঝে না এবং চিনে না। তারা অজ্ঞ, পথভ্রষ্ট। তারা অজ্ঞতার জন্য ভুল পথে চলে। তাদের উদাহরণ হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তারা আল্লাহর সৃষ্ট মানুষকে আল্লাহর সমমর্যাদায় বসিয়ে ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। তারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র, আল্লাহকে ঈসা (আ)-এর পিতা এবং মরিয়ম (আ)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলে বিশ্বাস করে। তারা পথভ্রষ্ট, ভুল পথের পথিক। এ কারণে পথভ্রষ্ট (ضَالِّيْنَ) দ্বারা খ্রিস্টানদেরকে বুঝানোর তাফসিরটি বহুল পরিচিত। কারণ, আল্লাহ খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গে পথভ্রষ্টতা শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ-

"তারা তোমাদের পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে তারা নিজেরাও সহজ পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে গেছে।"[২৭৯] এ মর্মে একটি হাদিসও রয়েছে, যেখানে খ্রিস্টানদেরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেন, "ইহুদি হচ্ছে যাদের উপর ক্রোধ নিপতিত হয়েছে আর খ্রিস্টানগণ হচ্ছে পথভ্রষ্ট।"[২৮০]

কিন্তু খ্রিস্টানদের জন্য 'পথভ্রষ্ট' বিশেষণটিকে সীমাবদ্ধ করার কোন কারণ নেই। যারাই পথ হারিয়ে ভুল পথে গেছে, তাদের সবাই পথভ্রষ্ট মানুষের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে কুরআনের কয়েকটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করা যায়।

(১) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلَالًا بَعِيْدًا-

(২) وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا-

(৩) إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ-

(৪) بَلِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ-

(১) "যারা এই অহীকে অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরকেও) আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখে, তারা আসলে পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।"[২৮১]

(২) "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করলো সে মূলতঃ চরমভাবেই গোমরাহ হয়ে গেলো।"[২৮২]

---

২৭৯. আল-কুরআন ৫ : ৭৭।
২৮০. তিরমিযি, হাদিস নং ২৯৫৪।
২৮১. আল-কুরআন ৪ : ১৬৭।
২৮২. আল-কুরআন ৪ : ১১৬।

(৩) "নিঃসন্দেহে অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত।"[২৮৩]

(৪) "বরং যালিমরা সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট।"[২৮৪]

উপরের আয়াতগুলোতে কাফির, মুশরিক, যালিম, এমন কি সকল অপরাধীকেই পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। আসলে সুপথে অব্যাহত থেকে অথবা পথভ্রষ্ট না হয়ে, কেউ অপরাধের দিকে পা বাড়াতে পারে না। অন্ততপক্ষে যতোক্ষণ মানুষ খারাপ পথে অথবা অপরাধে নিমজ্জিত থাকে, ততোক্ষণ সে সোজা পথের বাইরে অবস্থান করে, অর্থাৎ পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকে। সারকথা, যা সত্য, হক ও দীনের বহির্ভূত, তাই পথভ্রষ্টতা ।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ -

"সুতরাং হক ও সত্যের বাইরে যা আছে তাই পথভ্রষ্টতা"।[২৮৫]

মোটকথা, সত্যকে জেনে শুনে অবাধ্য হওয়া, আর জ্ঞানের অভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে বিপথে যাওয়া, এ ধরনের সকল অবাধ্যতা, মন্দ কাজ ও পথভ্রষ্টতাই 'ক্রোধে নিপতিত' ও 'পথভ্রষ্ট' এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম তথা আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধানের বাইরে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই পথভ্রষ্টতা এবং এর সবকিছুই আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী। ইসলাম পরিপন্থি আচরণের জন্যই ইহুদিরা আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত আর ইসলামের পথ থেকে দূরে থাকার জন্যই খ্রিস্টানরা পথভ্রষ্ট। দুনিয়ায় যারাই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে কাফির হবে, আল্লাহর সাথে শির্ক করে মুশরিক হবে, যালিম হবে, ইসলাম বিরোধী কাজ করে অপরাধী হবে, তাদের সবাই পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত এবং আল্লাহর ক্রোধে পতিত। হিদায়াতের জন্য এ ধরনের সকল প্রকার নাফরমানী ও অবাধ্যতার পথ থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। সুতরাং সূরায়ে ফাতিহায় আমাদের দু'আর সারমর্ম হলো আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, যেনো তিনি তাঁর ক্রোধে পতিত এবং পথভ্রষ্টদের পথ থেকে রক্ষা করে আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমে হিদায়াত করেন। বলাবাহুল্য, এ দু'আ তখনি অর্থবহ হয় যখন মানুষ তদনুরূপ চেষ্টা করে। সোজা পথ জানতে এবং সে পথে চলতে প্রচেষ্টা চালায়। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

"যারা আমার পথে প্রচেষ্টা (সাধনা) চালায় আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।"[২৮৬]

---

২৮৩. আল-কুরআন ৫৪ : ৪৭।
২৮৪. আল-কুরআন ৩১ : ১১।
২৮৫. আল-কুরআন ১০ : ৩২।
২৮৬. আল-কুরআন ২৯ : ৬৯।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা

কুরআনই মানুষের জন্য হিদায়াত, যা সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথের দিশা দেয়। এ হিদ বাতিল, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, মানুষের য়াত দানের জন্য কুরআনে ব্যাপকভাবে দুটি কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথম, সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। গোটা কুরআন জুড়েই বলা হয়েছে কোনটা সত্য পথ আর কোনটা মিথ্যা পথ, কোনটা হক আর কোনটা কি করা উচিত আর কি বর্জন করা উচিত, কি আচরণ কাম্য আর কি আচরণ অবাঞ্ছিত। আরো বলা হয়েছে, মানুষ কোথা থেকে এলো, মানুষের উৎস কি, স্রষ্টা কে, স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত। স্রষ্টার সাথে কিরূপ আচরণ বাঞ্ছনীয়, আর কিরূপ আচরণ বর্জনীয়। এতে আরো বলা হয়েছে, সত্য পথ অনুসরণ করলে দুনিয়াতে সুফল ও শান্তি লাভ হবে এবং অনন্তকালের আখিরাতে কেমন প্রশান্তির জান্নাত পাওয়া যাবে। আর তা অনুসরণ না করলে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে দুনিয়াতে অশান্তি হবে এবং অনন্তকালের আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক অশান্তির স্থান দোযখে যেতে হবে।

দ্বিতীয়, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য কুরআনে রয়েছে অতীত জাতিসমূহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের বর্ণনা বা অতীত ইতিহাস। এ ইতিহাস বর্ণনার দুটি ধরন লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো তাদের কথা যারা হিদায়াত গ্রহণ পূর্বক সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথে চলে আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে (অর্থাৎ তাদের পথ যারা নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে)। আরেকটি ধারা হলো তাদের ইতিহাস বর্ণনা করা, যারা হিদায়াত বা সিরাতুল মুস্তাকীমকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে এবং অভিশপ্ত হয়ে চরম পরিণামের শিকার হয়েছে (অর্থাৎ তাদের পথ যারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে)।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইতিহাস বর্ণনার একটি কৌশল হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ামতপ্রাপ্ত ও ক্রোধে পতিতদের ইতিহাস পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে। যাতে মানুষ সত্য ও মিথ্যা এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য এবং তার পরিণাম সহজেই বুঝতে পারে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কুঅভ্যাস ও অবাধ্যতার সাথে তাদের ধ্বংসের আলোচনা। আর সঙ্গে সঙ্গে হযরত লূত (আ)-এর রক্ষা ও পরিত্রাণের বর্ণনা। ফেরাউনের ধ্বংসের সাথে সাথে হযরত মূসা (আ)-এর হিফাযতের ইতিহাস।

ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। নিয়ামত প্রাপ্তদের ইতিহাস পড়ে মানুষ সত্যপথের স্বচ্ছ ধারণা পাবে এবং এর পুরস্কারের কথা

শুনে সেপথে চলার জন্য উৎসাহিত বোধ করবে। অপরপক্ষে ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্টদের বর্ণনা পড়ে মানুষ বাতিল পথ থেকে সতর্ক হবে এবং তার পরিণাম জেনে তা থেকে আত্মরক্ষা করবে। এটাই হলো কুরআনে ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য, আর তাই হলো ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের সার কথা। আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ -

"তাদের কাহিনী (ও ইতিহাসে) বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষের জন্য রয়েছে শিক্ষা।"[২৮৭]

আসলে কুরআনের মাধ্যমে হিদায়াত দানের ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত দুটি কৌশল পরস্পরের পরিপূরক। হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা, ভালো ও মন্দের বর্ণনা দ্বারা মানুষ তাত্ত্বিকভাবে বিষয়টি বুঝতে পারে। ইতিহাসের মাধ্যমে সে হক ও বাতিলের কিছুটা বাস্তব রূপের ধারণা পায় এবং তার ফল ও পরিণামের বাস্তব অবস্থা জানতে পারে। মানুষকে বাতিল পথ থেকে বাঁচিয়ে সত্যের দিকে নিয়ে আসার জন্যই একাধিক কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরও যারা সত্যকে গ্রহণ করে না, তারা আসলেই হতভাগা।

সৎসঙ্গ গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ বর্জন

নিয়ামতপ্রাপ্ত সৎমানুষের পথে পরিচালিত করা এবং ক্রোধে পতিত ও ভ্রষ্ট অসৎ মানুষের পথ থেকে রক্ষা করার দু'আর মধ্যে সৎসঙ্গ গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ বর্জনের শিক্ষা রয়েছে। কারণ, কোন কিছু অর্জনের জন্য দু'আ করা তখনি সাজে যখন তা অর্জনের জন্য প্রবল কামনা ও প্রচেষ্টা থাকে। তেমনি নিয়ামতপ্রাপ্ত সৎলোকদের পথে চলার জন্য প্রচেষ্টা থাকলেই সেপথে হিদায়াতের দু'আ অর্থবহ হয়। অর্থাৎ সৎ সঙ্গ গ্রহণ করে সৎলোকদের পথে চলতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ পথে দৃঢ়পদ রাখার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে। কেউ যদি সৎসঙ্গ ও পক্ষ গ্রহণ না করে, বরং আল্লাহর ক্রোধে পতিত পথভ্রষ্টদের পক্ষ নেয়, তা হলে আল্লাহর নিকট নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে পথ প্রদর্শনের দু'আ অনর্থক হয়ে পড়ে।

যারা মুমিন ও মুসলমান, তারা মুমিন মুসলমানদের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করে। তারা একই পথের যাত্রী, একই পথের পথিক, একই আদর্শে বিশ্বাসী। একই পথের পথিক হিসেবে তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যদিও তাদের পিতামাতা এক নয়। আল্লাহ বলেন :

(১) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ-

---

২৮৭. আল-কুরআন ১২:১১১।

(২) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ -

(৩) إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ آوَوْا وَّنَصَرُوْا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ -

(১) "নিঃসন্দেহে মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।"[২৮৮]

(২) "মুমিন নর ও নারীগণ একে অপরের বন্ধু।"[২৮৯]

(৩) "নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজ মাল ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে (হিজরতকারীদের) আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু।"[২৯০]

যারা আল্লাহর নিকট নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথে হিদায়াত চায়, তারা স্বভাবতঃই নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথেই চলতে যত্নবান হবে। নিয়ামতপ্রাপ্তদের সাথে একই পথের যাত্রী হিসেবে তাদেরই বন্ধুত্ব, সখ্যতা ও সঙ্গ গ্রহণ করবে। এক সাথে আল্লাহর পথে চলবে। তারাই হলো আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ামতপ্রাপ্ত। তাদের সাথে থেকে তাদের পথে চললেই তাদের পথে হিদায়াতের দু'আ অর্থবহ হয়।

যারা নিয়ামত প্রাপ্তদের সঙ্গ গ্রহণ করে এবং একই পথে চলে, তারা আল্লাহর দলের লোক, তারা আল্লাহর বন্ধু। আর যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন দুশ্চিন্তা বা ভয় নেই।

(১) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ -

(২) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

(১) "আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, (তারাই আল্লাহর দল) আর নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই বিজয়ী।"[২৯১]

(২) "মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।"[২৯২]

---

২৮৮. আল-কুরআন ৪৯ : ১০।
২৮৯. আল-কুরআন ৯ : ৭১।
২৯০. আল-কুরআন ৮ : ৭২
২৯১. আল-কুরআন ৫ : ৫৬।
২৯২. আল-কুরআন ১০ : ৬২।

সারকথা, যারা আল্লাহর নিকট নিয়ামত প্রাপ্তদের পথ তথা সিরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াত চায়, তাদের উচিত হবে সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা, হিদায়াতপ্রাপ্তদের পথে চলা। কারণ তারাই (সৎলোকেরাই) আল্লাহর নিকট ঠেকে নিয়ামত প্রাপ্ত।

অপরপক্ষে অসৎসঙ্গ বর্জন করার বিষয়টিও একই রকম। হিদায়াত বঞ্চিতদের অনুসরণ করে হিদায়াত পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কাফির, ইহুদি, খ্রিস্টানেদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। শয়তানকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ না করে শত্রু হিসেবে নিতে বলা হয়েছে। যারা হিদায়াতের পথ বা আল্লাহর পথের বিরোধী, তাদেরকে কুরআনে আল্লাহর শত্রু ও হিদায়াতপ্রাপ্ত মুমিনদের শত্রু বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সত্যিকার ঈমান থাকলে তাদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ বলেন,

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ-

(২) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً -

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ

(৪) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ -

(৫) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ -

(৬) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ -

(১) "হে ঈমানদাগণ তোমরা,কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।"[২৯৩]

(২) "মুমিনরা যেনো মুমিন ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করো, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।"[২৯৪]

---

২৯৩. আল-কুরআন-৪ : ১৪৪।
২৯৪. আল-কুরআন ৩ : ২৮।

(৩) "হে ঈমানদারগণ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (এরূপ) যালিমদের হিদায়াত করেন না।"[২৯৫]

(৪) "নিঃসন্দেহে শয়তান হলো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার দলকে (নিজের দিকে) কেবল এজন্য আহবান করে যেনো তারা জাহান্নামী হয়।"[২৯৬]

(৫) "হে ঈমানদাগণ, তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না।"[২৯৭]

(৬) "তারা যদি আল্লাহ ও নবীর প্রতি এবং নবীর প্রতি নাযিলকৃত (কিতাব)-এর প্রতি ঈমান রাখতো তা হলে ওদেরকে (কাফিরদেরকে) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না।"[২৯৮]

মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও সঙ্গ দ্বারা একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। একজন ভালো লোক কোন মন্দ লোকের সাহচর্যে টিকতে পারবে না। আবার কোন মন্দ লোকও ভালো লোকের সাথে বেশি দিন থাকতে পারবে না। তাকে ভালো লোকের সাহচর্যে হয়তো ভালো হয়ে যেতে হবে, নয়তো ভালো লোকের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। কারণ, কোন নীতিবান ভালো লোকের সঙ্গে থেকে মন্দ কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, যারা মন্দ লোকের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করে দিব্যি জীবন চালিয়ে যাচ্ছে, তারাও মন্দ লোক। তারা পরস্পর বন্ধু, তারা একই পথের যাত্রী, তারা একই দলের অন্তর্ভুক্ত।

(১) وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ -

"আর যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ হলেন মুত্তাকীদের বন্ধু।"[২৯৯]

সারকথা, যারা যালিমদের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করে আছে, তারাও যালিম; যালিমরা পরস্পর বন্ধু। মন্দ লোকেরা পরস্পর বন্ধু। যেভাবে ভালো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা থাকবে নিয়ামতপ্রাপ্ত ভালো মানুষের সাথে ও পথে চলা,

---

২৯৫. আল-কুরআন ৫ : ৫১।
২৯৬. আল-কুরআন ৩৫ : ৬।
২৯৭. আল-কুরআন ৬০ : ১।
২৯৮. আল-কুরআন ৫ : ৮১।
২৯৯. আল-কুরআন ৪৫:১৯।

তেমনি মন্দ লোকের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকবে মন্দ লোকের সাথে ও পথে চলা, যারা পথভ্রষ্ট ও আল্লাহর ক্রোধে পতিত। ভালো মানুষের মধ্যে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত মৈত্রী ও সখ্যতা থাকে, মন্দ লোকের মধ্যেও তেমনি পারস্পরিক মৈত্রী ও সখ্যতা থাকাটা স্বাভাবিক। মন্দ লোকের সাথে ভালো লোকের স্বাভাবিক মৈত্রী ও সখ্যতা হতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ-

"তারা যদি আল্লাহ ও নবীর প্রতি এবং নবীর প্রতি নাযিলকৃত (কিতাব)-এর প্রতি ঈমান রাখতো তা হলে ওদেরকে (পথভ্রষ্টদেরকে) মৈত্রী হিসেবে গ্রহণ করতো না।"[৩০০]

যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে, আবার জেনে শোনে এমন অসৎসঙ্গ গ্রহণ করে, অসৎ লোকদের পথে চলে, তার পক্ষে এ সাহায্য প্রার্থনা প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে? এ যেনো মদ খেতে খেতে আল্লাহর নিকট দু'আ করা, হে আল্লাহ, আমাকে মদ থেকে বাঁচাও।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, সবাইকে জোর করে এক পথে নিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেককেই জীবনের চলার পথ গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে, তবে প্রত্যেকে নিজ কর্মের জন্য দায়ী। ভিন্ন মত ও পথের অনুসারীদের সাথে দ্বন্দ্বও সংঘাত নয়, বরং পরমত সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হলো কুরআনী জীবনাদর্শের নীতি।

---

৩০০. আল-কুরআন ৫:৮১।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

اٰمِيْنَ

হে আল্লাহ, আমাদের দু'আ কবুল করো

"আমীন" একটা দু'আ । এর অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের দু'আ কবুল করো। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ঘোষণার পর আল্লাহর সাহায্য ও হিদায়াতের দু'য়া রয়েছে। আমীন হলো সে দু'আ কবুল করার জন্য আল্লাহর নিকট বিনীত আবেদন। অর্থ্যাৎ হে আল্লাহ, সূরা ফাতিহায় আমাদের যে দু'আ ও প্রার্থনা, তা কবুল করো।

"আমীন" শব্দটি সূরা ফাতিহার কোন শব্দ বা অংশ নয়। আসলে এটি কুরআনের শব্দ বা অংশও নয়। তবে সূরা ফাতিহা শেষ করার পর 'আমীন' বলা সুন্নত। 'ওয়ালাদ্যাল্লীন' (وَلَا الضَّالِّيْنَ) -এর পর একটু থেমে 'আমীন' বলা উচিত, যেনো যা কুরআন নয় তা থেকে কুরআনের পার্থক্য বুঝা যায়। সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' বলা সুন্নত হওয়ার সমর্থনে দলিল হলো এই :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا أَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنَهُ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন ইমাম 'আমীন' বলে, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কারণ যার 'আমীন' ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে মিলিত হয় তার পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৩০১]

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা পাঠের পর 'আমীন' বলা সুন্নত।[৩০২] আর এ হাদিস থেকে আমীন বলার বিরাট ফযিলতও প্রমাণিত হয়। এতে গোনাহ মাফ হয়। তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্যের তোয়াক্কা না করে, নির্দ্বিধায় গোনাহ করেই চলে, শুধু এ আমীন বললেই তার পূর্বের সকল গোনাহ ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার কথাগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সচেষ্ট হয়ে সত্যপথে দৃঢ়পদ থাকার জন্য

---

৩০১. বুখারি, কিতাবুল আযান, হাদিস নং- ৭৮০, মুসলিম, কিতাবুস সালাত হাদিস নং- ৭২।

৩০২. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, আত্তাফসিরুল মুনীর ফিল আক্বিদাহ ওয়াশ শারীয়াহ ওয়াল মানহাজ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৫৭।

আল্লাহর নিকট হিদায়াত ও সাহায্যের দু'আ করে এবং আমীন বলে, এবং সে দু'আ কবুল করার জন্য আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন জানায়, তাকে তো আল্লাহ্ আপন হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন এবং তার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিবেন। এ তো করুণাময় আল্লাহর 'রাহমান' ও 'রাহীম হওয়ার পরিচায়ক। এমন ব্যক্তির দু'আ কবুল করার জন্য ফেরেশতারাও আমীন, বলে আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যারা এরূপ ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তাদের জন্য 'আমীন' বলা অর্থহীন। আল্লাহ্ তো পরম করুণাময়, অতি দয়ালু, মহাক্ষমাশীল। তবে আমাদের উচিত 'আমীন' এর ফযিলত পাওয়ার কামনা নিয়েই 'আমীন' বলা, মনে প্রাণে সূরা ফাতিহার কথাগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে তা পাঠ করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো কিছু আমলের ব্যাপারেও জীবনের পূর্বের গোনাহ্ মাফ হওয়ার কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেন, এসব আমল দ্বারা সগীরা (ছোট) গোনাহ্ মাফ হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন আমাদের চলার পথে জানা-অজানা অনেক ছোট-খাট গোনাহ্ হয়ে যায়। সে ছোট-খাট গোনাহ্গুলোকে একত্রিত হয়ে বড় আকার ধারণ করে। আমল দ্বারা এসব সগীরা গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কেননা কবীরা (বড়) গোনাহ্ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। এ অভিমত অনুযায়ী যারা নিষ্ঠার সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করে এবং 'আমীন' বলে, তাদের সগীরা গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। মোটকথা, নিষ্ঠা ও সতর্ক মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করে 'আমীন' বলা অতি ফযিলতের ব্যাপার। সবার উচিত এর পূর্ণ ফায়দা গ্রহণ করা।

নামাযে আমীন বলা প্রসঙ্গ

নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর 'আমীন' বলা সুন্নত। এতে কোন দ্বিমত নেই। পূর্বে উল্লেখিত হাদিস এবং রাসূল (সা) ও সাহাবাগণের আমল সে সুন্নত প্রমাণ করে।

কোন ব্যক্তি যখন একাকি নামায পড়ে, তার জন্য প্রতি রাকাতে প্রতিবারই সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর 'আমীন' বলা সুন্নত। এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। তবে জামাতে নামায পড়ার সময় ইমাম ও মুক্তাদীর বেলায় আমীন বলা প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব হলো এই যে, যে নামাযে আস্তে কিরাত পড়া হয় তাতে আস্তে ও অনুচ্চ স্বরে আমীন বলব।

আর যে নামাযে কিরাত জোরে পড়া হয়, তাতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই জোরে 'আমীন' বলবে। তাদের দলিল হলো এই :

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَا

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعَ مِنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِ الْاَوَّلِ-

(২) عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ يَمُدُّبِهَا صَوْتَهُ-

(১) "আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দ্যাল্লীন' বলার পর 'আমীন' বলতেন, যা তাঁর পাশের প্রথম কাতারের মুক্তাদীরা শুনতে পেতো।" ইবনে মাজাহ এর বর্ণনায় এরূপ আছে, 'যা প্রথম কাতারের মুক্তাদীরা শোনতে পেতো, আর তাতে মসজিদ শব্দে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো।"[৩০৩]

(২) "ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা) বলেন, আমি নবী (সা) 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দ্যাল্লীন' বলার পর 'আমীন' বলতে শোনেছি, যা তিনি উচ্চস্বরে বলতেন।"[৩০৪]

এখান থেকে বুঝা যায় যে, জোরে কিরাত পড়ার নামাযে রাসূল (সা) জোরে 'আমীন' বলেছেন। সুতরাং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী জোরে কিরাতের নামাযে জোরে 'আমীন' বলা সুন্নাত। আর যে নামাযে আস্তে কিরাত পড়া হয় তাতে স্বভাবতই আস্তে আমীন বলবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও মালেকী মাযহাবের অভিমত হলো এই যে, আস্তে আমীন বলা শ্রেয়। যেসব নামাযে কিরাত অনুচ্চস্বরে পড়া হয়, তাতে তো জোরে আমীন বলার প্রশ্নই উঠেনা। যেসব নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা হয়, তাতেও ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই আস্তে আমীন বলবে। আস্তে আমীন বলার পক্ষে যুক্তি হলো এই যে, আমীন হলো একটি দু'আ। আর আল্লাহ গোপনেই দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً -

"তোমরা তোমাদের রবকে বিনয়ের সাথে ও গোপনে ডাকো, দু'আ করো।"[৩০৫]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আস্তে আমীন বললেই দু'আটির গোপনে হয়, আর জোরে আমীন বললে দু'আটি গোপনে হয় না। আস্তে আমীন বলার পক্ষে আরেকটি দলিল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিস :

---

৩০৩. আবু দাউদ, হাদিস নং- ৯৩৪, ইবনে মাজাহ হাদিস নং- ৮৫৩।
৩০৪. আহমাদ, আবু দাউদ, হাদিস নং-৯৩২, তিরমিযী হাদিস নং-২৪৮।
৩০৫. আল-কুরআন: ৭:৫৫।

اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ التَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالتَّامِيْنُ وَالتَّحْمِيْدُ-

"ইমাম চারটি বিষয় আস্তে উচ্চারণ করবে 'আউযুবিল্লাহ', বিসমিল্লাহ্, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ।"[৩০৬]

এখান থেকেও বুঝা যায় আমীন আস্তেই বলতে হবে। সুতরাং হানাফী ও মালেকী মাযহাব মতে ইমাম ও মুক্তাদী আস্তেই আমীন বলবে।

এই অভিমতের অনুসারীরা বলেন, হানাফী ও মালেকী মাযহাবের দলিল হলো কুরআন, যাকে হাদিস দ্বারা খণ্ডন করা সম্ভব নয়। এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাহাবীদের আমলও ছিল বিস্‌মিল্লাহ্ ও আমীন আস্তে পড়া। সুতরাং হানাফী ও মালেকী মাযহাবের অভিমত হলো, সর্বক্ষেত্রেই আমীন আস্তে পড়তে হবে।

সারকথা, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের পর আমীন বলা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আমীন আস্তে বা জোরে পড়ার বিষয়টি কেবল অগ্রাধিকারের ব্যাপার। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ির সুযোগ নেই।

---

৩০৬. আত্-তাফসিরুল মুনীর, আল্লামা ওয়াহবাহ আল-যুহাইলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

দ্বিতীয় অংশ

সূরা ফাতিহার মর্ম ও শিক্ষা

চতুর্দশ অধ্যায়

সূরা ফাতিহার শিক্ষা

ইসলামী জীবন-দর্শনের সকল মৌলিক বিষয়ই সূরা ফাতিহায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, সৃষ্টি ও তার প্রতিপালন, দুনিয়া ও আখিরাত, মানুষ ও স্রষ্টা, মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক, সত্য ও বাতিল পথ, সত্য পথ প্রাপ্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রচেষ্টাসহ ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ সূরা ফাতিহা হলো গোটা কুরআনের ভূমিকা স্বরূপ, যা কুরআনে আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিত ও ধারণা প্রদান করে। আর সমস্ত কুরআন হলো এসব আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যা এসেছে বিভিন্ন রূপেঃ নির্দেশ, প্রত্যাদেশ, উপদেশ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী জীবন-দর্শনের গঠনতন্ত্র জ্ঞানসমুদ্র কুরআনের ভূমিকা হিসেবে সূরা ফাতিহার কলেবর অতি ছোট। কিন্তু এর ছোট ছোট আয়াতের প্রতিটি শব্দের মধ্যে রয়েছে সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। সুতরাং এক একটি আয়াত বিশ্লেষণ করলে এক একটি গ্রন্থ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু সূরা ফাতিহার সে পর্যায়ে আলোচনা এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো সূরাটির সারমর্ম বুঝার মতো কিছুটা বিশ্লেষণ করা, যাতে প্রতিটি আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে। বইটির প্রথম অংশে আয়াত ভিত্তিক অধ্যায়সমূহে তা করা হয়েছে। সেখানে প্রদত্ত আলাদা আলাদা আয়াতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিক্ষার সূত্র ধরে বক্ষমান দ্বিতীয় অংশে এই সূরার প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়গুলো একত্রে উপস্থাপন করা হলো। সমন্বিতভাবে শিক্ষাগুলো অনুধাবন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যেই তা করা হলো, পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নয়। এতে করে ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো একত্রে উপলব্ধি, গ্রহণ ও অনুসরণ করাও সহজ হবে।

(১) আল্লাহতে বিশ্বাস

সূরা ফাতিহার প্রথমেই আল্লাহকে প্রতিপালক, বিচার দিনের মালিক ও সকল প্রশংসার অধিকারী ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর উপর ঈমানের ঘোষণা রয়েছে। প্রতিপালক হওয়ার মধ্যেই আল্লাহর স্রষ্টা হওয়ার ধারণা ও বিশ্বাস সুপ্ত আছে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক বিশ্বাস হলো স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহতে ঈমান। এ সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগত এমনিতে অস্তিত্বে আসেনি, বরং এর একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি হলেন আল্লাহ। তিনি সকল সৃষ্টির রব, প্রতিপালক, রাব্বুল আলামীন। কিয়ামতের শেষ বিচারের দিন তাঁরই নিকট সকল কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। গোটা সূরাটিতেই আল্লাহতে বিশ্বাসের এসব মৌলিক ধারণা ও বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রয়েছে।

আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাস জগত সম্পর্কে প্রচলিত নানা ধরনের মতবাদ ও বিশ্বাসকে নাকচ ও খণ্ডন করে। নাস্তিক্যবাদ স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। নাস্তিক্যবাদ অনুযায়ী এ গোটা সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বের পেছনে কোন স্রষ্টা, প্রভু বা বিধাতার হাত নেই, কোন মহাশক্তির পরশ নেই। সবকিছু কোন স্রষ্টা ছাড়া এমনিতেই অস্তিত্বে এসেছে। অপরদিকে কেউ কেউ কোন না কোন বিধাতায় বিশ্বাস করে। কিন্তু এ বিধাতার ধারণাও বিচিত্র। কেউ কোন জড় পদার্থ বা কোন জন্তু-জানোয়ারকে বিধাতার আসনে বসিয়ে তার উপাসনা করে। আবার উপাসনার ধরনও আরো বিচিত্র। কেউ বিধাতার সন্তুষ্টির জন্য উপাসনা করে। কেউ বিধাতার জন্য খাবার পরিবেশন করে। সূরা ফাতিহার প্রথমেই আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আল্লাহকে প্রতিপালক ও বিচার দিবসের একমাত্র মালিক ঘোষণা করে নাস্তিক্যবাদ ও সকল বাতিল ধর্ম-বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। ইসলামী জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তিই হলো এই যে, এ গোটা সৃষ্টিজগতের পেছনে রয়েছেন এক মহাপ্রজ্ঞাশীল স্রষ্টা, যিনি এক মহান উদ্দেশ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

(২) আল্লাহ জগতসমূহের রব বা প্রতিপালক

আল্লাহ জগতসমূহের রব বা প্রতিপালক (আয়াত-১)। তিনি শুধু সৃষ্টিই করেন না, সৃষ্টির লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভারও তাঁর নিজের হাতে। তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে জন্ম-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্পর্শকাতর ধাপ অতিক্রম করিয়ে একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে গড়ে তোলেন, এবং শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেন। প্রথম, তিনি কোন কিছুর জন্ম প্রক্রিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত লালন করে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি হিসেবে উন্নীত করেন।[৩০৭] দ্বিতীয়, জন্মের পর শিশুটির দৈহিক ও মানসিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে পরিণত বয়সে পৌঁছে দেন। তৃতীয়, এরপর মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার জীবিকার ব্যবস্থা করেন। চতুর্থ, এ জগতের যেখানে যা আছে, সেখানে তা টিকে থাকার জন্য আল্লাহ যথার্থ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রেখেছেন। তা না হলে এসবের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো। উষ্ণ আবহাওয়াপূর্ণ কোন দেশের জন্তুকে উত্তর মেরুতে ছেড়ে দিলে কয়েক মিনিটেই হয়তো তা মরে যাবে, অথচ উত্তর মেরুর বরফে আবৃত এলাকায় জন্তু জানোয়ারের গায়ের চামড়া এতো মোটা এবং দেহে এতো পুরো লোম আছে যে, বরফের হাড়কাঁপানো শীত ও ঠাণ্ডার মধ্যে তা দিব্যি জীবনযাপন করছে। পঞ্চম, সৃষ্টি জগতে যা

---

৩০৭. যেমন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্পর্শকাতর পর্যায় অতিক্রম করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু রূপলাভ করে। অতি সামান্য কিছুতেই তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গর্ভধারিণী মা বুঝতেও পারছেন না তার গর্ভে কি হচ্ছে। তিনি দিব্যি চলাফেরা করছেন। আল্লাহ সযত্নে শিশুটির সুরক্ষা করছেন।

কিছু আছে তার অস্তিত্ব, জীবন ও লালনের জন্য আল্লাহ ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত একটি পরিবেশ (environment) তৈরি করেছেন, যা না হলে জীবন ও অস্তিত্ব টিকে থাকতো না, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো। আমরা নিঃশ্বাসে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, গাছপালা তা ত্যাগ করে, আর আমরা যে কার্বনডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি তা গাছপালা গ্রহণ করে । গাছ যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড না নিতো, আর অক্সিজেন না দিতো, তা হলে মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতো। আল্লাহর প্রতিপালনের কি অপরূপ ব্যবস্থা।

এখানে আরো দুটি বিষয়ে বিবেচ্য। প্রথম, রবুবিয়্যত ও প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষকে জীবিকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। যার যা রিযিকে আছে সে তা পাবেই, যদিও তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু অতি চেষ্টার মাধ্যমে বা অবৈধ উপায় অবলম্বন করে নির্ধারিত রিযিকের চেয়ে অতিরিক্ত পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং জীবিকা অন্বেষণ বা অধিক উপার্জনের জন্য অসদুপায় অবলম্বন এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়, আল্লাহর রবুবিয়্যতের নিয়ম হলো এই যে, সৃষ্টির জন্য যা উপযুক্ত, সেভাবেই তিনি সবকিছু প্রতিপালনের ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্মশক্তি দিয়ে জীবিকা অন্বেষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যথাযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করা মানুষের কর্তব্য।

(৩) আল্লাহ পরম করুণাময়

আল্লাহ হলেন পরম করুণা ও দয়ার আধার (আয়াত-২)। তিনি করুণাকে তাঁর জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছেন। তাঁর করুণা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আল্লাহর দয়া ও করুণার চিহ্ন প্রতিটি মানুষের সৃষ্টি থেকে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রথম, মানুষের সযত্ন সৃষ্টি, লালন-পালন ও প্রতিপালনসহ সকল ক্ষেত্রেই সে দয়া ও করুণার স্বাক্ষর রয়েছে। দ্বিতীয়, মানুষকে শুধু ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েই আল্লাহ ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি হিদায়াতের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব দিয়েছেন। তা না হলে মানুষ স্বল্প জ্ঞানে সত্যপথ খুঁজে নিতে পারতো না। তৃতীয়, হিদায়াতের এ কার্যকরী ব্যবস্থা সত্ত্বেও মানুষের পদস্খলন হয়, মানুষ আল্লাহর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে ফেলে; কিন্তু মানুষ যতোই অপরাধ করুক, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন (তাওবা) করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেন।[৩০৮] চতুর্থ, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, এবং যারা আল্লাহ ও আল্লাহর দীনের দুশমন ও শত্রু, তাদেরকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছেন না, বরং তাদেরকেও দুনিয়ার জীবনে জীবিকার উপকরণাদি দিয়ে যাচ্ছেন।[৩০৯]

---

৩০৮. আল-কুরআন ৬:১২।

৩০৯. আল-কুরআন ৬:৫৪।

পঞ্চম, মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিনও মানুষের সাথে আল্লাহর আচরণ হবে পরম করুণার। আল্লাহতে ঈমান আনার পরও যারা খারাপ কাজ করে, তাদের অনেককেই সেদিন তিনি নানা উসিলায় ক্ষমা করে দেবেন। যাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে বড়জোর খারাপ কাজের পরিমাণ শাস্তি দেবেন, একটুও বেশি নয়। কিন্তু যারা ভালো কাজ করে, তাদেরকে দশগুণ থেকে সাত শত গুণ বেশি পুরস্কার দেবেন। পুরস্কারের আধিক্য নির্ভর করবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, নিষ্ঠা এবং একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করা ইত্যাদি মাপকাঠির উপর। নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রমাণ ও নিদর্শন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ যখন এতো করুণাময়, তখন দুনিয়াতে এতো কষ্ট কেন? আর আখিরাতেও কেন শাস্তি থাকবে? একটু চিন্তা করলে এর জবাব পাওয়া কঠিন হবে না। পিতা-মাতা যেমন সন্তানের মঙ্গলের জন্যই শাসন করেন, তেমনি অনেক সময় আল্লাহ বান্দাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যই দুনিয়াতে বিপদ দ্বারা সতর্ক করেন।[৩১০] কখনো আবার মন্দ কাজের জন্য দুনিয়ার সামান্য শাস্তি দেন।[৩১১] অনেক সময় আল্লাহ দুনিয়াতে অল্প কষ্ট দিয়ে তাঁর প্রিয় বান্দাকে আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করেন। কখনো আবার আল্লাহর প্রিয় বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটু বিপদ ও কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করেন। নিঃসন্দেহে এটাও আল্লাহর করুণা।

এ তো গেলো দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদের কথা। আখিরাতের ব্যাপারটিও সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহ ও আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামের পক্ষের ও বিপক্ষের মানুষকে যদি একই সাথে পরম শান্তির বেহেশতে স্থান দেয়া হয়, তা কি ইনসাফ হবে? যারা আল্লাহর দীনের জন্য চরম নির্যাতন সহ্য করতে করতে প্রাণ দেয়, তা হবে তাদের প্রতি চরম নির্দয় আচরণ। সুতরাং করুণা ও দয়ার দাবি হলো ভালো মানুষকে শান্তির জান্নাতে স্থান দেয়া, আর পাপিষ্ঠদেরকে শাস্তি দেয়া। আখিরাতের এ শাস্তির ব্যবস্থাও আল্লাহর করুণাময় হওয়ারই প্রমাণ।

(৪) সকল প্রশংসা করুণাময় আল্লাহর প্রাপ্য

সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র করুণাময় আল্লাহরই প্রাপ্য (আয়াত ১) যার কিছুটা পরিচয় উপরে তুলে ধরা হলো। যিনি এমন দয়া ও করুণার মালিক,

---

৩১০. আল্লাহ বলেনঃ "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে (আল্লাহ) তাদের কোন কোন অসৎ কর্মের শাস্তি ভোগ করান, যাতে তারা সুপথে ফিরে আসে।" (আল কুরআন ৩০:৪১)।

৩১১. দুনিয়াতে অনেক কষ্ট ও বিপদ মানুষের কর্মের ফলেই আসে (আল কুরআন : ৩০:৪১

সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই সকল নিয়ামত ও ভালো-মন্দের স্রষ্টা ও দাতা। সে দান প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, তা আল্লাহরই দান। যেমন, রৌদ্রের দরুন যদি কারো গরম লাগে, বাহ্যত তার কারণ হলো সূর্য। কিন্তু সে সূর্যের স্রষ্টাও আল্লাহ। মানুষ প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অগণিত নিয়ামতরাজিতে ডুবে আছে। সে নিয়ামত একমাত্র আল্লাহর দান। কোন সুন্দর তৈলচিত্রের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যদি তার প্রশংসা করা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে প্রশংসা করা হয় চিত্রশিল্পীর। একইভাবে কোন ভালো জিনিসের বা ভালো কাজের যদি প্রশংসা করা হয়, তা হলে সে প্রশংসার কেন্দ্র বিন্দুও আল্লাহ। কারণ এ সকল কাজ ও কার্যকারণের উৎস হলেন আল্লাহ। কাজেই প্রশংসা যা আছে, তার সবটুকুই আল্লাহর প্রাপ্য। তাই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। প্রশংসা শুধু প্রাপ্ত নিয়ামতের শুকরিয়ার জন্য নয়, বরং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সে নিয়ামত প্রাপ্ত হোক বা না হোক, অন্যরা তা পাচ্ছে, সমস্ত সৃষ্টি জগতই তা পাচ্ছে। সেহেতু আল্লাহর প্রতিটি মহান দান ও মহিমার জন্য সর্বত্র সর্বকালে একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য সকল প্রশংসা।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় দুনিয়ার সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আর অপরদিকে উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতিও উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এ কৃতজ্ঞা তো প্রশংসারই নামান্তর। অর্থাৎ একদিকে মানুষের প্রশংসা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, অন্যদিকে এখানে সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আপাতদৃষ্টিতে দুটো বক্তব্য সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে। আসলে তা সাংঘর্ষিক নয়। সব কিছুর কার্যকারণ হিসেবে প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। কোন মানুষ যদি অন্য কাউকে কোন সাহায্য সহযোগিতা করে অথবা উপকার করে, সে উপকার বা প্রাপ্ত জিনিসের স্রষ্টাও আল্লাহই। যে ব্যক্তি তা প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছে তার সাহায্যের ক্ষমতাও আল্লাহরই দান এবং অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতাও আল্লাহর ইচ্ছায়-ই হয়। এভাবে সবকিছুর কার্যকারণ হলেন আল্লাহ, সুতরাং প্রকৃত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তবে যে ব্যাক্তি সাহায্যের মানসিকতা সহকারে অন্যের উপকার করে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কোন কিছু প্রাপ্তির আসল কার্যকারণ হিসেবে প্রকৃত প্রশংসা একান্তভাবে আল্লাহরই প্রাপ্য, তবে সে প্রাপ্তির বাহ্যিক সহায়ক হিসেবে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই মানবতাসুলভ আচরণ। কারণ, অন্যত্র বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, সে আসলে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না।[৩১২]

---

৩১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করে না।" তিরমিযী ৪/১১১ (হাদিস নং ১৯৫৫)।

সুতরাং, যেকোনো নিয়ামতের বেলায় আল্লাহর দান হিসেবে মনের গভীরে প্রথম কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা থাকা উচিত আল্লাহর। এরপর কৃতজ্ঞতা থাকবে তার, যার মাধ্যমে আল্লাহর এ নিয়ামত পাওয়া গেলো।

সারকথা, আল্লাহ হলেন দয়া ও করুণার সাগর। সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। সে প্রশংসাসুলভ কৃতজ্ঞতা কাম্য।

(৫) আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উপায়

সবকিছুর সযত্ন সৃষ্টি ও প্রতিপালন এবং গোটা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অপার দয়া ও করুণার দাবি হলো এর স্বীকৃতিসহ আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। কিন্তু তার উপায় কি? সংক্ষেপে এর উপায় হলো নিম্নরূপ। প্রথম, স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে যে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা। দ্বিতীয়, আল্লাহর দেয়া জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান শিরোধার্য করে নেয়া। তৃতীয়, গোটা জীবন সে অনুযায়ী পরিচালিত করা। আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার এ সারমর্ম আরো পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে 'ইয়্যাকা না'বুদু' প্রত্যয়ের মাধ্যমে, এবং হিদায়াত প্রার্থনার মাধ্যমে, যে হিদায়াত দেয়া হয়েছে কুরআন ও রাসূলের আদর্শরূপে।

তবে যার অন্তরের গভীরে কৃতজ্ঞতা থাকে, তার মুখ থেকেও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি বেরিয়ে আসে। 'আল-হামদু লিল্লাহ' দ্বারা সূরা ফাতিহা শুরু করে সে শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। সুতরাং অন্তরের অন্তস্থলে থাকবে দৃঢ় বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও সর্বত্র তার প্রতিফলন। মানুষ এ দায়িত্ব কীভাবে কতটুকু পালন করলো তার জন্য আছে জবাবদিহিতা আখিরাতে।

(৬) আখিরাতে বিশ্বাস

আল্লাহ হলেন বিচার দিনের মালিক (আয়াত-৩)। তিনি গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এ সৃষ্টি অনর্থক নয়, বরং এর একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে মানুষ ও জিন জাতির উপর।[৩১৩]

মানুষ ও জিন সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্রত হয়েছে কিনা, বা কতটুকু হয়েছে, এবং কীভাবে তাদের জীবন কাটিয়েছে, তার বিচার হবে কিয়ামতের দিন। সেদিন সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। সে বিচার দিনের মালিক হলেন আল্লাহ। বিচারের প্রকৃত মর্ম হলো ভালো কর্ম দ্বারা নাজাত পেয়ে জান্নাত লাভ করা, আর মন্দ কর্মের জন্য শাস্তি পাওয়া। সে শাস্তির স্থান হলো জাহান্নাম। মূল কথা, এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, বরং দুনিয়ার পর

---

৩১৩. এ মহাসৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে ইয়্যাকা না'বুদু-এর আওতায় বর্ণিত হয়েছে। নীচে ৮নং শিক্ষা দ্রষ্টব্য।

আখিরাতে অনন্তকালের জীবন রয়েছে।

এ বিশ্বাসটি হলো ইসলামী জীবন-দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কোন স্রষ্টা ছাড়া এ জগতের অস্তিত্ব যদি এমনিতেই হয়ে থাকতো, তা হলে এ জীবনেই আমাদের শেষ হতো। এরপর আর কিছু থাকার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু ইসলামী জীবন-দর্শনের ভিত্তি হলো এই যে, একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু এ জীবনের শেষে দুনিয়ার কর্মফল ভোগ করার জন্য আখিরাতের অস্তিত্ব একটা যৌক্তিক প্রয়োজন। কর্মফল নির্ধারণের জন্য আখিরাতের শুরুতে কিয়ামতের দিন বসবে বিচারের এজলাস এবং সে বিচারের রায় অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করতে হবে অনন্ত কালের জীবনে। আল্লাহ বিচার দিনের মালিক, এ ঘোষণার মাধ্যমে আখিরাতের উপর এমন বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে।

এ জগত হলো আখিরাতের কর্মক্ষেত্র ও শস্যক্ষেত্র। এখানে যেমন কর্ম হবে, যেমন ফসল উৎপাদন করতে পারবে, আখিরাতে সেরূপ জীবনই লাভ হবে, সেরূপ ফলই পাওয়া যাবে। এ বিশ্বাসের দাবি হলো এই যে, মানুষ দুনিয়ার জীবনকে সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে না। বরং দুনিয়াতে উত্তম জীবন যাপনের সাথে সাথে আখিরাতের অনন্তকালের জীবনকেই প্রধান উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে। আর এমনভাবে জীবন চালাবে, এমন কাজ করবে, যা আখিরাতে কল্যাণ নিয়ে আসে। কোন প্রকারেই আখিরাতের অনন্তকালের কল্যাণকে বিসর্জন দিয়ে সে দুনিয়ার ক্ষণিকের আনন্দ ও সুখ বেছে নেবে না। দুনিয়াকে বাদ দিয়ে আখিরাত নয়, এবং আখিরাতের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য নেই। দুনিয়ার কল্যাণ কাম্য, তবে প্রাধান্য হলো আখিরাতের। কারণ, দুনিয়ার শেষ আছে, আখিরাতের শেষ নেই।

(৭) আল্লাহ বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি

আল্লাহ হলেন বিচার দিনের মালিক (আয়াত-৩)। এখানে আখিরাতে বিশ্বাসের সাথে সাথে আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো এই যে, আল্লাহ হলেন বিচার দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। কিয়ামতের বিচারের বেলায় কোন যুক্তিতর্ক, প্রভাব, লবিং বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চাপ বা সুপারিশ চলবে না, আপিল চলবে না, উর্ধ্বতন কোন কর্তৃপক্ষের নিকট জীবন ভিক্ষার আবেদন চলবে না। আল্লাহর বিচারে কোন অসন্তোষ প্রকাশ, তা অমান্য করা বা রায় প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ বা ক্ষমতা কারো থাকবে না। দুনিয়াতে বিচারককে নিজের পক্ষে ঘুরাতে সক্ষম হয়ে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিরা জঘন্য অপরাধ করেও আইনের হাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু আখিরাতে সে সুযোগ থাকবে না।

কিয়ামতের বিচার ও দুনিয়ার বিচারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথম,

কিয়ামতের দিন আল্লাহ হলেন একমাত্র বিচারক। তাঁর কোন সাহায্যকারী, সহযোগী বা পরামর্শদাতা থাকবে না। দ্বিতীয়, সেদিনের বিচারে কোন যুক্তিতর্কের অবকাশ থাকবে না। সেদিনের কোর্টে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ দাঁড় করিয়ে আল্লাহর বিচারকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার কোন সুযোগ থাকবে না। সেদিন সাক্ষী হবে ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা এবং মানুষের কর্মের সচিত্র প্রমাণ (documentary film) বা প্রমাণ্য সাক্ষী (documentary evidence)। তৃতীয়, সেদিনের বিচারে কোন প্রভাব, চাপ, ভয়, প্রলোভন বা সুপারিশের অবকাশ থাকবে না। চতুর্থ, সেদিনের বিচারে কারো কোন অসন্তোষ প্রকাশ করা বা বিচারের রায় অমান্য করার মতো কারো কোন ক্ষমতা থাকবে না। পঞ্চম, সেদিন আল্লাহর বিচারই হবে চূড়ান্ত, এবং সেখানে আপিলের কোন সুযোগ থাকবে না। ষষ্ঠ, সেদিন আল্লাহর রায়ের উপরে জীবন ভিক্ষা দেয়ার অন্য কোন কর্তৃপক্ষ থাকবে না। কাজেই সেদিন আল্লাহ হবেন একচ্ছত্র বিচারক। তাঁর রায় হবে অকাট্য এবং অবশ্যপালনীয়। আল্লাহ হলেন বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি।

আসলে আল্লাহ হলেন গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা, প্রতিপালক, মালিক ও অধিপতি। এখন প্রশ্ন, আল্লাহ যদি সবকিছুর মালিক ও অধিপতি হন, তা হলে আলোচ্য আয়াতে তাঁকে শুধু বিচার দিনের মালিক বলার অর্থ কি? এর জবাব হলো এই যে, আল্লাহ দুনিয়াসহ গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা, প্রতিপালক ও অধিপতি হওয়া সত্বেও তিনি দুনিয়াতে মানুষকে কিছু শক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তা সুপথে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ শক্তি ও ক্ষমতা বলেই মানুষ দেশ চালায়, শাসন করে এবং দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য আইন-কানুন বানাতে পারে। এমন অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর দীন এবং মুসলমানদের বিরোধী হয়েও দুনিয়াতে ক্ষমতার দাপট দেখায়। আল্লাহ তাদের দাপট বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। এভাবে আল্লাহর আনুগত্যে হোক বা বিরোধিতায়ই হোক, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারাই আল্লাহর বৃহত্তর রাজত্বের আওতায় দুনিয়াতে ক্ষুদ্র পরিসরে মানুষের রূপক রাজত্ব চলে। কিন্তু সে ক্ষমতার দৌড় দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তা আখিরাতে চলবে না। দুনিয়াতে যে যতো শক্তিশালী, ক্ষমতাবান ও দাপটওয়ালাই হোক, কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া টু শব্দটি করার অবস্থা থাকবে না। সেদিনের একচ্ছত্র অধিপতি হবেন আল্লাহ। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত এমনভাবে জীবন যাপন করা যেনো সে দিনের বিচারের রায় তার পক্ষে যায়।

(৮) সৃষ্টি ও জীবনের উদ্দেশ্য : আল্লাহর ইবাদত

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ এ প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে, সে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে (আয়াত-৪)। এখানে মানব-সৃষ্টির মহান

উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরেশতাসহ এমন কিছু সৃষ্টি আছে, যা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে নিমগ্ন আছে। কিন্তু তাতে তো আল্লাহর রাজত্বের পুরো প্রকাশ পায় না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন সৃষ্টি যারা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতকে শিরোধার্য করে নিয়ে আল্লাহতে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মসমর্পণ করে দেবে। এ মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ সৃষ্টি করেন মানুষ ও জিন জাতিকে। তাদের সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ বলেন, "আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[৩১৪]

অর্থাৎ ইবাদত ছাড়া জিন ও মানুষ সৃষ্টির আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এ ইবাদতের সারমর্ম হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য তথা আল্লাহর দেয়া আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মা'বুদ ও বান্দার, প্রভু ও দাসের। সম্পর্ক হলো ইবাদত ও দাসত্বের। এ দাসত্ব ও ইবাদত একান্তভাবে আল্লাহর জন্য। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা, রব, প্রতিপালক, মা'বুদ; আর মানুষ হলো 'আবদ' বা বান্দা, দাস। একটি দাসের কাজ যেমন একমাত্র মনিবের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা, তেমনি মানুষের কাজ হলো একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা তথা আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁরই দাসত্ব করা, তাঁরই আনুগত্য করা, তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। তাঁর আদেশ মান্য করা, পালন করা এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে আত্মরক্ষা করা। এটাই ইবাদতের অর্থ ও তাৎপর্য। এটাই মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইবাদত ও আনুগত্য হতে হবে পূর্ণাঙ্গ। একটা দাসের জন্য মনিবের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য বাধ্যতামূলক। মনিবের কিছু নির্দেশ মান্য করে এবং কিছু প্রত্যাখ্যান করে দাসত্বের সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব। ঠিক তেমনি শুধু নামায-রোযা ও বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত এবং ব্যক্তি জীবন সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিধি-নিষেধ মান্য করে কেউ আল্লাহর অনুগত বান্দা থাকতে পারে না। আল্লাহর ইবাদতের দাবি হলো প্রভু হিসেবে আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে তার বাস্তবায়ন করা। নামায-রোযা ও সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতসহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যারা কুরআন প্রদত্ত গোটা জীবন-ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে লক্ষ্য

---

৩১৪. আল-কুরআন ৫১ : ৫৬।

করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ঈমান আনো।"[৩১৫] তাদেরকে আল্লাহ ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন, যেনো তারাঈমানই আনেনি। তাদেরকে ইসলামের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে দাখিল হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩১৬] এক কথায় আল্লাহর ইবাদতের দাবি হলো আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করা এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন করা। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তথা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া আল্লাহর ইবাদত বা দাসত্ব পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আল্লাহর এরূপ ইবাদতই মানুষের করণীয়।

(৯) ইবাদতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইবাদতের জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এ ইবাদত না করতে পারলে মানব জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে এ প্রেক্ষিতে একটা দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। সহজ ভাষায় প্রশ্নটি হলো এই যে, এ ইবাদতের উদ্দেশ্য কি? ইবাদত থেকে কাম্য কি?

আসলে ইবাদতের অনেক উদ্দেশ্য চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথম, আল্লাহই স্রষ্টা ও প্রতিপালক, সুতরাং ইবাদত তাঁরই প্রাপ্য। দ্বিতীয়, আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর ইবাদত করতে হবে। তৃতীয়, ইবাদত হলো আল্লাহর নির্দেশ, যে জন্য মানুষের সৃষ্টি, কাজেই তাঁর ইবাদত করা প্রয়োজন। চতুর্থ, জাহান্নামথেকে মুক্তি লাভ এবং জান্নাত পাওয়ার জন্য ইবাদত দরকার। পঞ্চম, আল্লাহর ইবাদত করতে হবে তাঁকে ভালোবেসে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য, কোনো বিনিময়ের জন্য নয়।

ইবাদতের এসব উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কারো কারো মতে উপরে উল্লেখিত পঞ্চম উদ্দেশ্যটি অর্জনই ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহকেই পাওয়া। আল্লাহর নিয়ামত ও করুণার শুকরিয়া স্বরূপ ইবাদত নয়, কারণ এতসব নিয়ামতের যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অসম্ভব। আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যও ইবাদত নয়, বরং নির্দেশ পালনের চেয়ে ইবাদতে আরো বেশি স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত। আবার ইবাদত দোযখের ভয়ে বা জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যেও নয়। ভয়ে বা লোভে আল্লাহর ইবাদত করা তো স্বার্থপরতা। সুতরাং ইবাদত করা প্রয়োজন আল্লাহকে ভালোবেসে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহকে ভালোবেসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে যদি আল্লাহকে পাওয়া যায়, তা হলে তো সবই পাওয়া হলো।

---

৩১৫. আল-কুরআন ৪ : ১৩৬।
৩১৬. আল কুরআন ২ : ২০৮।

কিন্তু প্রতিটি মানুষের পক্ষে এরূপ আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থা অর্জন করা কঠিন। এরূপ অবস্থা কাম্য হতে পারে, অবশ্যকর্তব্য নয়। এজন্যই কুরআনে তাগিদ করা হয়েছে ভয় ও আশা (خَوْفٌ وَطَمَعٌ) সহকারে আল্লাহকে ডাকার জন্য।[৩১৭]

সুতরাং আল্লাহকে ডাকা এবং তাঁর ইবাদত করা উচিত তাঁকে ভালোবেসে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়, যার সাথে থাকবে আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং ক্ষমা ও মুক্তির আশা। মূল কথা, ইবাদতের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়, বরং মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সন্তুষ্টি। এ অর্থেই মুসলমানদের সকল ইবাদতেরর উদ্দেশ্য হলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। "বলো, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একান্তভাবে আল্লাহর জন্য যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।"[৩১৮]

(১০) তাওহীদ বা একত্ববাদ

'ইয়্যাকা না'বুদু' বলে এ বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত করিনা (আয়াত-৪)। এর পূর্বের বর্ণিত তিনটি আয়াতে নাস্তিকতা নাকচ করে আস্তিকতা তথা আল্লাহর অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। আর সাথে সাথে স্রষ্টা আল্লাহর রবুবিয়্যত, বিচার দিনের একমাত্র মালিক এবং সকল প্রশংসার অধিকারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে তাওহীদ ও একত্ববাদের বিশ্বাসও অন্তর্নিহিত আছে।

এরপর চতুর্থ আয়াতে একান্তভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করার অঙ্গীকার এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে আরো প্রত্যক্ষভাবে তাওহিদ বিশ্বাসের অবতারণা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা করানো হয়েছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করিনা, বরং একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, অন্য কোন উপাস্য নেই। ইবাদত হলো একমাত্র আল্লাহর, কারণ তিনি এক ও একক, একমাত্র তিনিই স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এ বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ আরো স্পষ্টভাবে বলেন, "আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ (মা'বুদ বা উপাস্য) নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো।"[৩১৯] "আর তারা এক ইলাহ (মা'বুদ বা উপাস্য)-এর ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে (তাঁর সাথে অংশীদার হিসেবে) শরিক বানায়, তা থেকে তিনি কতো পবিত্র!"[৩২০]

---

৩১৭. আল-কুরআন ৭ : ৫৬; ৩২ : ১৬।
৩১৮. আল-কুরআন ৬ : ১৬২।
৩১৯. আল-কুরআন ২০ : ১৪।
৩২০. আল-কুরআন ৯ : ৩১ভ

সূরা ফাতিহায় "ইয়্যাকা না'বুদু" বলে বলিষ্ঠভাবে তাওহীদ ও একত্ববাদের এ ঘোষণাই দেয়া হচ্ছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হবে না। ইবাদত করতে হবে একান্তভাবে আল্লাহর, অন্য কারো নয়। ইবাদত যদি একান্তভাবে আল্লাহর না হয়, বরং তাতে অন্যকে শরিক করা হয়, তবে তা হবে শির্ক। শির্ক অমার্জনীয় অপরাধ।[৩২১] শির্ক দুই প্রকার: আকীদার শির্ক এবং আমলের শির্ক। আকীদার শির্ক হলো একাধিক উপাস্য মান্য করা এবং উপাসনায় আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা। যেমন, খ্রিস্টানরা ট্রিনিটি বা তিন উপাস্যে বিশ্বাস করে।[৩২২]

আর আমলের শির্ক হলো, আল্লাহর আনুগত্যের সাথে অন্যেরও আনুগত্য করা, যা আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। কর্মকাণ্ডে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা, আল্লাহকে উপাস্য স্বীকার করার পরও আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে অন্যের বিধান মেনে নেয়া; আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক মানব-রচিত জীবন-বিধান মান্য করা এবং সেমতে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং সমাজ চালানো, ইত্যাদি। অর্থাৎ এক আল্লাহতে বিশ্বাস সত্ত্বেও বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা। আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহ বিরোধী, আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন মতবাদ, ইজম, বা বিধানকে মান্য করা যাবে না। কারণ, এর দ্বারা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরিক করা হবে, আর প্রকারান্তরে আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে। এ মর্মেই আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি বা যারাই আল্লাহর নাযিলকৃত (আদর্শ) অনুযায়ী বিধান দেয়না, বা বিচার ফয়সালা করে না তারাই হচ্ছে কাফির।"[৩২৩] অন্যত্র আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনকারীকে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্য বিধান অনুসরণকারীকে যালিম ও ফাসিক বলে অভিহিত করা হয়েছে।"[৩২৪]

এখানে উল্লেখ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এমন কোন বিধি-বিধান ও আইন রচনা এবং বাস্তবায়নে কোন বাধা নেই যা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থেই প্রায়োগিক বিধি-বিধান প্রয়োজন।

(১১) মানুষের স্বাধীনতা

"আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি", এ ঘোষণায় এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ হলো স্বাধীন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সে মাথা নত করবে না। কোন মানুষ, কোন সৃষ্টি, বা কোন সাংঘর্ষিক মতবাদের প্রতি মানুষের কোন আনুগত্য নেই। মানুষের শির চির উন্নত ও স্বাধীন। সে মাথা নত করবে

---

৩২১. আল-কুরআন ৪ : ৪৮।
৩২২. আল-কুরআন ৫ : ৭৩।
৩২৩. আল-কুরআন ৫ : ৪৪।
৩২৪. আল-কুরআন ৫ : ৪৫, ৪৭।

একমাত্র আল্লাহর নিকট, অন্য কারো নিকট নয়। সাধারণত: মানুষ তিনভাবে অন্য মানুষ বা মানব স্বার্থ বিরোধী অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং আনুগত্যের শিকার হয়। প্রথম, ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে কখনো কখনো মানুষ অন্য মানুষকে পূজনীয় আসনে বসিয়ে আনুগত্যের শিকলে বন্দী হয়ে যায়। যেমন, কোনো কোনো ধর্মে রয়েছে ধর্মযাজকদের প্রতি পূজনীয় পর্যায়ের আনুগত্য। দ্বিতীয়, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ এবং স্বৈরতন্ত্রী শাসকরাও অনেক সময় সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। তৃতীয়, কখনো কখনো মানুষ ভ্রষ্টতার আবর্তে মানবরচিত কোন সাংঘর্ষিক মতবাদ অথবা বাতিল ধর্ম-বিশ্বাসে এমনভাবে দীক্ষিত হয়ে পড়ে যে, সে তার স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি হারিয়ে বসে।

আল্লাহর কোন সৃষ্টি বা মানব-রচিত মতবাদের এরূপ অধীনতা ও আনুগত্য থেকে মানুষের মুক্তির কথা কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কুরআনের তিনটি উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে।

(১) "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত-পুরোহিত-পাদ্রী ও সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীদেরকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকেও। অথচ তারা এক মা'বুদের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল।"[৩২৫] (২) "আইন ও বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন তোমরা যেনো তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত না করো।"[৩২৬] (৩) "নিঃসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন (জীবন-ব্যবস্থা)।"[৩২৭]

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ মানুষকে মানব-পূজা থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কেননা মানব স্বার্থ বিরোধী আইন রচনার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। তৃতীয় আয়াতে ইসলাম ছাড়া অন্য সকল বাতিল ধর্ম-বিশ্বাস থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

এভাবে সূরা ফাতিহার চতুর্থ আয়াতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের ঘোষণার মধ্যে সকল সৃষ্টির দাসত্ব ও অধীনতা থেকে মানুষের মুক্তির যে পয়গাম রয়েছে, যা অন্যত্র আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টির গোলামী ও অধীনতা থেকে মুক্ত, স্বাধীন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ দেশের আইন-শৃঙ্খলা মান্য করবে না।

---

৩২৫. আল-কুরআন ৯ : ৩১।
৩২৬. আল-কুরআন ১২ : ৪০।
৩২৭. আল-কুরআন ৩ : ১৯।

যতোক্ষণ পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলার বিধি-বিধান আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধানের সামগ্রিক ও নৈতিক কাঠামোর আওতায় থাকে, সে বিধি-বিধান মেনে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে, কারণ তা আল্লাহর বিধানেরই ছায়া স্বরূপ।

(১২) ইবাদতের সামষ্টিকতা ও সামষ্টিক জীবনের গুরুত্ব

"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি" বাক্যটির বাচনভঙ্গি লক্ষণীয়। এখানে "আমি" এর পরিবর্তে "আমরা" অর্থাৎ একবচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও পাঠক একাই সূরা ফাতিহা পাঠ করে। একবচনে বলা যেতো "আমি একমাত্র তোমারই ইবাদত করি।" তা না করে এখানে একবচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি"। এভাবে এখানে ইবাদতের সামষ্টিকতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সামষ্টিকভাবে আল্লাহর নিকট ইবাদতের অঙ্গীকার প্রদান করা এবং একাকী নামায না পড়ে জামাতে সামষ্টিকভাবে নামায পড়ার মধ্যে ইবাদতের সামষ্টিকতা প্রকাশিত হয়। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই, এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যেও সে ভ্রাতৃত্ব ও সামষ্টিকতার প্রতিফলন রয়েছে। আসলে ইসলামী জীবনাদর্শে আদর্শিক ও জাগতিক সকল ব্যাপারেই জাতীয় ঐক্য ও সামষ্টিকতার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[৩২৮]

(১৩) মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অমুখাপেক্ষী নয় : দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে সাহায্য প্রয়োজন

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় অংশ হলো 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' (আমরা শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি)। এ প্রার্থনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং এর দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অমুখাপেক্ষী নয়, বরং সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর সে কারণেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। দুনিয়া ও আখিরাত, পার্থিব কর্মকাণ্ড ও ইবাদত, সকল ব্যাপারেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

শরীর ও মন, দু'দিক দিয়েই মানুষ দুর্বল। শারীরিক দিক দিয়ে মানবদেহে কোন কোন জীবজন্তুর সমান শক্তিও নেই। বুদ্ধিবৃত্তিক মাপকাঠিতে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের জ্ঞান অধিক থাকলেও আল্লাহর জ্ঞান-প্রজ্ঞার তুলনায় তা অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। অপরদিকে সকল শক্তির উৎস ও আধার হলেন আল্লাহ। তিনি মুখাপেক্ষিতাহীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।[৩২৯]

সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রয়োজন সত্যপথ পাওয়ার জন্য। মানুষের ক্ষুদ্র

---

৩২৮. আল-কুরআন : ৩ :১০৩।

৩২৯. আল কুরআন ৩৫ : ১৫; ৪৭ : ৩৮।

জ্ঞানের সাহায্যে সত্য, সঠিক, সোজা পথের হিদায়াত পাওয়া কঠিন। সত্যপথ পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা থাকতে হবে বটে, তবে সে প্রচেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকলে হিদায়াত পাওয়া সহজ হয়।

সত্যপথ পাওয়ার পর তা অনুসরণের জন্যও আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। অন্যায় ও নিষিদ্ধ জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়। অন্যায় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ আকর্ষণীয় হয়। প্রবৃত্তি মানুষকে সেদিকে টানে। সমাজের কলুষিত অংশও সেদিকে আকর্ষণ করে। শয়তানও সেদিকে প্ররোচিত করে। প্রবৃত্তি, শয়তান ও পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করে প্রবৃত্তির কামন-বাসনা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি, মযবুত ঈমান ও দৃঢ় মানসিক শক্তির প্রয়োজন। সেজন্য প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো খুব সহজ নয়। প্রাতের মধুর নিদ্রা ত্যাগ করে ফজর নামায আদায় করা, প্রত্যেক দিনের পাঁচটি নির্দিষ্ট সময় সকল কর্মকাণ্ড, ব্যস্ততা ও আনন্দফূর্তি ছেড়ে নামাযে উপস্থিত হওয়া আল্লাহ-ভীরু লোকদের ছাড়া সত্যিই কঠিন।[৩৩০]

রমযানে দীর্ঘ এক মাস ধরে রোযা রাখা, কষ্টার্জিত ধন বিনা স্বার্থে অন্যকে দিয়ে দেয়া (যাকাত) ইত্যাদি ইবাদতগুলোও সহজ নয়। এসব ইবাদত আঞ্জাম দেয়ার জন্য বলিষ্ঠ ঈমান ও মনোবল প্রয়োজন। মানুষের চেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকলে তা সহজ হয়ে যায়।

আনুষ্ঠানিক ইবাদতকে গুণ ও মানগত দিক দিয়ে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তার পূর্ণ ফয়দা পাওয়াও সহজ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যেকোনো ভালো কাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত দেয়া হয়। তা নির্ভর করে ইবাদতে নিষ্ঠার উপর, আর কতটুকু সুন্দর ও নিখুঁতভাবে তা করা হলো তার উপর। ইবাদত হওয়া উচিত পূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে, একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মানুষের চেষ্টার সাথে যদি আল্লাহর সাহায্য থাকে, তা হলে প্রতিটি ইবাদতকে এমন নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে এবং কাঙ্ক্ষিত মানে সম্পন্ন করা সম্ভব।

দুনিয়ার কর্মকাণ্ড ও সাফল্য অর্জনের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক নীতি হলো এই যে, কার্যকারণ (causes) অনুযায়ী কার্যফল (effects or results) পাওয়া যায়। চেষ্টার মাধ্যমেই সবকিছু অর্জন করতে হয়।[৩৩১] কিন্তু শুধু চেষ্টা দ্বারা সব সময় সবকিছু পাওয়া যায় না। এমনও দেখা যায় যে, অনেক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিও তেমন পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয় না, যদিও তাদের চেষ্টা তদবীরে কোন ত্রুটি থাকে না। অন্যদিকে অল্প প্রজ্ঞাসম্পন্ন অনেকে অল্প চেষ্টাতেই বিরাট

---

৩৩০. আল-কুরআন ২:৪৫।

৩৩১. আল কুরআন ৫৩ : ৩৯।

সাফল্যের অধিকারী হয়ে যায়। মানুষের চেষ্টার সাথে যদি আল্লাহর সাহায্য থাকে, তা হলে দুনিয়ার সাফল্য সহজেই অর্জিত হতে পারে। আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়ার রাজত্ব দেয়া নেয়া আল্লাহরই কাজ।[৩৩২]

অতএব কথা দাঁড়ালো এই যে, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অমুখাপেক্ষী নয়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে অর্জন ও সাফল্যের জন্য 'চেষ্টা' হলো 'যরূরী শর্ত' (necessary condition), কোনমতেই তা 'যথেষ্ট শর্ত' (sufficient condition) নয়। 'যথেষ্ট শর্ত' হলো আল্লাহর সাহায্য। কাজেই সকল ব্যাপারেই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

(১৪) সাহায্যের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ : কেবল মাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা

'ইয়্যাকা নাস্তাঈন'' দ্বারা বুঝা যায়, মানুষের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন, যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ বক্তব্যের আরেকটি দিক হলো এই যে, শুধু আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে, অন্য কারো নিকট নয়। কেননা, ভালো-মন্দ সহায়-সম্পদ সবকিছুর স্রষ্টা ও দাতা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছা ব্যাতীত কেউ কোন কিছু পেতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কারো কোন বিপদ আসতে পারে না, বিপদ দূরও হতে পারে না। পাওয়া না পাওয়া সবই আল্লাহর ইচ্ছায়। সুতরাং কোন কিছু প্রার্থনা করতে হলে তাঁরই নিকট করা উচিত। অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা ঠিক নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে মানুষে মানুষে একে অপরকে সাহায্য করার তাগিদ দেয়া আছে। মানুষ বিপদে একে অপরকে সাহায্য করবে, একে অপরের সাহায্য নেবে। এভাবে সমবেদনার অনুভূতি সম্পন্ন সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় একটি সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তা হলে প্রশ্ন উঠে, আলোচ্য আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্য প্রার্থনা না করার অর্থ কি? এর সহজ উত্তর হলো এই যে, মানুষের সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া ও নেয়া যাবে, কিন্তু মানুষকে সাহায্যের একচ্ছত্র অধিকারী বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তার নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে না। আল্লাহর ও মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কখন কীভাবে এবং কোন ক্ষেত্রে মানুষের সহযোগিতা নেয়া যাবে, একটু ব্যাখ্যা করলে তা বুঝতে সহজ হবে।

প্রথম : কাউকে ভালো-মন্দের নিয়ন্তা, ত্রাণকর্তা বা সর্বময় ক্ষমতাবান মনে করে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। বিষয়টির আরেকটু গভীর ভাবে উপলব্ধি করা দরকার। যেকোনো কর্মে থাকে কার্যকারণ ও কার্যফল, এছাড়াও থাকতে পারে কার্য উপকরণ বা কার্যমাধ্যম। একচ্ছত্র কার্যকারণ (absolute

---

৩৩২. আল কুরআন ৩ : ২৬।

cause) হলেন আল্লাহ। জমিতে কৃষক বীজ বপন করলে, চারা জন্মে, গাছটি বড় হয়, তাতে ফল হয়। বীজ থেকে চারা অঙ্কুরিত হওয়া, মাটি থেকে রস আহরণ করা, গাছ হওয়া, গাছ বড় হওয়া, ফুল ও ফল দেয়া ইত্যাদি গুণ, বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা আল্লাহরই দান। অর্থাৎ ফসল উৎপন্ন হওয়া এবং ফল দেয়ার একচ্ছত্র কার্যকারণ হলেন আল্লাহ, যদিও অপরদিকে বলা যায় যে, কৃষকের চাষ ও বীজ বপনের কারণেই ফসল উৎপন্ন হয়। এখানে আসলে ফসল উৎপন্ন হওয়ার মৌলিক ও একচ্ছত্র কার্যকারণ হলেন আল্লাহ, আর কৃষক হলো কার্য উপকরণ বা কার্য-মাধ্যম। বীজ বপন করা হলো মানুষের কাজ, আর তাকে অংকুরিত করে ফলবতি করা আল্লাহর কাজ। এ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কার্য উপকরণের মাধ্যমে আল্লাহই ফসল উৎপাদন করেন। অর্থাৎ বীজ বপন করা হলো মানুষের কাজ, আর তাকে অংকুরিত করে ফলবতী করা আল্লাহর কাজ।

সুতরাং ভালো ফসলের জন্য আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, অন্য কারো নিকট নয়। কিন্তু সে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে চাষবাসের পর। এখানে কৃষকের কাজ হলো ভালো ফসলের যরূরী শর্ত, আর আল্লাহর সাহায্য হলো যথেষ্ট শর্ত। এ যরূরী শর্ত পূরণের বেলায় মানুষের সাহায্য নেয়া যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর একচ্ছত্র ও প্রকৃত কার্যকারণ বিশ্বাস করে কাজের মাধ্যম হিসেবে মানুষের সহযোগিতা চাওয়াতে কোন বাধা নেই।

দ্বিতীয় : এমন বিশ্বাস করাও অনুচিত যে, প্রকৃত দাতা তো স্বয়ং আল্লাহ, তবে এ দানের প্রক্রিয়ায় মানুষও অন্তর্ভুক্ত, যাতে মানুষও দানের একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়। এতে করে আল্লাহরই কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মকারণ বলে বিশ্বাস করা হয়। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে একচ্ছত্র ও সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান বিশ্বাস না করেও কারো সাথে এমন আচরণ করা হয় যা শিরকের পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, অল্প সংখ্যক হলেও কেউ কেউ এমন ভ্রান্ত ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সবকিছু দেন, আর রাসূল তা স্বাধীনভাবে যাকে যতটুকু ইচ্ছা বরাদ্দ দেন। তারা বিশেষ কিছু পেতে চাইলে রাসূলের নিকট চায় যদিও সাথে সাথে তারা আল্লাহর নিকটও দু'আ করে। এ ধরনের বিশ্বাসকে কুরআনে খণ্ডন করা হয়েছে। এমন আচরণ নিষিদ্ধ করে আল্লাহ বলেন,"তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করো, তারা তোমাদের রিযকের মালিক নয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট রিযক প্রার্থনা করো এবং তাঁরই ইবাদত করো।"[৩৩৩] এ থেকে বুঝা যায়, কাউকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় বলীয়ান মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। এতে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার মাত্রা সংকুচিত হয়। এটি নিঃসন্দেহে শির্ক।

---

৩৩৩. আল-কুরআন ২৯ : ১৭।

তৃতীয় : আল্লাহর কোন সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ করা নিষিদ্ধ যা শির্কের পর্যায়ে পড়ে। যেমন, কেউ কেউ দুনিয়ার কিছু লাভ করার জন্য বা মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দরগাহ বা মাজারে গিয়ে কবরে শায়িত ব্যক্তির আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করে। কেউ পীর-পুরোহিতের সাহায্য চায়। কখনো কখনো তাদের আচরণ উপাসনার পর্যায়ে উপনীত হয়। এমন কি কেউ কেউ কবরকে সিজদাও করে। এটি নিঃসন্দেহে শির্ক এবং নিষিদ্ধ।

চতুর্থ: আখিরাতের ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া, হিদায়াতের পথে থেকে এবং সে পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্যের জন্য একমাত্র আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করতে হবে। এ ব্যাপারে অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না। তৎকালীন আরবের মুশরিকরা একজন প্রধান বিধাতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও বহু দেবতা ও ফেরেশতার উপাসনা করতো। তারা মনে করতো এসব দেবতা প্রধান বিধাতার সান্নিধ্য বা সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করবে। তারা বলতো, "আমরা তো এদের ইবাদত এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।"[৩৩৪]

এমন আচরণের কঠোর সমালোচনা করে শুধু আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩৩৫] তবে কুরআন-হাদিস ও দীন সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই, তারা জ্ঞানের জন্য জ্ঞানী ও আলেম ব্যক্তিগণের সাহায্য নেবে। তা শুধু অনুমোদিত নয়, বরং উৎসাহিত। সারকথা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য হাসিল করে দেয়ার জন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না। কাউকে সে সাহায্যের মালিক ও অধিকারী মনে করা শিরকের শামিল, যা নিষিদ্ধ।

পঞ্চম : আল্লাহকেই একচ্ছত্র ক্ষমতাবান ও দাতা হিসেবে বিশ্বাস করা, আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করা। তবে বিপদে কারো সাহায্য চাওয়া, ক্ষুধার সময় স্বচ্ছলদের নিকট অন্ন চাওয়া, কোন সংস্থার ব্যবস্থাপকের নিকট চাকরীর জন্য দরখাস্ত করা, এসব চাওয়ার মাঝে আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার কোন বিশ্বাস জড়িত নয়। চাওয়া ও প্রার্থনা আল্লাহরই নিকট, তবে পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট প্রার্থনা করলে বা চাইলে তা নিষিদ্ধ নয়। সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা, দান গ্রহণ, চাওয়া ও পাওয়ার ব্যাপারে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় উৎসাহিত করা হয়েছে। এরূপ সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

(১৫) হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা

পঞ্চম আয়াতে রয়েছে আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা। লক্ষ্যণীয়, সূরা ফাতিহার প্রথম দিকে আল্লাহর প্রশংসা ও ইবাদতের অঙ্গীকারের পর তাঁর

---

৩৩৪. আল-কুরআন ৩৯ :৩।

৩৩৫. আল-কুরআন ৩৯:২-৩।

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় সাহায্য হলো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথের হিদায়াত। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও মুক্তির জন্য সে হিদায়াত অপরিহার্য। এ হিদায়াতের জন্য প্রবল কামনা থাকতে হবে। চেষ্টা থাকতে হবে। আল্লাহর নিকট হিদায়াত চাইতে হবে এবং সে জন্য দু'আ করতে হবে। সূরা ফাতিহার অন্যতম প্রধান বিষয় হলো হিদায়াত কামনা ও দু'আ। এটাই হলো সূরা ফাতিহার প্রধান দু'য়া।

হিদায়াত একটা ব্যাপক শব্দ। ইসলামী পরিভাষায় হিদায়াত দানের অর্থ হলো সরল সোজা সত্য পথ দেখানো, সে পথে পরিচালিত করা, দৃঢ়পদ রাখা, এবং এভাবে গন্তব্যস্থলে পৌছে দেয়া। সুতরাং আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সোজা সত্য পথ প্রদর্শন করো, সে পথে পরিচালিত করো। সে পথে দৃঢ়পদ রাখো, এবং সে পথে পরিচালিত করে আমাদেরকে গন্তব্যস্থল বেহেশ্‌তে পৌঁছে দাও। এ পথে চলে দুনিয়াতে যে কল্যাণ পাওয়া যায়, তা দাও। আর আখিরাতে যে মুক্তি ও সাফল্য পাওয়া যায়, তা দান করো। সকল বাতিল, মিথ্যা ও অসত্য পথ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো এবং সে পথের অকল্যাণ, অমঙ্গল ও কুফল থেকে দুনিয়াতে আমাদেরকে রক্ষা করো এবং আখিরাতেও এর করুণ পরিণাম থেকে বাঁচাও। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, পর্যায় ও শাখা-প্রশাখায়, এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি বিভাগের চিন্তা, কর্ম ও বিধি-বিধান তথা গোটা জীবন-ব্যবস্থায় যা সত্য, নির্ভুল ও কল্যাণময় তা-ই আমাদের দেখাও এবং সেপথে চলার তাওফীক দান করো।

নিজ চেষ্টায় সত্য ও সোজা পথ খুঁজে নেয়ার জন্য যে পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন সে তুলনায় মানুষের জ্ঞান নিতান্ত কম ও অপ্রতুল। ক্ষুদ্র জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কী মানুষের জন্য কল্যাণকর, আর কী অকল্যাণকর। সুতরাং দেখা যায়, মানুষ একবার যে মতবাদ দেয়, পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়। এভাবে মানব রচিত মতবাদগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা মানুষের নিকটই ধরা পড়ে। ফলে সে আবার অন্য মতবাদ দেয়। পরে তাও আবার অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়। এভাবে ভুলের পর ভুল হতেই থাকে। যেমন, একসময় পুঁজিবাদকে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা মনে করা হতো। কিন্তু তা যখন কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হলো, বরং শোষণ ও বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হলো, তখন সমাজতন্ত্র নামক আরেকটি মতবাদ তৈরি হলো। কিন্তু তাতে কল্যাণ থেকে আরো বেশি অকল্যাণ হলো। আজ বিশ্বমানবতা সেটাও ত্যাগ করলো। কিন্তু কল্যাণ ও মুক্তি কোথায়? আসলে সে মুক্তি ও কল্যাণ রয়েছে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থায়, যিনি ভালো করে জানেন কোন ব্যবস্থায় আমাদের কল্যাণ আছে। তা হলো ইসলাম, সত্য দীন, সত্যপথ। কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষের পক্ষে সে

সত্যপথ খুঁজে নেয়া অসম্ভব। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকেই হিদায়াত প্রয়োজন। এদিকে ইঙ্গিত করেই প্রথম মানবকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় আল্লাহ বলেছিলেন, যারা দুনিয়াতে আমার প্রেরিত হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই।[৩৩৬] তারা আবার বেহেশতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

গোটা সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি রহস্যে গভীর চিন্তা করলে মানুষ হয়তো এতোটুকু বুঝতে পারবে যে, এর পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন, কিন্তু সে স্রষ্টার পূর্ণ পরিচয় নিজেই খুঁজে পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হিদায়াত পাওয়ার জন্য চেষ্টার সাথে সাথে এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। এ দুয়ের সমন্বয় থাকলে হিদায়াত পাওয়া সহজ হয়।

(১৬) হিদায়াত পাওয়ার শর্ত

আল্লাহর নিকট আমরা হিদায়াত প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুলও করেন। কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা দু'আ করো, আমি তার জবাব দেবো (কবুল করবো)।"[৩৩৭] প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে কি হিদায়াতের জন্য আমাদের এ দু'আর কোন জবাব আল্লাহ দিয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, হ্যাঁ, আল্লাহ এ র জবাব দিয়েছেন। সূরা ফাতিহার পরের সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারার প্রথমেই বলা হয়েছে, এ কুরআনই হলো হিদায়াত, যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।[৩৩৮]

কিন্তু সবাই কুরআন থেকে হিদায়াত তথা সত্য সোজা পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম) - এর হিদায়াত পাবে না। সিরাতুল মুস্তাকীমে হিদায়াতের প্রেক্ষাপটে কুরআনে যেসব বক্তব্য রয়েছে, তা থেকে হিদায়াতের কয়েকটি শর্ত পাওয়া যায়।

প্রথম শর্ত: সিরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াত পাওয়ার শর্ত হলো সত্য অনুসন্ধানের ইতিবাচক মানসিকতা, এবং সে পথে চলার প্রবল কামনা, বাসনা, আকাংখা ও প্রত্যয়। বাতিলের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভীত হয়ে তা থেকে বাঁচার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি, এবং সত্যপথে চলার মযবুত অঙ্গীকার। এমন মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকেই ইসলামী পরিভাষায় তাক্ওয়া বলা হয়। কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার শর্ত হলো সেই তাকওয়া, অর্থাৎ তাক্ওয়ার মানসিকতা। তা না হলে কুরআনী জীবনব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে মুগ্ধ হওয়া যাবে; কিন্তু হিদায়াত পাওয়া যাবে না। এ অর্থেই বলা হয়েছে, কুরআন হলো তাকওয়ার অধিকারীদের জন্য হিদায়াত।[৩৩৯]

---

৩৩৬. আল-কুরআন ২ : ৩৮।
৩৩৭. আল-কুরআন ৪০ : ৬০।
৩৩৮. আল-কুরআন ২ : ২।
৩৩৯. আল-কুরআন ২:২।

দ্বিতীয় শর্ত: যেহেতু কুরআনই হিদায়াত, অর্থাৎ কুরআনেই হিদায়াতের পথ বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু তাকওয়ার মন-মানসিকতা নিয়ে কুরআন পাঠ করতে হবে, এবং কুরআনে প্রদত্ত জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্ত হলো কুরআন পাঠ করা এবং তা গ্রহণ, ধারণ ও অনুসরণ করা। উল্লেখ্য, কুরআন প্রদত্ত ইসলামী জীবনাদর্শের কিছু বিষয় আছে ইতিবাচক, আর কিছু বিষয় নেতিবাচক। ইতিবাচক হলো করণীয় বা কর্তব্য কাজ। আর নেতিবাচক হলো বর্জনীয় বা নিষিদ্ধ কাজ। গোটা কুরআনে কর্তব্য কাজের নির্দেশ রয়েছে, অপর পক্ষে আছে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ কাজের বর্ণনা। কাজেই হিদায়াত চাইলে কুরআন অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয় শর্ত: হিদায়াত পেতে হলে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। কারণ কুরআনে বর্ণিত আদর্শের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা রয়েছে হাদিসে। কুরআনে আছে, "নামায কায়েম করো" এবং "যাকাত আদায় করো", ইত্যাদি। কিন্তু কীভাবে তা করতে হবে রাসূলই তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ হিসেবে বলা যায়, আল্লাহর রাসূল হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, আর আল্লাহই রাসূলকে সে হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন।[৩৪০] সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩৪১] আর বলা হয়েছে, রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য সম্ভব।[৩৪২] কাজেই হিদায়াত পাওয়ার শর্ত হলো রাসূলের আদর্শ মেনে চলা। রাসূলের সুন্নাহ বা হাদিসকে অস্বীকার করে শুধু কুরআন দ্বারা হিদায়াত পাওয়া যাবে না।

চতুর্থ শর্ত : হিদায়াত পেতে হলে শুধু হিদায়াতের কামনা, জ্ঞান ও তা অনুসরণের ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, বরং তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও থাকতে হবে। পথ পেয়ে কেউ যদি বসে থাকে এবং সে পথে চলার চেষ্টা না করে, তা হলে তার জন্য সে পথে চলা সম্ভব হবে না। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই হিদায়াত দেয়ার ওয়াদা করেছেন, যারা হিদায়াতের পথে চলার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। "আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে হিদায়াত দান করবো।"[৩৪৩] সুতরাং হিদায়াত পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো কুরআন ও সুন্নাহ তথা আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য চেষ্টা করা।

---

৩৪০. আল-কুরআন ৯ : ৩৩।

৩৪১. আল-কুরআন ৩ : ৩২; ৫ : ৯২।

৩৪২. আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করলো," (আল-কুরআন ৪ : ৮০)।

৩৪৩. আল-কুরআন ২৯ : ৬৯।

(১৭) সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ

আমরা আল্লাহর নিকট 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বা সোজা পথের হিদায়াত প্রার্থনা করি (আয়াত-৫)। 'সিরাতুল মুস্তাকীম' মানে সোজা পথ। এখন জানা দরকার, সোজা পথ কি, আর সে পথের গন্তব্যস্থল কোথায়। গন্তব্যস্থল হলো জান্নাত, যেখান থেকে আমাদের আদি পিতা আদম ও আদি মা হাওয়া দুনিয়াতে এসেছিলেন। সে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় আগমনের সময় আল্লাহ বলেছিলেন, দুনিয়াতে মানুষের নিকট আল্লাহর হিদায়াতের রোডম্যাপ বা নির্দেশনা আসবে। যারা হিদায়াত গ্রহণ করবে তাদের কোন ভয় নেই। তারা সোজা পথ ধরে আবার বেহেশতে ফিরে যেতে পারবে। পৃথিবী থেকে যে পথ ধরে আবার বেহেশতে ফিরে যাওয়া যাবে, তা-ই হলো সোজা পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম। আর এ পথের গন্তব্যস্থল হলো জান্নাত।

সিরাতুল মুস্তাকীম কি?

আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা ইসলামই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম। আল্লাহর কিতাব কুরআনে আছে এর বর্ণনা, রাসূলের আদর্শে আছে এর ব্যাখ্যা, আর ইবাদতের মাধ্যমে হয় এর বাস্তবায়ন। এ হিসেবে আল্লাহর দীন ইসলাম, কুরআন, রাসূলের আদর্শ এবং ইবাদত, এর প্রতিটির উপরই সিরাতুল মুস্তাকীম কথাটি প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন,

(১) قُلْ إِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا -

(২) إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ -

(৩) الم - ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-

(৪) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

(৫) إِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

(১) "বলো, আমার প্রতিপালক আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াত দান করেছেন, যা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দীন।"[৩৪৪]

(২) "নিঃসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন (জীবন-ব্যবস্থা)।"[৩৪৫]

(৩) "আলিফ-লাম-মীম। এটি হলো সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ

---

৩৪৪. আল-কুরআন ৬ : ১৬১।

৩৪৫. আল-কুরআন ৩ : ১৯।

নেই, যা হলো মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।"[৩৪৬]

(৪) "সুতরাং তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। নিঃসন্দেহে তুমি সিরাতুল মুস্তাকীমে রয়েছ।"[৩৪৭]

(৫) "নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার রব (প্রতিপালক) এবং তোমাদেরও রব, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম।"[৩৪৮]

প্রথম আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর দীনই সিরাতুল মুস্তাকীম। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দীন। অর্থাৎ ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দীন বা সিরাতুল মুস্তাকীম। তৃতীয় আয়াতে বুঝা যায়, কুরআন হলো সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রতি হিদায়াত। অর্থাৎ কুরআনই সিরাতুল মুস্তাকীমের দলিল। চতুর্থ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, রাসূলের আদর্শ সিরাতুল মুস্তাকীম। রাসূল (সা) মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্র ও পর্যায় সম্পর্কে উত্তম আদর্শ দিয়েছেন। এগুলোই রাসূলের আদর্শ। রাসূল নিজে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করেছেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের আদর্শ বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কাজেই রাসূলের আদর্শই সিরাতুল মুস্তাকীম।[৩৪৯]

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু মুখে মুখে সোজা পথের স্বীকৃতি দিলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যাবে না। বরং সেখানে পৌঁছতে হলে সে পথে চলতে হবে। অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা শিরোধার্য করে মেনে নিয়ে জীবনে তার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটা দাস যেমন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মনিবের নিকট সমর্পণ করে দেয়, তেমনি আল্লাহর প্রতিটি বান্দার দায়িত্ব হলো আল্লাহর বন্দেগীতে আত্মসমর্পণ করে গোটা জীবনটাকেই ইবাদতে পরিণত করা। এ হিসেবে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তথা জীবন ঘনিষ্ঠ সার্বিক ইবাদতই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম। সুতরাং উপরে উল্লেখিত পঞ্চম আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর ইবাদতই সিরাতুল মুস্তাকীম। জীবনকে ইবাদতে পরিণত করার জন্য নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সাথে ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়েই আল্লাহর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। তখনই গোটা জীবন হবে ইবাদতময়। এরূপ ইবাদতই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম।

কাজেই কথা দাঁড়ালো এই যে, আল্লাহর দেয়া দীন তথা ইসলামই সিরাতুল

---

৩৪৬. আল-কুরআন ২ : ১-২।
৩৪৭. আল-কুরআন ৪৩ : ৪৩।
৩৪৮. আল-কুরআন ৩ : ৫১।
৩৪৯. এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মুস্তাকীম, যার দলিল হলো কুরআন, যার বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে রাসূলের আদর্শে। আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোসহ গোটা জীবনে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হলো প্রকৃত ইবাদত। তা-ই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম।

(১৮) নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের পরিচয়

আল্লাহর নিকট আমাদের দু'য়া হলো সোজা পথে হিদায়াতের জন্য, যা নিয়ামত প্রাপ্তদের পথ (আয়াত-৬)। নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথ কোনটি? আর নিয়ামতপ্রাপ্তই বা কারা? আসলে মুসলিম-অমুসলিম,কাফির-মুশরিক, ইহুদি-খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-হিন্দু সবাই তো আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত। দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি, শোনার জন্য শ্রবণশক্তি, চলার জন্য পা, সুস্বাস্থ্য, জীবন ধারণের জন্য খাবার ও পানীয়, আশ্রয়, রোগমুক্তির জন্য আরোগ্যের ব্যবস্থা, এগুলোর সবই আল্লাহর নিয়ামত। সবাই এসব নিয়ামত পাচ্ছে। মানুষ তো পাচ্ছেই, এমনকি প্রাণী ও জন্তু-জানোয়ারও এসব নিয়ামতে সিক্ত। এসব নিয়ামত হলো সাধারণ নিয়ামত। মানুষ-অমানুষ, বাধ্য-অবাধ্য সবাই এসব নিয়ামত পায়।

এসব নিয়ামত অর্জন করতে হয় না। আল্লাহর রবুবিয়্যতের অংশ হিসেবে আল্লাহর দয়ায় সবাই এসব নিয়ামত পায়।

আরেক ধরনের নিয়ামত আছে, যা সবাই পায় না। সে নিয়ামত এমনিতেই পাওয়া যায় না, বরং তা অর্জন করতে হয়। তা হলো অর্জিত নিয়ামত। আগুন সবকিছুকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, কিন্তু আগুন ইবরাহিম (আ)-কে পুড়েনি। তাঁকে আগুনে ফেলা হলো,[৩৫০] কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে তা আরামদায়ক তাপমাত্রায় (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়) পরিণত হলো। ঝড়, তুফান ও বন্যায় সকল মানুষ ও প্রাণী মরে গেলো, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে হযরত নূহ (আ)সহ সত্যপন্থিরা বেঁচে গেলেন।[৩৫১] হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হলো, কিন্তু হযরত লূত ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করা হলো।[৩৫২] অনেকে দরিদ্র জীর্ণ শীর্ণ হয়েও দুনিয়াতে এতো সম্মান লাভ করেছেন যে, দুনিয়ার মানদণ্ডে পরাক্রমশালী রাজা বাদশাহ বা ধনকুবেররা তাঁদের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি। এ তো হলো দুনিয়ার কথা। আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে তাদের অনেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ

---

৩৫০. এ ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা এসেছে। যখন ইবরাহিম (আ.)- কে শত্রুরা আগুনে নিক্ষেপ করছিল তখন আল্লাহ বলেন: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ 'আমরা বললাম, হে আগুন তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহিম-এর জন্য আরাম ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও' (আল-কুরআন ২১ : ৬৯)।

৩৫১. আল-কুরআন ২৬ : ১১৯-১২১।

৩৫২. আল-কুরআন ৫৪ : ৩৪-৩৫।

করে বেহেশতের অপার নিয়ামতের মধ্যে থাকবে। এসব নিয়ামত হে অর্জিত নিয়ামত। এ নিয়ামত সাধারণভাবে সবাই পাবে না, বরং সাধনার মাধ্যমে এগুলো অর্জন করে নিতে হয়।

কারা এসব অর্জিত নিয়ামতের অধিকারী? কুরআনেই এর জবাব রয়েছে। তারা হলো এমন ব্যক্তি, যারা আল্লাহর দেয়া দীন ও জীবন-ব্যবস্থা তথা ইসলামকে শিরোধার্য করে নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। নেক কাজ করে। তাকওয়ার অধিকারী হয়। জান-মাল দিয়ে দীন ইসলামের জন্য কাজ করে, মানুষকে সত্যের দিকে ডাকে, মন্দ থেকে বারণ করে। এসব নিয়ামতপ্রাপ্তদের পরিচয় কুরআনের নানা স্থানে দেয়া আছে। কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হলো :

(১) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ -

(২) إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيْمِ -

(৩) إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيْمٍ-

(৪) الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ-

(১) "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাঁদের সাথে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন– নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহিদ ও নেক্কারদের মধ্য থেকে।"[৩৫৩]

(২) "যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতময় জান্নাত।"[৩৫৪]

(৩) "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীরা থাকবে বেহেশ্‌তে ও নিয়ামতের মধ্যে।"[৩৫৫]

(৪) "যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সাফল্যমণ্ডিত। তাদের রব-প্রতিপালক তাদেরকে

---

৩৫৩. আল কুরান ৪ : ৬৯।
৩৫৪. আল-কুরআন ৩১ : ৮।
৩৫৫. আল-কুরআন ৫২ : ১৭।

সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টির এবং বেহেশ্‌তের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিয়ামত। যেখানে তারা অনন্ত কাল থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।[৩৫৬]

লক্ষ্যণীয়, উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে এমন সব মানুষের কথা বলা হয়েছে, যারা দুনিয়াতেও আল্লাহর নিয়ামত পেয়েছেন এবং আখিরাতেও পাবেন। তাঁরা সবাই নিয়ামতপ্রাপ্ত। এখন চিন্তার বিষয়, কোন্ পথে চলে তাঁরা নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন, অথবা নিয়ামত প্রাপ্তদের পথ কোনটি? অন্য কথায়, কোন পন্থায় বা কি কাজ করে তাঁরা নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন? তা জানার সহজ উপায় হলো পর্যালোচনা করে দেখা, কি কাজ করার কারণে তাদের জন্য নিয়ামতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের সহজ পরিচয় হলো এই যে, সে পথের পথিকরা দুনিয়ার সকল বাতিল পথ ও মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান ইসলামকে মনে প্রাণে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের প্রতিটি পর্যায় ও ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গভাবে তার বাস্তবায়ন করে। সে পথের পথিক হলো এমন মানসিকতার অধিকারী, যা তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং ভালোকাজে উদ্বুদ্ধ করে (তাকওয়া)। যারা ঈমানের সাথে নেক আমল করে এবং আল্লাহর দীনের জন্য জান-মাল দিয়ে প্রচেষ্টা চালায় (আল্লাহর পথে জিহাদ করে)। সকল প্রকার মন্দ কাজ ত্যাগ করে এবং প্রয়োজনে দীনের জন্য দেশ ত্যাগ করে (হিজরত)। এক কথায় তাদের ইবাদত, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যুসবই আল্লাহর জন্য। যারা আল্লাহ ও রাসূলের এমন আনুগত্যের পথে চলে, তারাই অর্জিত নিয়ামতপ্রাপ্ত মানুষ। এ পথ হলো নবী-রাসূল, সত্যনিষ্ঠ, শহিদ ও নেক্‌কারদের পথ।

(১৯) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ অনুসরণ ও সঙ্গ গ্রহণ

সূরা ফাতিহায় অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে হিদায়াতের দু'আর মাধ্যমে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণা রয়েছে। কারো মনে যদি সত্যি সে পথে হিদায়াতের কামনা থাকে, তা হলে নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের পরিচয়ই যথেষ্ট নয়, বরং তাদের মধ্যে সে পথে চলার চেষ্টা থাকতে হবে । তাদের উচিত হবে কুরআনে মানব ইতিহাসের যেসব নবী-রাসূল ও নেককারদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা অধ্যয়ন করা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা। নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথে হিদায়াত পেতে হলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে তাঁদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা যে কাজ করেছেন তা করতে হবে। আর যে কাজকে তাঁরা জীবনের ব্রত বানিয়ে নিয়েছিলেন, সে কাজে ব্রতী হতে হবে। শুধু তাই নয়, বরং বর্তমানে যারা সত্যপথে রয়েছে তাদের সঙ্গে থাকতে হবে এবং তাদের সঙ্গ গ্রহণ করতে হবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে

---

৩৫৬. আল-কুরআন ৯ : ২০-২২।

বাতিলপন্থিদের সঙ্গ গ্রহণ করা নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে হিদায়াতের দু'আর পরিপন্থি।

(২০) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ: ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে আত্মরক্ষা

মানব ইতিহাসে যারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট, তাদের পথ থেকে বাঁচাবার জন্য সূরা ফাতিহায় দু'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে (আয়াত-৭)। আমরা সে পথ থেকে বাঁচতে চাই যে পথে চলে মানুষ আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে বা গযবের পাত্র হয়েছে।

আমরা যদি সত্যি মনে-প্রাণে এ দু'আ করে থাকি, তবে এ দু'আ থেকে আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম, ক্রোধে পতিতদের পথ এবং পথভ্রষ্টদের পথ থেকে আত্মরক্ষার প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। দ্বিতীয়, ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্টদের পথের পরিচয় জানতে হবে। তৃতীয়, এ পথ জানার পর তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহর ক্রোধ বা গযবে পতিত মানুষের পথ কোনটি, তার পরিচয় কুরআন ও হাদিসে আছে। এটি হলো তাদের পথ যারা হক ও সত্যপথকে জানে, চিনে ও বুঝে। কিন্তু বুঝে শোনে তারা খারাপ ও বাতিল পথে চলে। জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা প্রবৃত্তির তাড়নায়, দুনিয়ার লোভে এবং অহমিকার বশবর্তী হয়ে এরূপ আচরণ করে।

জেনে-শোনে সজ্ঞানে বাতিল ও মন্দ পথে চলার উদাহরণ হলো ইহুদি সম্প্রদায়। তারা তাওরাতে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও শেষ নবী (সা)-কে অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহর গযব বা ক্রোধে পতিত হয়েছে বলে কুরআনেই উল্লেখ আছে।[৩৫৭]

কাজেই এ মর্মে একটি হাদিসও আছে যে, ক্রোধ বা গযবে পতিত মানুষ দ্বারা ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে।[৩৫৮] তবে আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের আচরণ শুধু ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জেনে-শোনে যারাই মন্দ কাজ করে, তারাও ক্রোধের কাজ করে। যেমন, ইসলাম ত্যাগ করা, সত্যের জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রর্দশন করা ইত্যাদি আচরণও ক্রোধে পতিত হওয়ার মতো কাজ। আল্লাহ বলেন,

(১) مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ -

(২) وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ

---

৩৫৭. আল কুরআন : ১ :৭।

৩৫৮. তিরমিযী,হাদিস নং ২৯৫৪।

بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ-

(৩) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ -

(১) "আর যে ব্যক্তি কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ (غَضَبٌ)।"[৩৫৯]

(২) "আর যে ব্যক্তি সেদিন যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন অথবা নিজ সৈন্যদের নিকট ফিরে আসা ছাড়া (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে প্রত্যাবর্তন করবে আল্লাহর ক্রোধ (غَضَبٌ) নিয়ে, আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।"[৩৬০]

(৩) "সে বললোঃ তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি ও ক্রোধ (غَضَبٌ) অবধারিত হয়ে গেছে।"[৩৬১]

উপরে উল্লেখিত তিনটি আয়াতে ক্রোধে পতিত তিন ধরনের মানুষের কথা বলা হয়েছে, এবং গযব শব্দটি তাদের সবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম, যারা মুসলমান অবস্থা থেকে নাস্তিক হয়ে যায়, কাফির হয়ে যায়, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ বা গযব। তবে বিপদে প্রাণ রক্ষার জন্য শত্রুদের নিকট কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে গযবে পতিত হবে না। দ্বিতীয়,যারা জিহাদে যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন ছাড়া পলায়নের জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ বা গযব । তৃতীয়, নবী হুদ (আ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আ'দ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর ক্রোধ বা গযব পতিত হয়। এদের কেউই ইহুদি নয়, অথচ তাঁরাও আল্লাহর গযবে পতিত। লক্ষ্যণীয়, এক কথায় কাফির ও সত্য-বিরোধী মানুষ আল্লাহর ক্রোধে পতিত।

এবার পথভ্রষ্টদের পথের পরিচয় জানা প্রয়োজন। পথভ্রষ্ট হলো তারা যারা জ্ঞানের অভাবে মন্দ পথে চলে। এর উদাহরণ হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তারা এতো অজ্ঞ যে, তারা আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে, তাঁর মাতা মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী এবং স্বয়ং আল্লাহকে তাঁর পিতা বলে বিশ্বাস করে। তবে এ ভ্রষ্টতা খ্রিস্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহকে অস্বীকার করা (কুফরী করা), আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা, শির্ক করা, অন্যায় কাজ করা, অন্যের উপর অত্যাচার করা, এসব আচরণকেও কুরআনে পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

(১) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا-

(২) وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا-

---

৩৫৯. আল-কুরআন ১৬ : ১০৬।
৩৬০. আল-কুরআন ৮ : ১৬।
৩৬১. আল-কুরআন ৭ : ৭১।

(৩) بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ-

(৪) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ-

(৫) فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ-

(১) "যারা কাফির হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, তারা অতি দূরের ভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট।"[৩৬২]

(২) "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার (শির্ক) করে, সে অতি দূরের ভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট।"[৩৬৩]

(৩) "বরং যালিমরা সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট।"[৩৬৪]

(৪) "নিঃসন্দেহে অপরাধীরা (গোনাহগাররা) পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত।"[৩৬৫]

(৫) "সুতরাং হক ও সত্যের বাইরে যা আছে তাই পথভ্রষ্টতা।"[৩৬৬]

উপরের প্রথম তিনটি আয়াতে কাফির, মুশরিক ও যালিমকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে সকল অপরাধীকেই পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। আসলে পথভ্রষ্ট না হয়ে (অর্থাৎ সুপথে থেকে) কেউ অপরাধের দিকে পা বাড়াতে পারে না। অন্ততঃপক্ষে যতোক্ষণ মানুষ অপরাধে নিমজ্জিত থাকে অথবা কুপথে থাকে, ততোক্ষণ সে সোজা পথের বাইরে অর্থাৎ পথভ্রষ্টতায় অবস্থান করে। পঞ্চম আয়াতে তো পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে, যা সত্য এবং দীনের বহির্ভূত, তাই পথভ্রষ্টতা।

মোটকথা, ইসলাম তথা আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধানের বাইরে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী, সবকিছুই পথভ্রষ্টতা। গযব বা ক্রোধে পতিতদের পথ এবং পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং কুরআনে এসব বাতিল ও মন্দ পথের পরিচয় দান তখনি অর্থবহ হবে, যখন আমরা প্রবল মনোবল নিয়ে এসব পথ থেকে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করি। এসব খারাপ আচরণ ও পথ জানার পরও কেউ যদি সে পথেই চলে, অথচ প্রতিদিন প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে সে পথ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তার এ আচরণ অনেকটা আল্লাহর সাথে ঠাট্টার মতো।

---

৩৬২. আল-কুরআন ৪ : ১৬৭।
৩৬৩. আল-কুরআন ৪ : ১১৬।
৩৬৪. আল-কুরআন ৩১ : ১১।
৩৬৫. আল-কুরআন ৫৪ : ৪৭।
৩৬৬. আল-কুরআন ১০ : ৩২।

(২১) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : ক্রোধে পতিত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের সঙ্গ বর্জন

কারো মনে যদি সত্যি ক্রোধে পতিত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ ও কামনা থাকে, তা হলে সে শুধু ক্রোধে পতিত ও অভিশপ্তদের পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও চেষ্টাই করবে না বরং সে পথের পথিকদের দলভুক্তও হবে না, তাদের সঙ্গ গ্রহণ করবে না এবং তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেবে না। এটাই স্বাভাবিক। বন্ধুত্ব ও সঙ্গ দ্বারা একজন মানুষের আসল রূপ জানা যায়। একজন ভালো লোক কোন মন্দ লোকের সাহচর্যে টিকতে পারে না। এমন ঘটনা খুব বিরল যে, একজন সৎ লোক অসৎ-ধূর্ত-কপট ব্যক্তিদেরকে বন্ধু ও সঙ্গী বানিয়ে তাদের সাহচর্য উপভোগ করে। বরং পানির মাছকে ডাঙ্গায় উঠালে যেমন ছটফট করে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়, তেমনি দশা হয় কোন সৎ ও ভালো মানুষের, যখন সে অসৎ ও ধূর্ত মানুষের সাহচর্যে আসে। কাজেই কোন হিদায়াত প্রার্থী ভালো লোক অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষের দলভুক্ত হতে পারে না। আল্লাহ বলেন, (১) "হে ঈমানদারগণ,কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।"[৩৬৭] (২) "মুমিনরা যেনো মুমিন ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করো, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।"[৩৬৮] (৩) "হে ঈমানদারগণ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (এরূপ) যালিমদের হিদায়াত করেন না।"[৩৬৯] (৪) "নিঃসন্দেহে শয়তান হলো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার দলকে (নিজের দিকে) কেবল এজন্য আহবান করে যেনো তারা জাহান্নামী হয়।"[৩৭০] (৫) "তারা যদি আল্লাহ ও নবীর প্রতি এবং নবীর প্রতি নাযিলকৃত (কিতাব)-এর প্রতি ঈমান রাখতো তা হলে ওদেরকে (কাফিরদেরকে) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না।"[৩৭১]

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, মুমিন ও মুসলমানগণ কখনো কাফির,

---

৩৬৭. আল-কুরআন-৪ : ১৪৪।
৩৬৮. আল-কুরআন ৩ : ২৮।
৩৬৯. আল-কুরআন ৫ : ৫১।
৩৭০. আল-কুরআন ৩৫ : ৬।
৩৭১. আল-কুরআন ৫ : ৮১।

মুশরিক ও শয়তানকে[৩৭২] বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, তাদের কাজ হলো মানুষকে কুপথে আকর্ষণ করা এবং বাতিলের পথে পরিচালিত করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সামাজিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে বিরোধিতার ঘোষণা দিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে। শান্তিচুক্তি বা প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও পার্থিব সহযোগিতা বজায় রাখা প্রয়োজন। মানুষে মানুষে ভাই ভাই, এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রক্ষা করা কর্তব্য।

সারকথা, সূরা ফাতিহায় আল্লাহর ক্রোধে (গযবে) পতিত এবং পথভ্রষ্টদের থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কুরআন পাঠের মাধ্যমে এসব বাতিল পথ জানতে হবে, এসব পথ ত্যাগ করতে হবে, এবং যারা এসব পথে চলে তাদের সঙ্গ ও দল বর্জন করতে হবে। তা যদি না করা হয়, তবে আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করার কি অর্থ থাকতে পারে?

(২২) দু'আ ও প্রার্থনা করার নিয়ম

পরোক্ষভাবে সূরা ফাতিহায় আল্লাহর নিকট দু'আ ও প্রার্থনা করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে (আয়াত-১)। কারো নিকট কিছু চাইতে হলে তার প্রশংসা করে সুসম্পর্ক স্থাপন করা উত্তম। কারো নিকট চাওয়া বা প্রার্থনা করার প্রকৃত স্বত্ত্বা তো আল্লাহই। সুতরাং তাঁর নিকট দু'আ করতে হলে বা কোন কিছু প্রার্থনা করতে হলে প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করে নেয়া উচিত। সূরা ফাতিহায় ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা ও ইসলামী বিশ্ব-দর্শনের প্রায় সকল মৌলিক বিষয়ের ঘোষণা দেয়ার পর প্রধানত একটা দু'আ রয়েছেঃ "আমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দাও"। এ দু'আর ভূমিকা হিসেবে প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা (আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ), আল্লাহর দয়া ও করুণা এবং তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের ঘোষণা রয়েছে (আয়াত-১-৩)। তারপর আছে আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি। এরপরই রয়েছে দু'আ। এখান থেকে শিক্ষা হলো এই যে, আল্লাহর নিকট দু'আ ও প্রার্থনা করতে হলে প্রথমে তাঁর প্রশংসা করা উচিত। এমন কথা বলা উচিত যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। কারণ, এ প্রশংসার মাঝে মানব সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সুরই অন্তর্নিহিত রয়েছে। ইবাদতের জন্য

---

৩৭২. শয়তান বলে মানুষ-শয়তান ও জিন-শয়তান উভয়কে বুঝানো হয়েছে। যেসব মানুষ সত্যের বিরোধিতা ও শত্রুতায় শয়তানের মতো আচরণ করে, তারা হলো মানুষ শয়তান। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য এ বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় দেখা যেতে পারে। আরো দ্রষ্টব্য আল-কুরআন ৫৮ : ১৯; ১১৪ : ১-৬।

মানুষের সৃষ্টি, আর আল্লাহর প্রশংসা নিঃসন্দেহে একটি ইবাদত। "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" বলে আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ যে কতো খুশী হন, তা একটি হাদিসে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে :

عَنْ أَبِيْ مٰلِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -

"আবু মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্' (নেকীতে) পাল্লা ভরে দেয় এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ্' পৃথিবী ও আকাশসমূহের মধ্যবর্তী স্থান (নেকীতে) ভরে দেয়।"[৩৭৩]

সুতরাং "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" বলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পর দু'আ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অতএব আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ দ্বারাই দু'আ শুরু করা উচিত।

শুধু দু'আ ই নয়, বরং সকল কাজের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করে নেয়া ভালো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ اَقْطَعُ -

"যেসব কাজ আল্লাহর প্রশংসা (আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ) ব্যতীত শুরু করা হয় তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ।"[৩৭৪]

সুতরাং, আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ দ্বারা কাজ শুরু করা সুন্নত। এতে সওয়াব তো আছেই, কর্ম সম্পাদনে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

(২৩) সামষ্টিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব

যারা একই ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী এবং একই পথের যাত্রী, কুরআন তাদের মধ্যে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে "মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই"।[৩৭৫] সূরা ফাতিহায় তার একটা বাস্তব প্রশিক্ষণ রয়েছে। এ সূরায় ইবাদতের প্রতিশ্রুতি, সাহায্যের প্রার্থনা এবং হিদায়াতের দু'আর ক্ষেত্রে এক বচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'আমি' না বলে 'আমরা' বলা হয়েছে। 'আমাকে' না বলে 'আমাদেরকে' বলা হয়েছে। যেমন,'আমি একমাত্র তোমারই ইবাদত করি' না বলে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি' বলা হয়েছে। 'আমি শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা

---

৩৭৩. মুসলিম, কিতাবুত তাহারাহ, হাদিস নং-১. তিরমিযী, হাদিস নং ৩৫১৭।
৩৭৪. আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৪০, ইবনে মাজাহ, নিকাহ পর্ব, হাদিস নং ১৮৯৪।
৩৭৫. আল কুরআন ৪৯:১০।

করি' না বলে' আমরা শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' বলা হয়েছে। আর 'আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীম এর হিদায়াত দাও' না বলে আমাদেরকে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর হিদায়াত দাও' বলা হয়েছে।

এভাবে 'আমি' না বলে 'আমরা' এবং 'আমাকে' না বলে 'আমাদেরকে' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে রয়েছে সবার পক্ষ থেকে ইবাদতের প্রতিশ্রুতি, মুসলিম উম্মতের সকলের জন্য সাহায্য প্রার্থনা এবং তাদের সবার জন্য হিদায়াত প্রার্থনা। এভাবে এখানে ব্যাষ্টির পরিবর্তে সামষ্টিকতার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে পরিষ্কারভাবে।

আসলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থের সাথে সাথে সামষ্টিক স্বার্থের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সামষ্টিকতার বিষয়টি সকল ব্যাপারে-ই লক্ষ্যণীয়। প্রথম, শুধু ব্যক্তিজীবনে একাকী নয়, বরং সামষ্টিক জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। ইসলামে ধর্মকর্ম একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং ব্যক্তির সাথে সমষ্টি ও জাতি সম্পৃক্ত। একাকী নামায অনুমোদিত হলেও জামাতে নামায উৎসাহিত। দ্বিতীয়, রোযা ও হজ্জের আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোতে সামষ্টিকতা ও সামাজিকতার আমেজ রয়েছে। একই সময় এবং একই সাথে রোযা, ঈদ ও হজ ইত্যাদিতে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সামাজিক পর্যায়ের আনুগত্যের শিক্ষা রয়েছে। তৃতীয়, মঙ্গল ও কল্যাণ সকলের জন্যই কাম্য। আল্লাহর সাহায্য, সত্য-সোজা ও নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের হিদায়াত, এবং সকল প্রকার কল্যাণ কামনা সবার জন্য ও সবার পক্ষ থেকে করতে হবে। চতুর্থ, আল্লাহর ক্রোধের পথ এবং ভ্রষ্টতাসহ সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে সবার জন্যই মুক্তি কামনা করতে হবে। সূরা ফাতিহার প্রতিটি বক্তব্য, নিবেদন, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ও দু'আতে সে সামষ্টিকতার প্রতিফলন রয়েছে। এক কথায় ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে সামষ্টিক কল্যাণ সূরা ফাতিহার অন্যতম শিক্ষা।

(২৪) কোন কাজ শুরু করার নিয়ম

"বিসমিল্লাহ" বা আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা (সূরা তাওবা ব্যতীত)। এতে ইসলামী সংস্কৃতির একটি শিক্ষা রয়েছে। ইসলামী জীবনদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো সকল কাজ বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করা। এটি হলো ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং শুধু দু'আ নয়, বরং সব কাজই বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করা উচিত। রাসূল (স) বলেন,

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ -

যে কাজ বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করা হয় না, তাতে কোন বরকত থাকেনা।[৩৭৬]

সুতরাং বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে কাজ শুরু করা সুন্নত। সুন্নতের সওয়াব ছাড়াও এতে একাধিক উপকার পাওয়া যায়। সুতরাং "বিসমিল্লাহ্‌" বা আল্লাহর নাম নিয়ে সকল কাজ শুরু করা ইসলামী সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। সূরা ফাতিহায় ইসলামী সংস্কৃতির এ শিক্ষাটির প্রতিফলন রয়েছে। কোন কোন ইমাম ও আলেম বলেন, 'বিসমিল্লাহ' হলো সূরা ফাতিহার একটি আয়াত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ছাড়া সূরা ফাতিহা পাঠ পূর্ণাঙ্গ হবে না।[৩৭৭]

---

৩৭৬. আহমাদ, হাদিস নং ১৪ :৩২৯।

৩৭৭. এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

পঞ্চদশ অধ্যায়
পরিশিষ্ট

সূরা ফাতিহার নামকরণ

সূরা ফাতিহাসহ কুরআনে ১১৪টি সূরা রয়েছে। প্রত্যেকটি সূরারই আছে আলাদা আলাদা নাম। আবার কোন কোন সূরার একাধিক নামও আছে, যেমন সূরা ফাতিহা। সূরা ফাতিহার নামকরণের প্রেক্ষাপটে কুরআনের সূরা সমূহের নামকরণের বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন।

আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সা) নিজেই কুরআনের সূরাগুলোর নাম বলে দিয়েছেন। চিন্তা করলে সূরাগুলোর নামকরণের যৌক্তিকতাও উপলব্ধি করা যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বিষয়বস্তু, নাযিল হওয়ার পদ্ধতি ও বর্ণনা ভঙ্গির প্রতি কিছুটা দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। কুরআন মানবরচিত কোন গ্রন্থের মতো একটি পুস্তক নয়, যার একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নির্ধারিত থাকে, যেমন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি। বরং কুরআন মানব-জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে নীতি, দিক-নির্দেশনা ও বিধি-বিধান প্রদান করে। তবে এসবের আলোচনাকে বিষয়ভিত্তিকভাবে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়নি। বরং গতিশীল মানবজীবন যেমন একই সাথে বিভিন্ন বিষয় ও ইস্যুর সম্মুখীন হয়, তেমনি কুরআনে জীবনের স্বাভাবিকতার সাথে মিল রেখে প্রয়োজন ও প্রেক্ষিত অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। কাজেই দেখা যায়, একই সূরায় মানুষের নৈতিক জীবন এবং ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তাই মানব রচিত বই-পুস্তকের নামকরণের মতো কুরআনের সূরাসমূহের বিষয়ভিত্তিক নামকরণ কঠিন।

সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূরাগুলোর রূপক (symbolic) নামকরণ হয়েছে। কখনো সূরার অন্তর্গত কোন শব্দ দ্বারা সে সূরার নাম রাখা হয়েছে। হয়তো সে শব্দটি কোন বিশেষ ঘটনা, বিষয় বা নির্দেশ তুলে ধরে, যাতে হয়তো কোন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। অথবা হয়তো নিছক সূরাটির পরিচয়ের জন্য সূরায় ব্যবহৃত কোন শব্দ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহ। এ সূরায় একটা বিশেষ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাতে গাভীর কথা আছে। এ গাভী (বাকারাহ) থেকেই এর নামকরণ হয়েছে সূরা বাকারাহ।

কোন কোন সূরার নামকরণ হয়েছে তাতে আলোচ্য বিষয়কে ভিত্তি করে। যেমন সূরা ইখলাসে "ইখলাস" বলে কোন শব্দ নেই। কিন্তু এতে খালেসভাবে আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর অংশীদারিত্বহীনতা, অমুখাপেক্ষীতা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই এর নামকরণ

করা হয়েছে সূরা ইখলাস।

সূরার অবস্থান ও প্রধান বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেও কোন কোন সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, সূরা ফাতিহা। এর অবস্থান কুরআনের প্রথমে রয়েছে এবং এতে কুরআনে বর্ণিত জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়সমূহের ইঙ্গিত রয়েছে। এ হিসেবে এ সূরাটিকে কুরআনের অবতরণিকা বা ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা যায়। সুতরাং যৌক্তিক কারণেই এর প্রধান নাম হলো সূরা ফাতিহা। যদিও এর আরো বেশ কয়েকটি নাম আছে। এবারে সূরা ফাতিহার কয়েকটি নামের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

সূরা ফাতিহা বা ফাতিহাতুল কিতাব

এ সূরাটির সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও ব্যবহৃত নাম হলো সূরা ফাতিহা। 'ফাতিহা' মানে উন্মোচনকারী, ভূমিকা বা সূচনা। সূরা ফাতিহা হলো কুরআনের প্রথম সূরা। এ সূরা দিয়েই কুরআন শুরু। যেকোনো বই ও গ্রন্থের শুরুতে তার ভূমিকা ও অবতরণিকা থাকে, যাতে পাঠক প্রথমেই গ্রন্থটি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে যায়। সূরা ফাতিহাও কুরআনের ভূমিকা বা অবতরণিকার কাজ করে। কুরআন ইসলামী জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থাসহ ইসলামের সকল প্রকার বিধি-বিধান ও অনুশাসন পেশ করে, যাকে এক কথায় সিরাতুল মুস্তাকীম বা 'ইসলাম' বলা হয়। এ কুরআনের ভূমিকা হিসেবে সূরা ফাতিহায় ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এ সূরা হলো কুরআনের ভূমিকা (ফাতিহা)।

"ফাতিহাতুল কিতাব" অর্থ কিতাব উন্মোচনকারী, কিতাবের ভূমিকা বা সূচনা। একই যুক্তিতে সূরাটিকে 'ফাতিহাতুল কিতাব'-ও বলা হয়।

সূরা 'আল্-হাম্দু লিল্লাহ্', 'উম্মুল কুরআন', 'উম্মুল কিতাব' ও 'সাব্উল মাছানী'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ-

আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্হাম্দু লিল্লাহ' হলো 'উম্মুল কুরআন' ' 'উম্মুল কিতাব ও সাব্উল মাছানী'।[৩৭৮]

এ হাদিসটি থেকে সূরাটির আরো চারটি নাম জানা যায় : 'আল্-হামদুলিল্লাহ', 'উম্মুল কুরআন, 'উম্মুল কিতাব' ও 'সাব্উল মাছানী'।

---

৩৭৮. বুখারী শরীফ, তাফসির পর্ব, হাদিস নং-৪৭০৪।

সূরা 'আল্-হামদুলিল্লাহ' এজন্য যে 'আল-হামদুলিল্লাহ' দ্বারা সূরাটি শুরু হয়েছে। এছাড়া এ সূরাটি, অর্থাৎ গোটা কুরআনই শুরু হয়েছে এ ঘোষণা দিয়ে যে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। কারণ, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মালিক। এ ঘোষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর সেহেতু 'সূরা আল-হামদুলিল্লাহ' নামকরণ যথার্থ।

'উম্মুল কিতাব' অর্থ 'কিতাবের মা' (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের মা) এবং 'উম্মুল কুরআন' মানে 'কুরআনের মা'। আরবী ভাষায় "উম্ম্" বলে বুঝানো হয় "মূল" ও "সারবস্তু"। যেহেতু এ সূরায় কুরআনে বর্ণিত ইসলামী জীবন-দর্শনের সকল মৌলিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে, সেহেতু এ সূরাটি হলো আল্লাহর কিতাব কুরআনের মূল ও সংক্ষিপ্ত সার।
আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ-

"আর (হে নবী!) আমি তোমাকে দিয়েছি 'সাবউল মাছানী' এবং দিয়েছি মহান কুরআন।"[৩৭৯]

'সাবউল মাছানী' অর্থ হলো "বার বার পঠিত সাত", অর্থাৎ সাতটি আয়াত যা বার বার পঠিত হয়। মুফাসসিরগণ সাত আয়াত দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝিয়েছেন।[৩৮০] কারণ এ সূরায় সাতটি আয়াত রয়েছে।

সূরা সালাত

পারিভাষিক অর্থে সালাত অর্থ নামায। প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে এ সূরা পাঠ করা হয়। এ জন্যই হয়তো হাদিসে কুদসীতে এ সূরাকে 'সূরা সালাত' বলা হয়েছে।

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي-

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "সালাত আমার ও বান্দার মধ্যে বিভক্ত।"[৩৮১]

এখানে সালাত বলে সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। হাদিসটির অর্থ এই যে, সূরা ফাতিহার কিছু অংশে আল্লাহ, আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর ইবাদত ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু অংশে বান্দার নিজের জন্য দু'আ, সাহায্যের কামনা ইত্যাদি রয়েছে। হাদিসটির বাকি অংশে সূরা ফাতিহার

---

৩৭৯. আল-কুরআন ১৫ : ৮৭।
৩৮০. দেখুন, তাফসিরে কাশ্‌শাফ, তাফসিরে কুরতুবী ইত্যাদি।
৩৮১. হাদিসটি হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং-৩৮।

কোন্ অংশ আল্লাহর জন্য, আর কোন্ অংশ বান্দার জন্য তা বর্ণিত হয়েছে।[৩৮২]

সূরা শিফা

এ সূরার আরেকটি নাম হলো সূরা শিফা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ -

"সূরা ফাতিহার মধ্যে সকল রোগ থেকে শিফা বা আরোগ্য রয়েছে।"[৩৮৩]

রোগমুক্তির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা আরো অনেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এটাকে 'সূরা শিফা'ও বলা হয়।

সূরা আসাস

'আসাস' মানে ভিত্তি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,

اَسَاسُ الْكُتُبِ : الْقُرْاٰنُ وَاَسَاسُ الْقُرْاٰنِ : الْفَاتِحَةُ -

"কিতাবসমূহের ভিত্তি হলো কুরআন, আর কুরআনের ভিত্তি হলো সূরা ফাতিহা।"[৩৮৪]

সূরা ফাতিহায় কুরআনের অন্তর্গত মৌলিক বিশ্বাস ও বিষয়গুলোর মূলকথা রয়েছে। এ হিসেবে এ সূরাকে কুরআনের ভিত্তি বা 'সূরা আসাস' বলা যায়।

সূরা দু'আ

এ সূরায় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দু'আ রয়েছে। আর তা হলো সত্যপথ বা হিদায়াতের দু'আ। হিদায়াত প্রার্থনার গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে এটিকে 'সূরাতুদ্ দু'আ' বলা হয়।

সূরা কান্য্

এ সূরায় প্রভূত কল্যাণ লাভের দিকদর্শন রয়েছে। এ হিসেবে 'সূরাতুল কান্য্' বা 'কল্যাণের খনি' সূরা বলা হয়। এক হাদিসে আছে, এ সূরা আল্লাহর আরশের নীচে অবস্থিত এক খনি থেকে নাযিল হয়েছে।[৩৮৫]

---

৩৮২. হাদিসটির উল্লেখিত অংশটি একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশ। হাদিসটির বাকি অংশে সূরা ফাতিহার কোন অংশ আল্লাহর জন্য (যেমন, সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর জন্য) আর কোন অংশ বান্দার জন্য (যেমন, হিদায়াতের দু'আ) তা বর্ণিত হয়েছে। এ পরিশিষ্টে সূরা ফাতিহার ফযিলত প্রসঙ্গে পূর্ণ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৮৩. দারেমী, হাদিস নং- ৩৩৭০।

৩৮৪. ওয়াহবা আয্যুহাইলী, তাফসিরুল মুনীর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৪।

৩৮৫. শাইখুত তাফসির ইদরিস কান্ধলভী, মা'রেফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪

সূরা ফাতিহার আরো নাম আছে। যেমন, 'সূরা কাফিয়া' (سُوْرَةُ الْكَافِيَه), 'সূরা ওয়াফিয়াহ' (سُوْرَةُ الْوَافِيَه), সূরা সুয়াল' (سُوْرَةُ السُّوَال), 'সূরা শুকর (سُوْرَةُ الشُّكْر), 'সূরা তাফভীজ'(سُوْرَةُ التَّفْوِيْض), 'সূরা তালীমুল মাসআলা' (سُوْرَةُ تَعْلِيْمِ الْمَسْئَلَه) ইত্যাদি। এসব নামকরণের পেছনে যৌক্তিক কারণও আছে। তবে সাধারণতঃ সূরাটি সূরা ফাতিহা নামে সর্বাধিক পরিচিত।

সূরা ফাতিহা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা-মাসায়েল

সূরা ফাতিহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা বলে নামাযের প্রতি রাকাতে তা পাঠ করতে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে কিনা, অথবা পূর্ণাঙ্গ হবে কিনা? এ ধরনের কিছু মাসআলা-মাসায়েল সংক্ষিপ্তভাবে এখানে দেয়া হলো।

নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ

সূরা ফাতিহার অপরিসীম গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করেই প্রতিটি নামাযের প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান দেয়া হয়েছে। নামাযে কুরআন পাঠ বা কিরাত পড়া ফরয এবং তার সাথে সূরা ফাতিহাও পড়তে হবে। তবে সূরা ফাতিহা পড়া কতটুকু যরূরী, এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

হানাফী মাযহাবে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়, বরং ওয়াজিব। সূরা ফাতিহা না পড়লে ওয়াজিব ত্যাগ করা হবে এবং এ ক্ষতি পূরণের জন্য 'সিজদা সাহু' করতে হবে। এ অভিমতের পক্ষে দলীল হলো নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াত।

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ-

"সুতরাং কুরআন থেকে তোমাদের জন্য যতোটুকু সহজ ততোটুকুই পাঠ করো।"[৩৮৬]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, নামাযে কুরআনের যেকোনো অংশ থেকে পাঠ করা ফরয। সূরা ফাতিহা বা কুরআনের অন্য যেকোনো অংশ থেকে পাঠ করলেই এ ফরয আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ না করে অন্য যেকোনো স্থান থেকে পাঠ করলেও ফরয আদায় হবে।

শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। সুতরাং কেউ যদি সূরা ফাতিহা বা তার কোন অংশ না পড়ে, তার নামাযই হবে না।

তাদের যুক্তি নিম্নরূপ :

---

৩৮৬. আল-কুরআন ৭৩ : ২০।

(১) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ-

(২) لَا تَجْزِى الصَّلَاةُ اِلَّا بِقِرَأَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

(১) "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কুরআনের ভূমিকা বা সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না।"[৩৮৭]

(২) "সে নামায জায়েয বা শুদ্ধ নয় যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না।"[৩৮৮]

তাঁদের আরেকটি দলিল হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল। তিনি সর্বদা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন এবং বলেছেন-

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى اُصَلِّى-

"তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো, সেভাবে নামায পড়ো।"[৩৮৯]

উপরে উল্লেখিত হাদিস ও রাসূলের আমলের উপর ভিত্তি করে তাঁরা বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয।

হানাফী মাযহাব থেকে এর জবাব হলো এই: উপরের হাদিসের মর্ম এই যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না বা নামাযের পুরো কল্যাণ (বরকত ও ফযিলত) পাওয়া যায় না। এ হাদিসের অর্থ এই নয় যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয, কেননা এরূপ অর্থ গ্রহণ করলে হাদিস ও কুরআনে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এবং এ সংঘর্ষে কুরাআনের উপর হাদিসকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, যা কোনমতেই জায়েয নয়।

কুরআন থেকে প্রমাণিত, কুরআনের যেকোনো অংশ থেকে পাঠ করলেই ফরয আদায় হয়ে যায়। সূরা ফাতিহা ফরয নয়। সুতরাং কুরআন যা ফরয করে না, তাকে হাদিস দ্বারা ফরয করা ঠিক নয়। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলের ব্যাপারে কথা হলো এই যে, তিনি অনেক সুন্নত আমলও সর্বদা করতেন, যেমন, তিনি ফজরের সুন্নত নামাযের ক্ষেত্রে অতিশয় যত্ন নিতেন। তিনি সর্বদাই ফজরের সুন্নত পড়েছেন। কিন্তু তবু তা সুন্নতই, ফরয নয়।

ইমামের পেছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ

নামাযে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ যখন এতো গুরুত্বপূর্ণ, তখন আরেকটি প্রশ্ন জাগে। তা হলো এই যে, জামায়াতে নামায পড়ার সময় মুক্তাদী সূরা ফাতিহা

---

৩৮৭. মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং-৩৪।

৩৮৮. তিরমিযী, হাদিস নং- ২৪৭।

৩৮৯. বুখারী, হাদিস নং- ৫৯৫।

পড়বে কিনা? হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইমামের পেছনে মুক্তাদী কোন কিরাতই পড়বে না। সূরা ফাতিহাও নয়, এবং অন্য কোন সূরা বা আয়াতও নয়। উচ্চস্বরে কিরাতের নামায (মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায) এবং নিম্নস্বরে কিরাতের নামায (যোহর ও আসরের নামায), কোন নামাযেই মুক্তাদী ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন কিরাত পাঠ করবে না। এ অভিমতের পক্ষে কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল পেশ করা হয়। কুরআনের দলিল হলো এই :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

"যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে তা শুনো এবং চুপ থাকো, যেনো তোমাদের উপর করুণা বর্ষিত হতে পারে।"[৩৯০]

এ আয়াতে কিরাত পাঠের সময় মনোযোগ সহকারে তা শুনতে এবং চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মনোযোগ সহকারে শোনা উচ্চস্বরে কিরাতের বেলায় প্রযোজ্য, আর চুপ থাকা উচ্চস্বর ও নিম্নস্বর উভয় নামাযের বেলায় প্রযোজ্য। বলাবাহুল্য, ইমামের পেছনে মুক্তাদীও যদি কিরাত পড়া শুরু করে, তবে ইমামের কিরাত শোনা সম্ভব নয়। সুতরাং কিরাত পাঠের সময় চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে তা শোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর ইমাম যখন আস্তে কিরাত পড়ে, তখন চুপ থাকার নির্দেশ রয়েছে। এভাবে কুরআন দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন কিরাত পাঠ করবে না।

عَنْ جَابِرْ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاةُ الْإِمَامِ لَهُ قَرَاةُ-

"জাবের (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে, ইমামের কিরাতই তার কিরাত বলে গণ্য হবে।"[৩৯১]

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন কিরাতই পড়বে না। কারণ ইমামের কিরাতই তার জন্য যথেষ্ট।

শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী জামাতে নামাযের সময় ইমামের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। জামায়াত ছাড়া একাকী নামায পড়লেও সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। তবে জামাতে নামাযের সময় মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ

---

৩৯০. আল-কুরআন ৭ : ২০৪।

৩৯১ কুরতুবী ১/১২২, ওয়াহবা আয যুহাইলী, পূর্বোক্ত, থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৪, দারু কুতুনী, ১ম খণ্ড, হাদিস নং ১২২১

করবে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হলো এই যে, জামায়াতে বা একাকী নামাযে, ফরয বা সুন্নত বা নফল নামাযে, জোরে বা আস্তে কিরাতের নামাযে, ইমাম ও মুক্তাদী, সকলের জন্য সকল নামাযেই সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের পক্ষে উপরে উল্লেখিত হাদিসগুলো পেশ করেন। বিশেষ করে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর বেলায় সূরা ফাতিহা পাঠের পক্ষে নিম্নের হাদিসটি পেশ করেন।

صَلَّى رَسُوْلُ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ " . قُلْنَا : نَعَمْ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ " لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا -

"(একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়েন। এতে কিরাত পাঠ করা তাঁর উপর ভারী অনুভূত হয়। নামায শেষে রাসূল (সা) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে ক্বিরাত পড়ছো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা তা করো না, তবে উম্মুল কুরআন ছাড়া, কারণ নামাযে যে উম্মুল কুরআন পড়ে না তার নামায হয় না।"[৩৯২]

এ হাদিসটিতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরুরী।

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী জোরে কিরাতের নামাযে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। বরং আস্তে কিরাতের নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া মুক্তাদীর জন্য মুস্তাহাব। এ দুই মাযহাবের অভিমত হলো এই যে, কুরআন তিলাওয়াত করার সময় মনোযোগ সহকারে শোনা ও চুপ থাকা সংক্রান্ত আয়াতটি শুধু জোরে কিরাত পড়ার নামাযের জন্যই প্রযোজ্য। আস্তে নামাযের সময় তা প্রজোয্য নয়। তাঁদের দলিল হলো নিম্নের হাদিস :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ - فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ آنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: إِنِّي أَقُوْلُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ- فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ

---

৩৯২ আবু দাউদ, হাদিস নং- ৮২৩।

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ النَّبِيُّ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالقِرَائَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"নবী করীম (সা) একদিন উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়ার নামায শেষে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে এখন কেউ কি কিরাত পড়েছে? তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি বলি যে আমার কি হলো, আমার সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে? তখন থেকে উচ্চস্বরে কিরাত পড়ার নামাযে সাহাবীগণ রাসূল (সা)-এর পেছনে ক্বিরাত পড়া হতে বিরত রইলেন।"[৩৯৩]

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উচ্চস্বরে কিরাতের নামাযে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা বা কুরআনের অন্য কোন অংশ থেকে পাঠ করা ঠিক নয়। তবে আস্তে কিরাতের নামাযে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা মুস্তাহাব। এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَلَمَّا قَضَاهَا قَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْئٍ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنِّيْ أَقُوْلُ مَالِي أُنَازَعُ فِيْ الْقُرْآنَ ؟ إِذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوْا مَعِيْ ، وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِيَ أَحَدٌ -

"আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা) সালাত আদায় করে বলেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ আমার সাথে কিরাত করেছে? তখন একজন বললো, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূল (সা) বললেন, আমার সাথে কুরআনের বিতর্ক হচ্ছে, যখন আমি আস্তে কিরাত পড়ি, তখন তোমরা পড়ো আর যখন জোরে পড়ি তখন যেন কেউ না পড়ে।"[৩৯৪]

অর্থাৎ জোরে কিরাতের নামাযে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ঠিক নয়। তবে আস্তে নামাযের সময় তা পড়া যাবে।

হানাফী মাযহাবের তরফ থেকে এসব যুক্তির জবাব হলো এই যে, কুরআনের নির্দেশ অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয়। কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক সবকিছুর উপর কুরআনের প্রধান্য দিতে হবে। সুতরাং নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়। কারণ, কুরআনের যেখান থেকে সহজ লাগে, সেখান থেকে পড়াই কুরআনের

৩৯৩. আবু দাউদ, হাদিস নং- ৮২৬, এবং তিরমিযী, হাদিস নং- ৩১২।
৩৯৪. দারাকুতনী, ১ম খণ্ড, হাদিস নং ১২৫১।

নির্দেশ। তবে সূরা ফাতিহার ব্যাপারে হাদিসে প্রদত্ত গুরুত্বের জন্য তা পাঠ করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমামের সাথে জামাতে নামাযে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়বে না, কারণ নামাযে ইমামের কিরাত শোনতে ও চুপ থাকতে বলা হয়েছে, এবং আরো বলা হয়েছে যে, ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর কিরাত বলে গণ্য হবে। সুতরাং মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ বা অন্য কোন কিরাত পড়ার প্রয়োজন নেই।

সূরা ফাতিহার ফযিলত

সূরা ফাতিহা ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিশ্বাস ও বিষয়গুলো উপস্থাপন করে এটি সত্যপথে হিদায়াতের দু'আর মাধ্যমে সুপথে চলার ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করে। সুতরাং এ সূরা বার বার পাঠ করা এবং এর মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম ও অনুসরণ করা যরূরী। এ কারণেই প্রতিটি নামাযের প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। আর নামাযের বাইরেও সূরাটি বেশি বেশি পাঠ করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এ প্রেরণা দিতে গিয়ে সূরা ফাতিহার প্রচুর ফযিলতের কথা একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।[৩৯৫]

১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে উম্মুল কুরআন পাঠ করেনা তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। কেননা আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে নামাযকে আমি দু'ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। বান্দা "আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বললে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন সে "আর রাহমানির রাহীম" বলে তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে। আর যখন সে বলে "মালিকি ইয়াউমিদ্দীন", তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে (আবার কখনো আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সমগ্র ক্ষমতা আমার প্রতি ন্যাস্ত করেছে)। যখন সে বলে, "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ী'ন" তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। যখন সে বলে "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম" "সিরাতাল্লাযীনা আন্'আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্যাল্লীন" তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দার জন্য

---

৩৯৫. এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, তাফসির ইবনে কাসির,১: ১০-১৩ তাফসিরে কাবির ১: ১৫৯-১৬১।

তা-ই রয়েছে যা সে চায়।[৩৯৬]

২। উবাই বিন কা'ব (রা) বলেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা "উম্মুল কুরআন" এর অনুরূপ কোন কিছু তাওরাত ও ইন্‌জিলে নাযিল করেননি। আর তা হলো পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত, যা আমি (আল্লাহ) এবং আমার বান্দাদের মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত।[৩৯৭]

৩। ইবনে আববাস (রা) বলেন, একবার রাসূল (সা) ও জীবরাঈল (আ) উপবিষ্ট ছিলেন, তখন হঠাৎ উপরের দিক থেকে (এক ধরনের) শব্দ শুনতে পেলেন। তখন জীবরাঈল (আ) আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, এটা আকাশের একটি দরজা যা কখনো খোলা হয়নি। ইবনে আববাস (রা) বলেন, অতঃপর সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করে নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে দু'টি নূরের (দ্যুতির) সুসংবাদ দিচ্ছি যা আপনাকেই দেয়া হয়েছে, আপনার পূর্ববর্তী কোন নবীকে দেয়া হয়নিঃ (১) সূরা ফাতিহা ও (২) সূরা বাকারার শেষাংশ। এর একটি অক্ষর পাঠ করলেও তার মহা প্রতিদান দেয়া হবে।[৩৯৮]

৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা এক সফরে (এক জায়গায়) অবতরণ করলাম। সেখানে একটি মেয়ে এসে বললো, এ গ্রামের প্রধানকে সাপে দংশন করেছে, কিন্তু আমাদের কোন পুরুষ লোক নেই। তোমাদের মাঝে কি ওঝা আছে? তখন এক ব্যক্তি মেয়েটির সাথে গিয়ে তাকে ঝেড়ে এলো। আমরা তাকে দোষারোপ করিনি। এতে গ্রাম-প্রধান আরোগ্য লাভ করলো। ফলে তাকে ত্রিশটি বকরী উপহার দেয়া হলো এবং সে আমাদেরকে দুধ পান করালো। আমাদের সঙ্গী ফিরে এলে আমরা তাকে বললাম, তুমি কি ভালো ঝাড়তে পার, না তুমি ওঝা? সে বললো, "না, আমি শুধু উম্মুল কুরআন দ্বারা ঝেড়েছি।" তখন আমরা সবাইকে বললাম, রাসূল (সা)-এর কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তোমরা এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলো না। অতঃপর আমরা মদিনায় পৌঁছে নবী করিম (সা)-কে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, সে কীভাবে জানলো যে এটা একটি মন্ত্র![৩৯৯]

---

৩৯৬. মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং- ৩৮।
৩৯৭. নাসাঈ, হাদিস নং- ৯১৩ ও তিরমিযী, হাদিস নং- ৩১২৫।
৩৯৮. মুসলিম, কিতাবুল মুসাফিরীন, হাদিস নং- ২৫৪।
৩৯৯. মুসলিম, কিতাবুস সালাম, হাদিস নং- ২২০১, বুখারী-হাদিস নং-৪৬২৩।

৫। আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রা) বলেন, আমি নামায পড়ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল (সা) আমাকে ডাকলেন। আমি নামায শেষ করেই তাঁর ডাকে সাড়া দিই। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি আমাকে বললেন, "আমার কাছে আসা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখলো!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।" তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন তোমাদেরকে ডাকেন সে বস্তুর দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।" অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, "মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের একটি মহান সূরা শিক্ষা দিব"।

অতঃপর যখন তিনি আমার হাত ধরে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে কুরআনের একটি মহান সূরা শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছিলেন।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তা হলো আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। তা হলো সাতটি পুন:পুন: পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে।" [৪০০]

এ হাদিসগুলো থেকে বুঝা গেলো, সূরা ফাতিহায় প্রচুর বরকত ও ফযিলত রয়েছে। এ সূরাটি থেকে ফযিলত লাভ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। তবে এখানে একটা বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, প্রেক্ষাপট, স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী সবকিছুর ফযিলত ও মূল্যায়নে পার্থক্য হয়। একটি অভিজাত এলাকার জমির যে মূল্য, বস্তি এলাকায় সমপরিমাণ জমির মূল্য তার নিকটেও পৌঁছতে পারে না। কুরআন পাঠের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। মনোযোগের সাথে মর্ম অনুধাবন করে, তার প্রতি পূর্ণ ঈমানের সাথে, এবং তা অনুসরণের মানসিকতা ও প্রতিশ্রুতি সহকারে সূরা ফাতিহা বা কুরআনের যেকোনো অংশ পাঠ করা, আর না বুঝে না শুনে মন্ত্রের মতো শুধু উচ্চারণ করা এক কথা নয়। এ দু'ধরনের পাঠকারী সূরা ফাতিহা বা কুরআন থেকে একই রকম ফযিলত আশা করতে পারে না। সুতরাং যে সূরা ফাতিহা প্রত্যেক দিন এতোবার পাঠ করা হয়, তার মর্ম ও অন্তর্নিহিত বাণীকে বুঝে-শোনে এবং হৃদয়ঙ্গম করেই পাঠ করা উচিত। নামাযের বাইরে এবং নামাযের ভিতরে প্রতি রাকাতে এরূপ মানসিক উপলব্ধি ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি সহকারেই সূরা ফাতিহা পাঠ করা উচিত। তবেই এ সূরার পূর্ণাঙ্গ ফযিলত ও কল্যাণ পাওয়া যাবে।

---

৪০০. বুখারী, হাদিস নং- ৪৬২২।

গ্রন্থপঞ্জি*

১. ابو الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي - **تفسير القران العظيم** - المجموعة المتحدة للنشر والتوزيع – القاهرة - مصر

২. ابوبكر جابر الجزائر - **ايسر التفسير لكلام العلي الكبير** - مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م

৩. ابو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي - **التفسير الكبير**- دار الحديث بيرون بوهرغيت ملتان، باكستان

৪. ابوعبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي - **الجامع لاحكام القران** - دار الحديث القاهرة- مصر، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م

৫. ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري – **الصحيح** - دار التقوى للتراث القاهرة - ٢٠٠١ م

৬. ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري - **الصحيح** - دار الحديث – القاهرة - ١٩٩٧ م

৭. ابو عيسي محمد بن عيسى الترمذي – **الجامع** - دار الحديث - القاهرة - ١٩٩٩ م

৮. ابو داؤود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي - **السنن** - دار الحديث القاهرة –١٩٩٩ م

৯. ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي – **السنن** - دار الحديث القاهرة – ١٩٩٩ م

১০. ابو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني – **السنن** - دار الحديث - القاهرة -١٩٩٨ م

১১. احمد بن محمد بن حنبل – **المسند** - دار الحديث - القاهرة - 1995 م

১২. جلال الدين محمد بن احمد بن محمد المحلي و جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطي- **تفسير الجلالين**- دار السلام للنشر والتوزيع الرياض، ١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م

১৩. الراغب الاصفهاني - **معجم مفردات الفاظ القران** - دار الفكر- بيروت، لبنان- ١٣٩٢ هـ-١٩٧٢ م

* ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী গ্রন্থপঞ্জিকে লেখকের নামের প্রথম শব্দ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

٥٤. السيد سابق - **فقه السنة** - دار الفكر- بيروت، لبنان- ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م

٥٥. شبير احمد عثماني - **تفسير القران الكريم** - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المملكة العربية السعودية ١٤٠٩ هـ

٥٦. ظفر احمد العثماني التهانوي - **احكام القران** - ادارة القران والعلوم الاسلامية للطباعة والنشرو التوزيع والتصدير، كراتشي، باكستان- ١٤١٨ هـ

٥٩. عبد الرحمن بن عوض الجزيري - **كتاب الفقه على المذاهب الاربعة** - دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان- ١٣٦٠ هـ- ١٩٩٩ م

٥٧. عبد الوهاب النجار- **قصص الانبياء** - دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان- ١٤١٧ هـ- ١٩٩٦م

٥٨. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي – **السنن** - دار الحديث القاهرة – ٢٠٠٠ م

٢٥. عبد الرحمن بن ناصر السعدي - **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان** - مؤسسة الرسالة- بيروت، لبنان- ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م

٢١. قاضي محمد ثناء الله عثماني مجددي پاني پتي - **تفسير مظهري** - دار الاشاعت، كراتشي، باكستان

٢٢. محمد علي الصابوني - **مختصر تفسير ابن كثير** - دارالقران الكريم، بيروت، لبنان- ١٤٠٢ هـ ١٩٨١م

٢٥. محمد الطاهر بن عاشور التونسي - **التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور**- مؤسسة التاريخ، بيروت، لبنان- ١٤٢٠ هـ- ٢٠٠٠ م

٢٨. محمد ادريس كاندهلوي - **معارف القران** - فريد بكدبو- دهلي، الهند ٢٠٠١ م

٢٥. وهبة الزحيلي- **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج** - دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان- ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م

২৬। আবু বকর আহমদ ইবন আলী আর-রাযি আল-জাস্‌সাস (অনুবাদক: মাওলানা আব্দুর রহীম), **আহকামুল কুরআন**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮

২৭। আবদুল খালেক, **নামায**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১

২৮। আবদুল খালেক, **ঈমান**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫

২৯। আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

৩০। আশরাফ আলী থানবী, **বয়ানুল কুরআন** (বাংলা অনুবাদ: তাফসিরে আশরাফী), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৭৫ হিজরী

৩১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা পরিষদ, **আল-কুরআনে অর্থনীতি**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০

৩২। তাহের সূরাটী (অনুবাদক: মাওলানা সামসুল হক), **কাসাসুল আম্বিয়া**, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৬

৩৩। মুফতি মুহাম্মদ শফী (অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), **মা'আরেফুল কুরআন**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

৩৪। হিফযুর রহমান (অনুবাদক: মাওলানা নূরুর রহমান), কাছাছুল কুরআন, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৯

৩৫। সাইয়্যেদ কুতুব (অনুবাদক: হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ), **তাফসির ফী যিলালিন কুরআন**, আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা, ২০০৩

36. Abul Hasan M Sadeq, **Development and Finance in Islam**. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 1991.

37. Abul Hasan M. Sadeq, **A Survey of the Institution of Zakah: Issues Theories and Administration**, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1994.

38. Abul Hasan M Sadeq, Economic Development in **Islam. Islamic Foundation** Bangladesh, Dhaka: 2004.

39. Ataul Huq Pramanik et al, **Development in the Islamic Way**. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 1997.

40. Board of Researchers (IF), **Scientific Indications in the Holy Quran,** Islamic Fundation Bangladesh, Dhaka 1995.

41. Munawar Iqbal (ed.), **Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty.** The Islamic Foundation, Leicester (UK): 2002.

42. Sayyid Abul Ala Mowdudi, **Towards Understanding the Quran** (Tafhimul Quran translated into English by Zafar Ishaq Ansari), The Islamic Foundation, Leicester (UK): 1994.

43. Ziauddin Ahmed, **Islam, Poverty and Income Distribution**. The Islamic Foundation, Leicester (UK): 1991.